আক্রমণের মোকাবিলা করতে

কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেনাপতিদের স্মরণ

অরিন্দম কোঙার

কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস একশো বছরের হতে চললো। প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের উপর আক্রমণ চলছে। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাই তো দেশের বাইরে ১৯২০ সালে। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (১৯১৯-৪৩) এর উদ্যোগে সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ শহরে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের একটা অংশ সমবেত হয়েছিলেন এবং সেখানেই তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন। দেশের পরিস্থিতি এমন ছিল যে দেশের ভেতরে পার্টির প্রতিষ্ঠা হতে পারেনি। ১৯২১ সাল থেকে পার্টি দেশের নানা অংশে—কলকাতা, বোম্বাই, কানপুর, লাহোর, মাদ্রাজ ইত্যাদি শহরে ছোটো ছোটো গোষ্ঠী গড়ে তুলতে থাকে প্রায় গোপনে। ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটা কেন্দ্রীভূত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা কঠিন ছিল। ১৯২৫ সালে কানপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে একটা কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়, অস্থায়ী সাংবিধানিক নিয়মাবলীর খসড়া ও রাজনৈতিক থিসিসের খসড়া তৈরি হয়। ১৯৩৩ সালে কলকাতায় গোপনীয়তার মধ্যে ৫ দিন ব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় চারটি স্থানে। প্রথম দিন জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের আমজাদিয়া হোটেলের উপরের একটা ঘরে, দ্বিতীয় দিন কোমেদান বাগান লেনের একটা বাড়ির একটা ঘরে খবরের কাগজ পেতে, তৃতীয় দিন মানিকতলা হাসপাতালের এক কোয়ার্টারে, চতুর্থ ও পঞ্চম দিন হাওড়ায় মাছের বাজারের কাছে একটা মসজিদের পাশের ঘরে। এই সম্মেলনে পার্টির এক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় এবং একটা দলিল গৃহীত হয় যা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক অনুমোদন করে। প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪২ সালে বোম্বাইয়ে।

বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি একটা সাংগঠনিক রূপ নেয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ হিসেবে ১৯৩১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটি গঠনের মাধ্যমে। প্রদেশে পার্টির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এই কমিটিই রূপান্তরিত হয় পার্টির বাংলা (বঙ্গীয় প্রাদেশিক) কমিটিতে। পার্টির প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কারও কারও মতে ১৯৩৪ সালে কলকাতার মেটিয়াবুরুজে, আবার কারও কারও মতে বেহালা বুড়োশিবতলায় ১৯৩৬ সালে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় বর্ধমান জেলার কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, মূলত ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাবে সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই ভূপেন দত্তের সভাপতিত্বে ১৯৩৩ সালে বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান সদর থানার হাটগোবিন্দপুরে। উল্লেখ্য, সারা ভারত কৃষকসভার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৬ সালে লখনউতে। আর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার প্রথম সম্মেলন আয়োজিত হয় বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের গ্রামে ১৯৩৭ সালে।

ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কৃষক সংগ্রাম পরিচালনা, অপরদিকে মার্কসবাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের আকর্ষণ বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। ১৯৩৫ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হাটগোবিন্দপুরে এবং সেখানে জেলা কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনের তারিখ ৫ অক্টোবর। প্রথম সম্পাদক সৈয়দ শাহেদুল্লাহ। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হাটগোবিন্দপুরেই, সুকুমার ময়দানে, যেহেতু পার্টির তরুণ নেতা সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রানিগঞ্জ থানার বল্লভপুরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনা করার সময় শহিদ হন ১৯৩৮ সালের ১৫ নভেম্বর।

আক্রমণ আর আক্রমণ

দেখা যাচ্ছে ১৯৩৫ সালে বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হলো আর ১৯৩৮ সালে একজন নেতা খুন হয়ে গেলেন। আসলে সারা দেশের সঙ্গে বর্ধমান জেলাতেও প্রথম থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর আক্রমণ নেমে এসেছে। সেই আক্রমণ আজও চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ারে ১৯২১-২৭ সালে পাঁচ-পাঁচটা সাজানো ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিস্টদের জড়ানো হয়। এই পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলাগুলোতে (কোনো কোনো মামলাকে আবার তাসখন্দ বা মস্কো ষড়যন্ত্র

মামলাও বলা হয়) কোনো কোনো অভিযুক্তের এক থেকে সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়, আবার নির্জন কারাবাসও হয়। প্রথম পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে ১৯২২ সালে লেখা হয়, "সমস্ত স্থায়ী সরকারগুলোর প্রতি বলশেভিকদের মনোভাব সাধারণ ভাবনার বিষয়। সকল সভ্য শক্তিগুলোর সরকার যা বর্তমানে গঠিত, এই সরকারগুলোর প্রতি তাদের শত্রুতা ও উচ্ছেদ করার আকাঙ্ক্ষাও চিন্তার বিষয়। বিচারের সময় এই সাধারণ উপলব্ধি বিবেচনায় রাখতে হবে।" উল্লেখ্য, সেই সময়ে ভারতে ছিল ব্রিটিশ শাসন আর বলশেভিক বলতে বোঝাতো কমিউনিস্ট।

পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলাগুলো চলাকালীন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এক বড় মামলা হয় ১৯২৩-২৪ সালে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা নামে। এই মামলায় যাঁদের কারাদণ্ড হয়, তাঁদের অন্যতম মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। চার বছর সশ্রম

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

কারাদণ্ডে দণ্ডিত মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জেলে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯২৫ সালে জেল থেকে মুক্তি পান। এর পরই পরিচালিত হয় ভারতের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ফৌজদারি মামলা, মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯২৯-৩৩ সালে সাড়ে চার বছরের মামলায় ১৩ জন অভিযুক্তকে সাত মাস থেকে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সরকারি ঘোষণায় নিষিদ্ধ থাকে ১৯৩৪-৪২ সালে।

এই আক্রমণের ধারা স্বাধীন ভারতেও অব্যাহত আছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ই অনেক কমিউনিস্ট জেলে ছিলেন, যাঁদের অন্যতম সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা এ. কে. গোপালন। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮-৫১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকে। নিবর্তনমূলক আটক আইন কিংবা ভারত রক্ষা আইনে বছরের পর বছর কমিউনিস্টদের বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে। দেশদ্রোহিতার অভিযোগ তুলে (রাশিয়ার দালাল, ব্রিটিশের দালাল, চীনের দালাল, পাকিস্তানের দালাল) কুৎসা চালিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করা হয়েছে। কমিউনিস্টরা যাতে নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্যে সরকার গঠন করতে না পারে, তার জন্য প্রশাসনকে ব্যবহার করে বলপূর্বক ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে কিংবা ১৯৮৮ সালে ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১-৭৭ সালে, ত্রিপুরায় ১৯৮৮-৯২ সালে তীব্র সন্ত্রাস চলেছে। কেরালায় ই.এস.এস. নাম্বুদিরিপাদের মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিজ্ঞ নেতা আদালত অবমাননার দায়ে সাজা পেয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির উপর আক্রমণ, হামলা, কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের খুন-জখম, এলাকাছাড়া, জেলে পোরা চলেছে এবং চলছে ও চলবে।

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি যখন ছিল নিষিদ্ধ, তখন বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম থেকেই পার্টিকে আত্মগোপনে থেকে ভিন্নভাবে ব্যাপক মঞ্চ তৈরি করে কাজ করতে হয়। ১৯৩৮ সালে শহিদ হন সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৪৯ সালে দমদম সেন্ট্রাল জেলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য প্রভাত কুণ্ডু, আসানসোলের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মী সুমথ চক্রবর্তী, সেই সঙ্গে কলকাতার পার্টিকর্মী মুকুল চক্রবর্তী। ১৯৪৯ সালে কাটোয়া থানার অগ্রদ্বীপে কৃষককর্মী সুনীল পাল, রায়না থানার সহজপুরে কৃষককর্মী সন্তোষ রায়, যুগল মালিক নিহত হন। ১৯৫০ সালে বর্ধমান

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভাত কুণ্ডু

সুমথ চক্রবর্তী

জেলে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু হয় বর্ধমান শহরের ছাত্রীকর্মী সুশান্তা ঘোষের, ১৯৫১ সালে দমদম সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যু হয় অগ্রদ্বীপের কৃষক নেতা সুশীল চক্রবর্তীর। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে বিনয় চৌধুরী জেল থেকে প্যারোলে মুক্ত হয়ে বর্ধমান বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও বিজয়ী হন। আবার ১৯৬৩ সালে তিনি বর্ধমান বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিজয়ী হন। ১৯৪৮ সালে পুলিশ বর্ধমান শহরে পার্টির জেলা কমিটির অফিস বন্ধ করে দেয়। আবার ১৯৬২ সালে কংগ্রেস হামলা করে জেলা অফিস বন্ধ করে দেয় আর পুলিশ হামলা রোখার জন্য যে-সব পার্টিনেতা ও কর্মী অফিসে ছিলেন, তাঁদেরই আক্রমণকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে জেলে পাঠিয়ে দেয়। জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলির সদস্য বিনয় কোঙার সহ পার্টি নেতা ও কর্মী যাঁদের অভিযুক্ত করা হয়, তাঁরা অনেকেই কংগ্রেসি দুষ্কৃতীদের আক্রমণে তখন রক্তাক্ত অবস্থায় ছিলেন। এভাবেই ১৯৭১ সাল থেকে বর্ধমান জেলাতে আক্রমণ

চলেছে। বর্ধমান পৌরসভার নির্বাচন তখন প্রহসনে পরিণত হয়েছিল, আবার ২০১৩ সালে হলো। কিন্তু কেন?

'কেন' প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্নের উত্তর আছে কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে। সেই লক্ষ্য হচ্ছে শোষণহীন সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র থেকে শ্রেণিহীন সাম্যবাদ। উদ্দেশ্য হচ্ছে শোষক শ্রেণিগুলোকে শাসনক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে শোষিত শ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। কিন্তু শোষকশ্রেণি তার শোষণ বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে সরে গিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করার সুযোগ কখনোই ছেড়ে দেয় না। তাদের অর্থ আছে, অস্ত্র আছে, প্রচারমাধ্যম অছে, মতাদর্শ আছে—ঠিক, কিন্তু জনগণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, অধিকারের জন্য লড়াইকে দমিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রযন্ত্র—সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, আমলাবাহিনী, আইন-আদালত ইত্যাদি। এই-সবের মোকাবিলা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য খুবই বড় ধরনের লড়াই করতে হয়। সে লড়াই হচ্ছে বিপ্লব। সেই কারণে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবী পার্টি।

১৯২৬ সালে গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৪১-তম অধিবেশন উপলক্ষ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশিত ইস্তাহারে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, ''জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য যদি জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন না হয় তাহলে আন্দোলন অর্থহীন হয়ে যায়। জাতীয় স্বাধীনতার বিষয়ে এই বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। এর জন্য আইনগত বা সাংবিধানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন লাগে না। এই স্বাধীনতার অর্থ হলো জনসাধারণের স্বকীয় সরকার প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা, যার কাজ হবে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়গুলো পরিচালনা করা। জাতীয়তাবাদী কর্মসূচির এই মূল বিষয়টা এখনো পর্যন্ত স্পষ্টভাবে ও পূর্ণাঙ্গভাবে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হয়নি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পুনর্গঠিত করার এইটাই হবে প্রথম কাজ।'' ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই এটা পরিষ্কার করে কংগ্রেস-পরিচালিত আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রসারিত স্বাধীনতা সংগ্রাম গড়ে তোলার দায়বদ্ধতা নিয়ে কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান নয়, পরিবর্ত শাসন হিসাবে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়, যখন মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত কমিউনিস্টরা তাঁদের সাধারণ বিবৃতিতে উন্নত শিরে ঘোষণা করেন, ''আমরা অনুকম্পা চাইছি না, এমনকি এই কোর্টের কাছে ন্যায়-বিচারের জন্য সওয়াল করছি না। এটা একটা শ্রেণির কোর্ট। শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে এখানে ন্যায় বিচারের ধারণা অর্থহীন। আমরা জানি এই কোর্ট আমাদের ন্যায় বিচার দিতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতার কাছে আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে নিজেদের সঁপে দিতে পারি না। আমাদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে গোটা সাম্রাজ্যের নিপীড়িত শ্রেণি ও জনগণকে যাতে প্ররোচিত করার সাহস দেখাতে না পারে, তার জন্য সাম্রাজ্যবাদকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।'' কী আদর্শবোধ! কী আত্মবিশ্বাস! কী দৃঢ়তা!

দেশের স্বাধীনতা এবং সেই সঙ্গে শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে দেশের মানুষের মুক্তির জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩০ সালে 'ড্রাফ্‌ট প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন' নামে একটা দলিল হাজির করে। ভারতীয় জনসাধারণের সমস্ত অংশের সমস্যাবলী উপলব্ধি করে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাতে একটা সর্বাঙ্গীণ কর্মপন্থা এই প্রথম ভারতের একটা পার্টি স্থির করতে পেরেছিল। এই কর্মপন্থায় ঘোষণা করা হয়, ''ভারতীয় জনসাধারণের দাসত্ববন্ধনের উচ্ছেদ ঘটাতে হলে এবং যে দারিদ্র্যের কবলে শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষকেরা নিষ্পেষিত, তা থেকে তাদের মুক্ত করতে হলে দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং যা মধ্যযুগ থেকে এ যাবৎ জিইয়ে রাখা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে দিতে ও সমগ্র ভূখণ্ডকে যাবতীয় মধ্যযুগীয় আবর্জনা থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ, সেই কৃষিবিপ্লবের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা একান্তভাবে আবশ্যক। ব্রিটিশ পুঁজি ও জমিদারী-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক কৃষিবিপ্লবকেই হতে হবে ভারতে সেই বৈপ্লবিক মুক্তি অর্জনের ভিত্তি।'' কর্মপন্থার এই দলিলে অবশ্য বড় ধরনের বিচ্যুতি ছিল। এই বিচ্যুতি ঘটার মূল কারণ হচ্ছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের (১৯২৮) বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্কীর্ণতাবাদী মূল্যায়ন। এই মূল্যায়ন সংশোধন করে আন্তর্জাতিক সঠিক দিশা দেখায় সপ্তম কংগ্রেসে (১৯৩৫)। সেই অনুযায়ী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও সঠিক অবস্থান গ্রহণ করে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তী ঘটনাবলী, দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ শ্রেণিস্বার্থে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপস করেছিল।

সুতরাং স্বাধীনতার পরও ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির উপর আক্রমণ চলছে। প্রাসঙ্গিকভাবে ১৯৪২ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার সময় ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বোম্বাইয়ের গভর্নর স্যার রোজার লামলি ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে এক গোপন চিঠিতে লেখেন, ''জেল থেকে হয়তো কমিউনিস্টদের ছেড়ে দিতে আমরা বাধ্য হবো, কিন্তু এই বামপন্থীরা যদি ভারতবর্ষে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাহলে ধনিক শ্রেণি ও মালিক গোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে পড়বে।... কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে আমাদের খুবই সন্তর্পণে পা ফেলা উচিত।'' (৪ মে, ১৯৪২)। স্বাধীন দেশে ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাফল্যও ভাবিত করেছিল মার্কিন ও ব্রিটিশ সরকারকে। মার্কিন বিদেশ সচিব একিসন মন্তব্য করেন, ''যদি এই ধারা চলতে থাকে তাহলে তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে ভারতের কমিউনিস্ট শক্তির অগ্রগতি ও এশিয়ার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক এক অবস্থা।'' (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২০ মার্চ ১৯৫২)।

স্বাধীন রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র, বিপ্লবের স্তর, বিপ্লবের শত্রু-মিত্র, বিপ্লবের নেতৃত্ব ইত্যাদি নিয়ে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে মতাদর্শগত বিরোধ দেখা দেয়, সংশোধনবাদী কিংবা সঙ্কীর্ণতাবাদী বিচ্যুতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র আত্মপ্রকাশ হয়। ভারতে বিপ্লব সম্পর্কে অমীমাংসিত প্রশ্নগুলোর মীমাংসা হয়, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন পায় দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত এক কর্মসূচি, এক সঠিক রণনীতি। ২০০০ সালে কর্মসূচিকে সময়োপযোগী করা হয়। এই কর্মসূচি অনুযায়ী সমসাময়িক বিশ্বে চারটে প্রধান সামাজিক দ্বন্দ্বের মধ্যে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের। ভারতে বিপ্লবের চরিত্র হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক। পার্টি দেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে এবং সংসদীয় কাজের সঙ্গে সংসদ-বহির্ভূত কাজের সমন্বয় সাধন করতে চায়। দেশের বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থায় সুযোগ পেলে সরকার পরিচালনা করতে চায় এবং সরকার পরিচালনায় উদ্দেশ্য থাকে— ১. জনগণের

সমস্যাবলী প্রশমনের চেষ্টা, ২. বিকল্প নীতি তুলে ধরে তাকে কার্যকর করায় আন্তরিক থাকা, ৩. বৈপ্লবিক সংগ্রামকে শক্তিশালী করে তোলা।

এই-যে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব, বিপ্লবের চরিত্র, সরকার পরিচালনার উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক, সেটা অনুধাবন করতে পারলে এটা বোঝা অসুবিধাজনক হয় না যে কেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির নিয়ন্ত্রক সহ একচেটিয়া পুঁজিপতি, বৃহৎ ভূস্বামী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-কে খতম করতে চায়, তার উপর এত আক্রমণ নামিয়ে আনে। এ আক্রমণ কেবল দৈহিক নয়, এ আক্রমণ রাজনৈতিক, এ আক্রমণ মতাদর্শগত।

বর্ধমান জেলায়

বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনায় বিচ্যুতি কম হয়েছে। নানা ঝড়-ঝাপটায় কখনও কখনও আন্দোলন থমকে গেছে কিংবা পিছিয়ে গেছে, তবে সেটা সাময়িক। সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের অভিমুখ সামনের দিকে। ছোটো-বড় নানা আন্দোলন, সামাজিক কাজ, শ্রেণিসংগ্রাম পার্টির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে তোলে। সেজন্যই তো কোনো পরিবারে আত্মগোপনে থাকাকালীন কোনো পার্টিনেতা সেই পরিবার থেকে যখন অন্যত্র চলে যান, তখন সৈয়দ শাহেদুল্লাহর-র অভিজ্ঞতায়, ''একটি দৃশ্য বার বার ঘটেছে বলে মনে গেঁথে রয়ে গেছে। যেখানেই থেকেছি, গরিব কৃষক বা সচ্ছল অবস্থার কৃষক, বামুন, কায়েত বা উগ্রক্ষত্রিয় (আগুড়ি), ব্যগ্রক্ষত্রিয় (বাগদি), বা রবিদাস (মুচি)—এঁদের সবারই বাড়িতে বিদায় নেবার সময় বয়স্কা বা বৃদ্ধা মেয়েরা চোখের জল মুছতে মুছতে বারবার বলেছেন, ''দেখো বাবা ধরা পড়ো না।'' (বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ)। আবার সরকারি টালবাহানা সত্ত্বেও কৃষক সমিতির মাধ্যমে পার্টি যখন অজয় নদ বাঁধার ডাক দেয়, তখন হাজার হাজার মানুষ সেই বাঁধ বাঁধার কাজকে উৎসবে পরিণত করেন। শ্রমের সঙ্গে সুর মিলে যায়। মাটিকাটা, সেই মাটি ঝুড়িতে নিয়ে মাথায় চাপিয়ে বাঁধে ফেলা, ছাউনি ফেলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, আবার সন্ধ্যা হলে গান-বাজনার আসর বসানো—একে তো উৎসবই বলতে হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ছুটে আসেন গণনাট্য সংঘের সুদীন সেন। সেই মধুর স্মৃতি তাঁর মনে চিরকাল জাগরুক থাকে। ঘটনা ১৯৪৫ সালের, আর তিনি লেখেন ১৯৯৩ সালে, ''ঐ ১৯৪৫ সালেই অজয় নদের বাঁধ বাঁধার আন্দোলন গড়ে উঠল কৃষক সভার নেতৃত্বে। ভেদিয়া স্টেশন থেকে যেতে হবে সেই কর্মকাণ্ডের স্থানে। ভবানী সেন, হরেকৃষ্ণ কোঙার, শাহেদুল্লা সাহেব এবং বিনয়দা (চৌধুরী)—এঁরা সবাই গিয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখরাও গিয়েছিলেন, ছিলেন সজল রায়চৌধুরী, সুভাষ মুখার্জী প্রভৃতি। আমরা অনেকেই গান গাইলাম।'' (ভোরের সূর্যোদয়ের আশা নিয়ে)। এমন অনেক সব ঘটনা, পার্টির টুকরো টুকরো ইতিহাস জানা যায়, যদি আমাদের সেই-সব নেতাদের আমরা স্মরণ করি।

জন্মশতবর্ষে

সূচনাপর্বে বিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশের দশকে যাঁরা বর্ধমান জেলায় পার্টি গড়ে তুলেছেন, পার্টিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, কেউ কেউ আবার ক্রমশ রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরে নেতৃত্বে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের মাধ্যমেই তো কমিউনিস্ট পার্টির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আমরা জানতে পারি, যা আমাদের উদ্দীপিত করে, অনুপ্রাণিত করে, আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে।

সরোজ মুখোপাধ্যায়

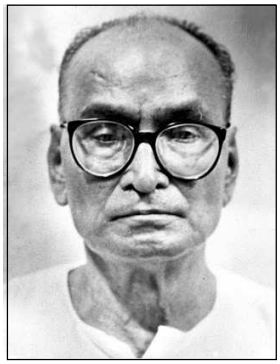

বিনয় চৌধুরী

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ

আমরা সরোজ মুখোপাধ্যায় (১৯১১-৯০), বিনয় চৌধুরী (১৯১১-২০০০), সৈয়দ শাহেদুল্লাহ (১৯১৩-৯১)-র জন্মশতবর্ষে তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল (১৯০৩-৯১)-এর জন্মশতবর্ষ নিঃশব্দে পেরিয়ে গেছে, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। অথচ এই মানুষটা ১৯০৩ সালের ১০ জানুয়ারি মেমারি থানার সলদা গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক বাড়ি মেমারি থানার কেজা গ্রাম। লেখাপড়া মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে। ১৯২১ সালে এ জি বেঙ্গলের সরকারি চাকরি ছেড়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন এবং এক মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা, আবার সারা ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। অকৃতদার এই নেতার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে গ্রাম থেকে গ্রামে আর পার্টি কমিউনে। বেশ কিছু বই লিখেছেন আবদুল্লাহ রসুল। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠন গড়ার অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বই, 'গ্রামে-গ্রামান্তরে'। সেখানে আছে, ''এমনি একদিন হাঁটতে হাঁটতে খিদেয় প্রাণ যায়। কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। এক জায়গায় পথে দেখা গেল একজন কৃষক মাথায় এক ঝুড়ি কাঁঠাল নিয়ে হাটে যাচ্ছে। পাকা কাঁঠালও ছিল। একটা কিনে জলের ধারে বসে তাকে অতি সন্তর্পণে ভেঙে (যাতে হাতে বেশি আঠা না লাগে) তিনজনে খেয়ে শেষ করলাম। এই ধরনের অভিজ্ঞতা সেকালে কৃষক কর্মীদের হতো। মাঠের আল বা কাঁচা রাস্তা ছাড়া পাকা রাস্তা ও যানবাহন ছিল অত্যন্ত বিরল।'' এ

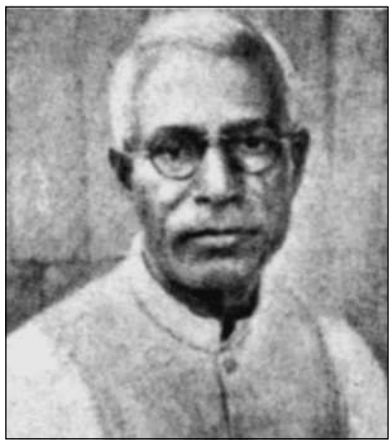

আবদুল্লাহ্ রসুল

বিজয় পাল

অভিজ্ঞতা আমাদের বড় শিক্ষা দেয়।

১৯৩৮ সালেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন বিজয় পাল (১৯১৪-৯১) ও হরেকৃষ্ণ কোঙার (১৯১৫-৭৪)। বিজয় পালের জন্ম ১৯১৪ সালে, কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখ জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নথিপত্রেও নেই, যদিও তিনি বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৬২, ১৯৭৭, ১৯৮২ সালে। বিজয় পাল বর্ধমান জেলার মানুষ ছিলেন না। হাওড়া জেলার শিবপুরে জন্ম। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি হাওড়া আদালতে সেই সময়ে দেশের স্বাধীনতার পতাকা তুলে সংবাদের শিরোনামে উঠে আসেন। তার আগেই প্রথম যুগান্তর দলে ও পরে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দেন। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড ভোগ করার পর বাংলা প্রদেশে বসবাসে নিষেধাজ্ঞা থাকায় পাটনায় চলে যান। বিহারেও নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার সেখান থেকে যান কানপুরে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এইখানেই ১৯৩৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেন। কানপুরেও তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি চলে যান গান্ধীজির সেবাশ্রম আশ্রমে। এইভাবে এক স্থান থেকে আর একস্থানে ঘুরতে ঘুরতে বিনয় চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে বর্ধমান জেলার আসানসোল এলাকায় কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেন। মূলত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৯১ সালের ২৭ জানুয়ারি কলকাতার এস.এস.কে.এম. হাসপাতালে মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। প্রকৃত কমিউনিস্টরা মানুষের কতটা আপনজন হতে পারেন তা দেখা যায় বর্ধমান জেলা পার্টি অফিসে ও আসানসোল জোনাল পার্টি অফিসে তাঁর মরদেহ ঘিরে মানুষের বেদনাভরা মুখে ও চোখের জলে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী এই উদারহৃদয় কমিউনিস্ট ছিলেন আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষের তাঁদের স্বীকৃত অভিভাবক।

''আমরা ২৬ জন রাজনৈতিক বন্দীদের নাম দিতেছি, তাঁহারা ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার আইন প্রবর্তন হইবার পূর্ব হইতেই বন্দী জীবন যাপন করিতেছেন। সকলে মিলিয়া ৩৭৮ বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছেন।'' কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অভিযোগের উত্তরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি.সি. যোশী ১৯৪৫ সালে এই বক্তব্য হাজির করেন। এই রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে ছিলেন সুবোধ চৌধুরী। তখনই জেল জীবন হয়ে গেছে ১৪ বছর ৬ মাস। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্ধমান জেলার মানুষ। জন্ম ১৯১৪ সালে কাটোয়া থানার অগ্রদ্বীপে। জন্মতারিখ জানা নেই। ১৯৫২, ১৯৬২, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তিনি সদস্য ছিলেন, কিন্তু বিধানসভার নথিপত্রেও জন্মতারিখের উল্লেখ নেই। জেল থেকে মুক্ত হবার পর ১৯৪৬ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন। ১৯৪৯ সাল থেকে আমৃত্যু পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। যদিও ১৯৭০ সাল থেকে তিনি আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হন এবং আত্মগোপনে

সুবোধ চৌধুরী

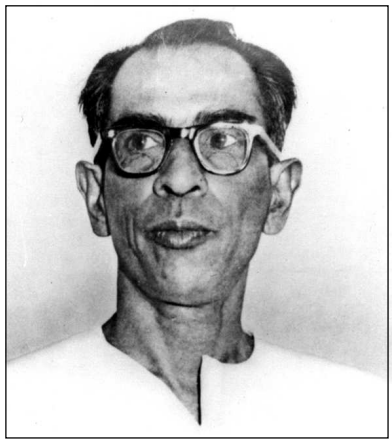

হরেকৃষ্ণ কোঙার

থাকাকালীন ১৯৭২ সালের ২৬ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাটনার কাছে পার্বলপুরে তাঁর জীবনাবসান হয়। অকৃতদার এই কমিউনিস্ট নেতার যে-কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার, কর্মীদের যথাযথ কাজে নিযুক্ত করার, সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে সুবোধ চৌধুরী বন্দী ছিলেন ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত।

এই আন্দামানের সেলুলার জেল থেকে ১৯৩৮ সালে মুক্ত হয়ে বাংলায় ফিরে এসে হরেকৃষ্ণ কোঙার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন এবং ১৯৭৪ সালের ২৩ জুলাই মাত্র ৫৯ বছর বয়সে কলকাতায় যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন তিনি ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। হরেকৃষ্ণ কোঙারের জন্ম রায়না থানার কামারগড়িয়া গ্রামে ১৯১৫ সালের ৫ আগস্ট। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৭৫ সালে বোলপুরে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার ২৪-তম সম্মেলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরাইয়া তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই উল্লেখ করেন, ''এই প্রসঙ্গে (ভিয়েতনামের মুক্তি) আর একজনের কথা মনে পড়ছে, যিনি আমাদের আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত সংগ্রামের দিনে প্রত্যক্ষভাবে ভিয়েতনামে গিয়ে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে আমাদের সাথে তাঁদের যোগসূত্র স্থাপনে সাহায্য করেছিলেন—সারা ভারত কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক সেই কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারের সংগ্রামী স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই। তাই আজ ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের বিজয়ের মুহূর্তে কমরেড কোঙারের কথা বেশি করে মনে পড়ছে। কৃষক আন্দোলনে কমরেড কোঙারের যোগ্য ভূমিকা চিরদিনের জন্য স্মরণীয় হয়ে

১৯৭৪ সালে রাজস্থানের শিকারে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক সভার ২২-তম সম্মেলনে বর্ধমান জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে (বাম দিক থেকে চেয়ারে বসে) কৃষ্ণচন্দ্র হালদার, মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিনয় চৌধুরী, সরোজ মুখোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম মাজি, হেমন্ত রায়।

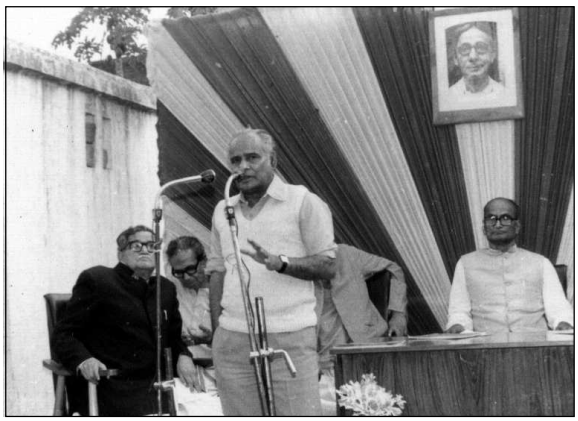

১৯৮৫ সালে বর্ধমান শহরে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি-র শাখা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রবীন সেন। (বাম দিক থেকে) সরোজ মুখোপাধ্যায়, বিজয় পাল ও বিনয় চৌধুরী।

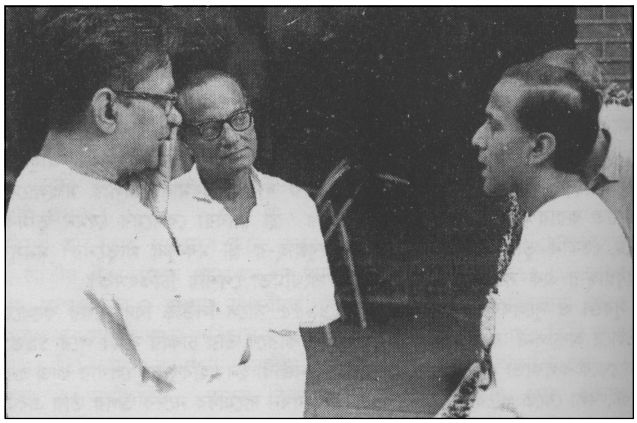

১৯৬৮ সালে সিপিআই(এম)-এর বর্ধমান প্লেনামে জ্যোতি বসু, সুবোধ চৌধুরী, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ।

থাকবে।'' ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হরেকৃষ্ণ কোঙার পার্টি কর্মসূচি অনুযায়ী কৃষক আন্দোলন পরিচালনায় ও সেই সঙ্গে স্বল্পস্থায়ী রাজ্য সরকারের কাজকে সেই আন্দোলনের পরিপূরক করে তোলায় ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা

এই-সব সেনাপতিরা বিপ্লবী সংগ্রামকে যেভাবে পরিচালিত করেছেন, আমরা সেই সেনাবাহিনীর সৈনিক হিসাবে যোগ্য হয়ে উঠতে চাই। তাই আমরা জন্মশতবর্ষে সরোজ মুখোপাধ্যায়, বিনয় চৌধুরী, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ-র জীবন ও কর্মধারা নিয়ে অনুশীলন করেছি। ২০১৩-১৪ সালে আমরা সুবোধ চৌধুরী ও বিজয় পালকে জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। সুবোধ চৌধুরী ও বিজয় পাল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে এবং তা আমাদের করতে হবে।

জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম শহিদ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯১৩ সালের ২৫ জুন কাঁকসা থানার কুলডিহা গ্রামে জন্ম। ১৯৩৮ সালের ১৫ নভেম্বর মাত্র ২৫ বছর বয়সে শহিদ হন রানিগঞ্জ পেপার মিল (পরবর্তীকালে বেঙ্গল পেপার মিল নামে পরিচিত) ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১২-১৩ সালে জন্মশতবর্ষে তাঁকে নিয়ে চর্চার এখনও অবকাশ আছে। আমরা আরও প্রস্তুতি নিচ্ছি ২০১৪-১৫ সালে জন্মশতবর্ষে হরেকৃষ্ণ কোঙার সম্পর্কে চর্চা করার জন্য।

১৯৬২ সাল। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উগ্র জাত্যভিমানের প্ররোচনা। প্রকৃত কমিউনিস্টদের উপর বেপরোয়া আক্রমণ। ভারতরক্ষা আইনে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার। হরেকৃষ্ণ কোঙার তখন কলকাতার দমদম সেন্ট্রাল জেলে বন্দী। সেই অবস্থায় ১৯৬২ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাত ১০-৩০ মিনিটে লেখেন, ''প্রকৃত দেশপ্রেম ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শক্তি এই সময়ে সংহত হচ্ছে। আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে এই কাজে সক্রিয় অংশ নিতে পেরেছি। সারা বছরে এটাই আমার বড় গর্বের কথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—ভুল করি নাই। দেশের বিপদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ, দমননীতি ও সংস্কারবাদীদের কুৎসা প্রচার আমাদের উপর নেমেছে। কিন্তু মার্কসবাদী বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মে এ-সবই ব্যর্থ হবে।... আমি গর্বিত যে আমি এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বেঁচে আছি ও মার্কসবাদ ও প্রগতির সঙ্গে আছি।'' (বর্ষশেষ) এমন গর্বেরই তো অংশীদার আমরা হতে চাই। বর্ধমান জেলার ঐতিহ্যের যে ধারাবাহিকতা তা আমাদের শেখায় লক্ষ্যে স্থির থাকতে, আদর্শে দৃঢ় হতে, আত্মবিশ্বাসী হতে, জনগণের মধ্যে থাকতে এবং জনগণকে নিয়ে ধীরস্থিরভাবে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে।

কয়েকটি ঘটনায় দেখা জ্যোতি বসু

নিশীথ অধিকারী

গত শতাব্দীর কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, অবিসংবাদিত ভাবে সর্বভারতীয় জননেতা, বাংলার তাবৎ মানুষের গর্ব জ্যোতি বসুর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। তাঁর জীবনী ও কর্মকাণ্ড নিয়ে দেশে ও বিদেশে প্রাজ্ঞা মানুষেরা, ওঁর সাথী নিত্যকর্মসঙ্গীরা আলোচনা ও স্মৃতিচারণা করেছেন বা করবেন। ওঁর ব্যক্তিত্বের, কর্ম এবং চিন্তার মূল্যায়ন পুনর্মূল্যায়ন আগামী প্রজন্মের পাথেয় ও সম্পদ হয়ে উঠবে।

কিন্তু নিত্যকর্মসঙ্গী সাথী বা খুব কাছের মানুষ অথবা প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক বিশ্লেষক না হয়েও কিছুটা দূর থেকে দেখা সাধারণ মানুষ হিসেবে কয়েকটি ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে জ্যোতিবাবুর মুগ্ধ ভক্ত হয়ে ওঠার দুর্লভ সৌভাগ্য আমারে জীবনে ঘটেছে।

প্রথম ঘটনাটি হল একদিন সন্ধ্যায় টেলিফোন এল ইন্দিরা ভবন থেকে। ভয়ে ভয়ে ফোন ধরেছি। উল্টোদিক থেকে জ্যোতিবাবুর সরাসরি কণ্ঠস্বর—"একটা তদ্বির আছে।" অবাক আমি—"এ কী বলছেন? কী করতে হবে আমাকে নির্দেশ দিন।"

—না, এটা সরকারি আইনের মধ্যে পড়ে না। দু-জনকে জেলে ১৫ দিন রেখে দিয়েছে—তাদের জামিন করিয়ে দিতে হবে।

মনে মনে ভাবছি কারা এমন মানুষ যাদের জন্য স্বয়ং জ্যোতিবাবুর মতো ব্যক্তিত্ব তাঁর অধস্তনের কাছে অনুরোধ করছেন?

ইতস্তত করে প্রশ্ন করি—"এরা কারা? কী এদের অপরাধ?"

একই স্বরে উত্তর এল, "একজন আমার কুক আর একজন আমার ড্রাইভার। ওরা আমার এ.টি.এম. কার্ড সরিয়ে নিয়ে আমার ব্যাঙ্কে যা ছিল তা তুলে ভাগ করে নিয়েছে। আবার ধরাও পড়েছে।"

আমার আরও অবাক হবার পালা।

"সে কী? এদের দয়া করছেন?"

—"আমাদের বিচারের সবচেয়ে অসুবিধা হলো—আমরা দোষীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করি, কিন্তু তাদের পরিবার? তারা দোষ না করেও শাস্তি পায়। ওই ছেলেদুটোর বউ-বাচ্চারা তো অপরাধ করেনি—কিন্তু তারা খাবে কোথা থেকে? মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা জেলে ঢুকেছে—কবে বেরোবে স্থির নেই। এদের 'বেইল' করতে পয়সার দরকার, তাই বা কোথা পাবে ওর বউ-বাচ্চারা!"

আমি মুগ্ধ—বিচারব্যবস্থার এই দৈন্যের দিকটি আগে কোনোদিনই উপলব্ধি করিনি।

পরের ঘটনাটি আমার কাছে আরও শিক্ষামূলক।

কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি এজলাসে বসে অকারণে বামফ্রন্ট সরকারকে আক্রমণ করতেন। বিশেষ করে জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই ব্যক্তিগতভাবে তির্যক মন্তব্য করতে দ্বিধা করতেন না।

আমি বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি মুখ্যমন্ত্রীর এবং অনুরোধ করি যেন উনি প্রধান বিচারপতিকে এ বিষয়ে অবহিত করে ওই বিচারপতিকে রিট আদালত থেকে সরিয়ে দেওয়ানি আদালতে বসান।

বিষয়টি মন দিয়ে শোনার পর মার্কসবাদী তাত্ত্বিক জ্যোতিবাবু বললেন—ও লোকটা শুনেছি তো পাগল। ব্যক্তিগতভাবে তাকে দিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তাছাড়া আমরা তো যতক্ষণ পারবো এই ব্যবস্থাকে আমাদের কাজে লাগাবো। তারপর বললেন, বিচার ব্যবস্থা একটা দামি কাঁচের আসবাব। বর্তমান ব্যবস্থায় একে যত্ন করে রাখতে হবে। যখন আমরা অসুবিধায় পড়ব—তখন এটাই আমাদের কাজে আসবে। মাঠে ময়দানে নেমে পড়লে এটার ভাবমূর্তি ভাঙতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু একজনের জন্য সামগ্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ঝগড়া করা এখন উচিত নয়।"

আদালত রাষ্ট্রব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে নিশ্চয়ই শ্রেণি-শোষণের হাতিয়ার। কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাবার সময় শাসকদের আক্রমণের মুখে নাগরিক আদালতকেই আত্মরক্ষার ঢাল হিসাবে কাজে লাগাতে পারে। মার্কসবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের এটাই আমার শিক্ষণীয় দিক তা কোনোদিন খেয়াল করিনি।

তৃতীয় ঘটনাটি হল—২০০১ সালে এক সন্ধেবেলায় মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোনে জানতে চাইলেন ওইদিনের 'স্টেটসম্যান'-এর 'এডিটোরিয়াল'টা পড়েছি কিনা এবং বললেন, ওটা পড়ে যেন রাত্রে ওঁর সঙ্গে কথা বলি। পড়ে দেখলাম প্রায় ২০ বছর আগের ঘটনা বিজন সেতুর ওপর আনন্দমার্গীদের হত্যার ঘটনা নিয়ে লেখা সম্পাদকীয়তে বলা

হয়েছে যে জ্যোতি বসু তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ওই ঘটনা সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্ত তাঁর দলের কর্মীদের অব্যাহিত দেওয়ার জন্য পুলিশকে দিয়ে তদন্তে ফাইনাল রিপোর্ট করিয়ে ডিসচার্জ করিয়ে দেন।

২০ বছর আগের ঘটনা যদিও, উকিল হিসাবে ওই মামলায় জামিন করানোর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু মামলা ডিসচার্জ হয়েছিল কিনা কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

এরপর রাত্রে যখন কথা হলো উনি বললেন, ''আমার যতদূর মনে পড়ে ওই মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশিট দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে মামলায় আদালত সাক্ষীর অভাবে অভিযুক্তদের খালাস দিয়েছিল। এটা যদি সত্যি হয় স্টেটসম্যানের বিরুদ্ধে আইন মতো ব্যবস্থা নিতে হবে।''

পরের দিনই আলিপুর কোর্টে খবর নিলাম। দেখা গেল আলিপুরের ১৪নং অতিরিক্ত জেলা জজ অভিযুক্তদের বেকসুর মুক্তি দিয়েছেন।

ওঁরই পরামর্শে 'স্টেটসম্যান'-এর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হলো।

অবাক হয়ে ভাবলাম আমার চেয়ে অন্তত ত্রিশ বছরের বেশি বয়সের মানুষটির স্মৃতিশক্তির কথা ভেবে। এত ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ কী করে মনে রাখলেন!

এই প্রসঙ্গে বলা যায় মানুষ বিস্মৃত এবং আদালতের নথি পাওয়া যাবে না ধরে নিয়ে বর্তমান তৃণমূল সরকার এই ঘটনার ওপর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন করেছে জ্যোতিবাবুর প্রশাসনের বিরুদ্ধে কুৎসা করার জন্য। যারা এই আদেশ দিয়েছেন তাঁরা নিজেরাই জানেন না জ্যোতিবাবুই আসল ঘটনাকে জানিয়ে মানহানির মামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন—যেহেতু ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী নিজে মামলা করেন না, তাই মামলা করেছিলেন কলকাতার পাবলিক প্রসিকিউটর অশোক বক্সী।

শাসকদলের কাছে আজও এটা অজ্ঞাত, আজকের বিচারবিভাগীয় কমিশনের জবাব জ্যোতিবাবু নিজেই দিয়ে গেছেন ১৩ বছর আগে।

প্রায় একই সময়ের আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সংশোধন আইনের বৈধতা সংক্রান্ত একটি ফাইলে সরকারের মুখ্য উপদেষ্টার দেওয়া অভিমতের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। তাঁর বক্তব্য ছিল আইনটি অবৈধ, কারণ অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভায় গৃহীত একটি আইন সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়। তৎকালীন মুখ্যউপদেষ্টা ছিলেন জ্যোতিবাবুর খুবই স্নেহধন্য, ব্যক্তিগতভাবে খুবই কাছের মানুষ আইনি জগতের তখনকার এক বিতর্কিত তারকা।

ফাইল দেখার পর আমার ডাক পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে। উনি বললেন—আমাদের দু-জনকে নিয়ে উনি নিজে বসবেন—আইনটি নিয়ে আলোচনার জন্য। মিটিং-এর আগের দিন অনেক রাত্রি জেগে ওই সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়গুলিকে পড়ে একটি নোট তৈরি করেছি। অন্ধ্রপ্রদেশের রায়টিতে সুপ্রিম কোর্টের যে আগের রায়টিকে অনুসরণ করা হয়েছিল—সেটি তার পূর্বতন রায়গুলিকে বিবেচনা না করেই দেওয়া হয়েছে। ফলে ওটি ওই বিশেষ পরিস্থিতি সংক্রান্ত।

মিটিং শুরু হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জ্যোতিবাবু তাঁর রায় দিয়ে দিলেন এবং আমার শ্রদ্ধেয় দাদাকে নাম ধরে বললেন—''You are wrong.'' আমাদের আইন অবৈধ নয়। মামলায় যা হবে দেখা যাবে।

অবাক হয়ে দেখলাম বড় সিদ্ধান্ত কত তাড়াতাড়ি নেওয়া যায়। কোনো ইতস্তত নেই সিদ্ধান্ত নেবার সময়। ছোটো না বড়, দূরের না কাছের মানুষ, দেখার কোনো বালাই নেই। রাজধর্মবোধ এই রকমই হয়। মনে পড়ল সংবিধানের শপথ—''I shall discharge my duty without fear and favour without affection or ill will.''

মিটিং শেষ হবার পরে আমায় আলাদা করে ডেকে বললেন, ''You are to compartmentalise your mind.'' এ ঘর থেকে বেরোনোর পর মিটিং-এর কোনো কথা মনে রাখবে না। ও আমার খুব প্রিয়, আমি ওকে খুব স্নেহ করি।'' আমি বললাম, ''উনি আমার নেতা, ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।''

আর একটি ঘটনা না বললে আমার অভিজ্ঞতা শেষ হবে না। আমরা সবাই গভীর, স্বল্পবাক মানুষটিকে দেখেছি। কিন্তু তাঁর মধ্যে কী রকম হাস্যরস থাকতে পারে তার স্বাদ ওদিন পেয়েছি। যাঁরা ওর সহকর্মী, কাছের মানুষ বা সাথী তাঁরা নিশ্চয়ই এমন স্বাদ হয়তো অহরহই পেতে পারেন। ঘটনাটি ঘটে বিধানসভায়।

সরকারি দলের একজন মাননীয় বিধায়ক (নাম করছি না) আক্রমণ করছেন Public Accounts Committee-র Chairman-এর ভাষণের বিরোধিতায়, 'মিথ্যাবাবু' বলে সম্বোধন করে। বেশ কিছু অভিযোগ করে শেষে বললেন, উনি বটতলার উকিল, বটতলার উকিলের মতোই কথা বলেন।

হঠাৎ সরকারি দলের প্রধান অধিনায়ক জ্যোতিবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন। কিছু বলবেন।

সবাই সচকিত।

বললেন, ''মাননীয় বিধায়কের মন্তব্যের আমি প্রতিবাদ করছি। উনি ওভাবে বটতলার উকিলের সঙ্গে ওঁর তুলনা করতে পারেন না। কারণ বটতলার উকিলদেরও একটা সম্মান আছে। ওঁর সঙ্গে তুলনা করলে তাদের মানহানি হতে পারে।''

সবাই হেসে উঠলেন। এটি একটি বিরল ঘটনা যার সাক্ষী হবার সৌভাগ্য অনেক বিধায়কের সঙ্গে আমার হয়েছিল।

যেদিন জ্যোতিবাবু বিধানসভা থেকে ৬০ বছর পর অবসর নিচ্ছেন—সেদিন বিধানসভায় জ্যোতিবাবুর অমূল্য বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরা দেখেছেন—আবেগহীন সুখ-দুঃখে অবিচল মানুষটিকে। এখনো মনে আছে—''এখানে না থাকলেও আমি মানুষের জন্যই কাজ করবো। যাঁরা আমায় ভালোবাসেন তাঁরা আমার কাছের মানুষ। কিন্তু যাঁরা আমার সমালোচনা করেন, আমি তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ কারণ তাঁরা আমার ভুল সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করেন।''

মুখ্যমন্ত্রী হিসবে শেষ দিনে বিধানসভায়

গাম্ভীর্য ঘেরা মানুষটির ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি। কিন্তু কয়েকটি ঘটনার ঝলকে তাঁকে যেটুকু দেখেছি তাতে সহৃদয়, প্রাজ্ঞ, অনুকরণীয় প্রশাসক, স্নেহপ্রবণ, হাস্যরস সমৃদ্ধ মানুষটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের এবং সমগ্র ভারতবাসীর এই অমূল্য ভারতরত্নটির স্মৃতি অমর থাকুক।

অনন্য সান্নিধ্য

দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ী

'সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়/কভু নাহি পিছু পানে ফিরিয়া তাকায়'। জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে ফেলে-আসা দিনগুলি আমায় পিছু টানে। ফেলে-আসা সময়ে কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে আমি রাজি নই, বরং যা পেয়েছি তুলনা নেই তার। বাংলার মাটি, জল, আকাশ, বাতাসে বড় হয়েছি। চোখ ভরে দেখেছি ভারতের প্রকৃতির অনবদ্য বৈচিত্র্যভরা সৌন্দর্য। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছি অসীম সুনীল আকাশের দিগন্ত নীল সমুদ্রের অনন্ত নীলে মিশে নীলিমায় নীল হয়ে গেছে। ধ্যানমগ্ন তুষারমৌলী হিমালয়ের গিরিশিখরে অরুণ আলোয় রামধনু রঙের খেলা, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাতে রূপালি ঝিকিমিকি শিখিয়েছে দেশের প্রকৃতি ও তার সন্তানদের ভালোবাসতে। দেশের শহরে বন্দরে দেখেছি ধনীর প্রাসাদের পাশেই দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণকুটির। এই বৈষম্যের অবসানের সংগ্রামের জন্য চেতনায় শান দিয়েছি। সমাজতন্ত্রেই এই ধনবৈষম্য দূর করা যায় আমার মনে এই চিন্তার যিনি সূত্রপাত ঘটান তিনি আমার সেজদা অনিল লাহিড়ী আর গ্রামতুতো কাকা শ্যামেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এঁরা দুজনে জেলায় কৃষক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। মাঝে মাঝে প্রফুল্ল সান্যাল ও অনুকূল সেন আমাদের বাড়িতে মেজদার কাছে আসতেন। এক বিপ্লবী দল থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভায় যোগ দিয়েছিলেন।

একদিন আমাদের বৈঠকখানা বাড়িতে দাদার এক রাজনৈতিক সহকর্মী এলেন। অত্যন্ত সুপুরুষ। পরনে ধুতি ও গায়ে হাফশার্ট। শুনলাম বাড়ি বর্ধমান। নাম সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ। রঙপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহীতে এঁদের প্রচুর জমিদারি। ইনি অভিজাত ধনী হয়েও গরিব কৃষকদের জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইকে সংগঠিত করে চলেছেন। এঁকে তো বৈঠকখানায় বাড়িতে খাবার দেওয়া যায় না।

স্ত্রী রাবেয়া বেগম-এর সঙ্গে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ

মনসুর হবিবুল্লাহ

তাই অন্দরমহলে দরদালানে কাঁচের থালা, বাটি, গেলাসে ভাত খেতে দেওয়া হয়েছিল। আমি পরিবেশক ছিলাম। বর্ধমানে যখন কর্মসূত্রে এলাম, মনসুরদার খোঁজ নিতে গিয়ে সৈয়দ শাহেদুল্লাহর সঙ্গে পরিচিত হলাম। শাহেদুল্লাহ সাহেবের স্ত্রী রাবেয়া ভাবী আমার স্ত্রী রেবা লাহিড়ীকে মহিলা সমিতির কাজে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেন। পার্কাস রোডে ওঁদের বাড়িতে গিয়ে একদিন মনসুরদার দেখা পেলাম। তাঁকে কথাপ্রসঙ্গে একটা অনুরোধ করলাম, ''শুনলাম বর্ধমান শহরে আপনাদের অনেক জমি আছে। আমাকে একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো।'' মনসুরদা তখনই দাদাকে (সৈয়দ শাহেদুল্লাহ) বললেন, ''দাদা, দেবেনবাবুর পছন্দমতো একটা জয়গা ওঁকে দিতে হবে মনে রাখবেন।''

এক রবিবারে শাহেদুল্লাহ সাহেব বৃদ্ধ নায়েবমশাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি জমি পছন্দ করার জন্য তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন। রিক্সায় ঘুরে ১০/১২টা জমি দেখার পর খ্রিস্টান কবরখানার কাছের জমিটা পছন্দ করে দিলাম। নায়েবমশাই ৪টে পিলার তৈরি করে রাখার হুকুম দিয়ে মটরদার বাড়ি চলে গেলেন। পরের রবিবারে জমি মেপে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পিলার ৪টি পুঁতে দিয়ে গেলেন। মাসখানেক পরে একদিন মটরদা নিজে ষষ্ঠীদের বাড়িতে এসে বায়নানামা দিয়ে একশো টাকা নিয়ে গেলেন। তিনি বলে গেলেন, যখন যেমন পারবেন গদিতে নায়েব মশাইয়ের কাছে টাকা জমা দেবেন। বাকি ৭২৫ টাকা ৮-৯ মাসে শোধ করেছিলাম। ওঁদের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে স্থিতিশীল হতে পেরেছি। কমরেড-সুলভ দুর্লভ আচরণ ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব আমাকে মোহিত করেছে। বৈভব ও বিত্ত মানুষকে আত্মসুখী করে। এঁদের দুই ভাইয়ের মধ্যে তার বৈপরীত্য দেখে বিস্মিত হয়েছি। মটরদার সরল সাধারণ জীবনযাপন, তাঁর

বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানতৃষ্ণা ও পাঠনিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করেছে। শেষ জীবনে মটরদা কলকাতায় বেকবাগানে থাকতেন। বর্ধমানে মাঝে মাঝে এসে দু-তিন দিন থেকে যেতেন। বর্ধমানে এলে আমাদের পাড়ায় নিতাই চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে আমাদের বাড়িতে আসতেন। এ কাজটি তাঁর বাঁধাধরা রুটিন মাফিক কাজ ছিল।

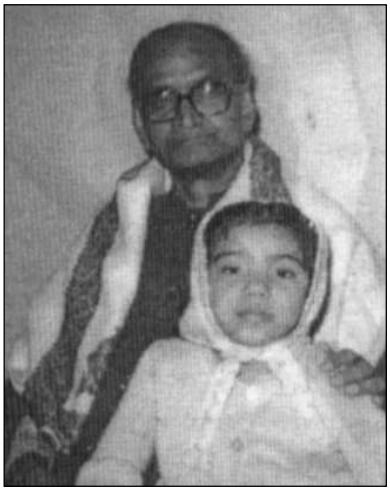

বিনয় চৌধুরী

বিনয়দার (বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী) সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনক্ষণ আজ আর মনে নেই। তবে একটি ঘটনা এখন স্পষ্ট মনে আছে। তখনকার পার্টি অফিসের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, বিনয়দার মা আগে আগে উঠছেন আর গাল পাড়ছেন, ''ওরে মেনিমুখো আঁটকুড়ের ব্যাটা, অমন সোনাফলানো দোজমিটা বিক্রি করে দিলি। ওরে লক্ষ্মীছাড়া, নাতিপুতিরা খাবে কী?'' বিনয়দা বারান্দায় একটা টেবিলের সামনে মুখ নীচু করে চুপচাপ বসেছিলেন। মা অন্যান্য কমরেডদের সামন যাচ্ছেতাইভাবে গাল দিয়ে চলেছেন সমানে। এমন সময় বুড়িদি সিঁড়ি দিয়ে উঠে বললেন, ''মাগো, দাদাকে বোকো না, দাদা জমিটা বন্ধক দিয়েছে, বেচে দেয়নি। পরে ছাড়িয়ে নেবে। চলো ঘরকে চলো।'' বুড়িদি দাদাকে হেনস্থা থেকে বাঁচিয়ে মাকে নিয়ে গেলেন। প্রকৃত তথ্য অজানা রইল না। বিশু সেন জানালেন পার্টির অর্থাভাব মেটাতে ওই জমি বিক্রি করে সব টাকাই পার্টি ফান্ডে দিয়ে দিয়েছেন। এই অসামান্য আত্মত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা ও পার্টির প্রতি দরদ আমাকে তাঁর প্রতি চম্বুকের মতো আকর্ষণ করেছিল। তিনি ক্রমে হয়ে উঠেছিলেন আমার রাজনৈতিক অভিভাবক। তাঁর অনন্য সান্নিধ্য ও স্নেহধন্য ভালোবাসা আমার ব্যক্তিজীবন বিকাশে অপরিসীম অবদান রেখে গেছে।

অমোদবিহারী বসু

এঁদের স্নেহ ভালোবাসা আমাকে শিক্ষক জীবনে সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ থাকতে শিখিয়েছে। সত্যপ্রিয় রায়, অনিলাদি, অমোদবিহারী বসুর নেতৃত্বে শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। তদানীন্তন শাসকদলের এত আন্তরিকতা বোধহয় সহ্য হয়নি। ১৯৭২ সালের এক গভীর রাতে ৪/৫ জন দুষ্কৃতী আমার বাড়ি আক্রমণ করে। নীচে থেকে ডেকে সাড়া দিলে জানালা লক্ষ্য করে পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বিনয়দা সকালে খবর পেয়ে আমার বাড়িতে আসেন। তিনিই গুলির খোলটা খুঁজে পেলেন। নীচে থেকে জানালার উচ্চতা অনুমান করে নিয়ে বললেন, ''অতটা উঁচুতে গুলি ওঠেনি। আপনি আলোর ফ্লাশ দেখেছেন।'' ব্যাপারটা ঠিক তাই। আলোর ঝিলিক দেখেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ি। নীচের পাল্লা দুটি বন্ধ ছিল তাই গুলি লাগেনি। বিনয়দা সবকিছু দেখেশুনে কয়েকটি রাস্তায় একা চলতে নিষেধ করে গেলেন। মাস খানেক পরে বাড়িতে বোমাবাজি করল। বিনয়দা কুড়মুনে থাকার নির্দেশ পাঠালেন।

কুড়মুনে প্রথমদিকে রাত্রিতে স্কুলের দোতলার দক্ষিণের ঘরে থাকতাম। দুইজন নৈশপ্রহরী ছিল। কিন্তু একদিন দিনের বেলায় স্কুল চলাকালীন সময়ে এক ট্রাক ভর্তি দুষ্কৃতী নিয়ে কংগ্রেসি বিধায়ক কাশী তা স্কুলে বোমাবাজি করে। তখন স্কুল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী তাঁর নিজের সুরক্ষিত দ্বিতল বাড়িতে একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পর আমাদের স্কুলের সহ-শিক্ষিকা রাজলক্ষ্মী চ্যাটার্জি আক্রান্ত হয়। তার পিঠে ছোঁড়া বোমাটি না ফাটায় সে প্রাণে বেঁচে যায়। তারও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এইসব সন্ত্রাসের কাণ্ড দেখে সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় আশ্রয়দাতাও ভয় পেয়ে যান। দেবু দত্তদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। রাজলক্ষ্মীর যাতায়াতের বিপজ্জনকতার কথা ভেবে লাল্টুদের বাড়িরে দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে থেকে স্কুল করতাম। আমাদের নিরাপত্তার বিষয়ে সজাগ থাকার জন্য বিনয়দা কমরেড দত্তকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল ও খারাপ হতে থাকলে আমি কুড়মুন স্কুল ছেড়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার রাজিবপুর এ.ভি. হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দিই। ওই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শরদিন্দু ভদ্র ছিলেন পার্টি সদস্য। আমার রাজনৈতিক পরিচয় কমরেড ননী করকে জানিয়ে নিরাপত্তা বিষয়ে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন বিনয়দা। আমি স্কুল হস্টেলে থাকতাম। বিকেলে রাস্তায় একাই বেড়াতে বের হতাম। যখনই রাস্তায় একা বেড়াচ্ছি তখন একটা অচেনা বিশেষ লোককে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে অনুসরণ করতে দেখতাম। একদিন শরদিন্দুবাবুকে একান্তে এই ঘটনার বিবরণ দেওয়ায় তিনি বললেন পার্টির নির্দেশে আপনার উপর নজরদারি চলছে। টিকটিকি নয়, ও পার্টিকর্মী। যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। এই স্কুলের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। বেতন অনিয়মিত। তাই এক বছর পর নদীয়া জেলার শেষ সীমান্তে যমশেরপুর বি.এন. হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দিলাম। এখানেও করিমপুরের কমিউনিস্ট নেতা সমরেন্দ্র সান্যালকে বলে দিয়েছিলেন আমার রাজনৈতিক পরিচয়। তিনি মাঝে মাঝে আমার খরবাখবর নিতেন। বিনয়দা রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করেছিলেন। আমি তা অমান্য করিনি।

একদিন কালোদার (শিবশংকর চৌধুরীর) বাসায় আমার ডাক পড়ল। শিবশংকর চৌধুরী বিপ্লবী দলভুক্ত হয়ে জেলে থাকার সময় কমিউনিস্ট মতাবলম্বী হন। জনসেবার জন্য বর্ধমান জেলায় তাঁর অতুলনীয় খ্যাতি। ওঁর কথা পরে আলোচনা করব। দেখা করার নির্দেশ পেয়ে কালোদার বড়বাজারের ডেরায় গিয়ে দেখি তিন চৌধুরী মাদুরে বসে আছেন—বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, শিবশংকর চৌধুরী, সুবোধ চৌধুরী (চট্টগ্রাম যুব বিদ্রাহের একজন সৈনিক)। চৌধুরী-ত্রয়ীর সঙ্গে শতরঞ্চিতে বসতেই কালোদা এক কাপ চা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ''খান।'' আমি বললাম, ''আমি তো চা খাই না।'' সুবোধদা বললেন, ''কালোদা তৈরি করেছেন, তাছাড়া এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন?'' উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতো

শিবশংকর চৌধুরী

করে চা খেলাম। পাকা গিন্নির মতোই কালোদা চা তৈরি করেছেন। বিনয়দা ও সুবোধদা চা পান শেষে কাপ দুটি ধুয়ে পরিষ্কার করে দেওয়ালের তাকে রেখে বসলেন। আমি কাপটা হাতে নিয়ে উঠতে যাচ্ছি অমনি কালোদা আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে কাপটা ছিনিয়ে নিজেই ধুয়ে মুছে নিজেরটার সঙ্গে তাকে রেখে দিলেন। বিনয়দা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ''এটা কী হলো কালো? দেবেনবাবুর বেলায় এ পক্ষপাতিত্ব কেন? আমাদের ক্ষেত্রে এক নিয়ম আর ওঁর ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম?'' ''আহা, বোঝেন না কেন, রেবা ওঁকে গেরস্থালির কাজ শিখিয়েছে নাকি? মাঝ থেকে আমার একটা ভালো কাপ ভেঙে যেতো। এতে পার্সিয়ালিটি কোথায়?'' সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো, আমি লজ্জায় ও সংকোচে চুপ করে ছিলাম।

বিনয়দা এবার কাজের কথায় এলেন, পার্টি-সদস্য হতে হবে। সুবোধদা ফর্ম নিয়ে যাবেন তা পূরণ করে দুটি টাকা দিতে হবে। এ নির্দেশ উপেক্ষা করার সাধ্য আমার ছিল না। সত্যপ্রিয় রায়ের মতো প্রবাদপ্রতিম শিক্ষকনেতা জীবনের অপরাহ্নে পৌঁছে এই পার্টির সভ্য হয়েছিলেন। ওঁর তুলনায় আমি তো চুনোপুঁটি মাত্র। কালোদা অকৃতদার ছিলেন কিন্তু তাঁর সাজানো গোছানো ঘর দেখে অপরিচিত লোকেদের পক্ষে এ তথ্য বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁর কারাজীবনে জেলার সাহেবের তাঁর প্রতি অকথ্য অত্যাচারের কথা হাসিমুখে বলে যেতেন। জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' বইখানিতে নাকি তাঁর প্রতি পুলিশের দৈহিক নির্যাতনের বিবরণ লিখিত আছে, আমাকে বলেছিলেন। এই মানুষটির সেবাপরায়ণতা চিরস্মরণীয় করে রাখা হয়েছে বাবুরবাগে তাঁর নামাঙ্কিত সেবাসমিতিতে।

বিভা কোঙারের সঙ্গে আমার স্ত্রী রেবা মহিলা সমিতির কাজ করতো। তেঁতুলতলার বাসায় প্রথম আলাপ হরেকৃষ্ণ কোঙারের সঙ্গে। আমাকে 'মাস্টার' বলেই ডাকতেন। মেমারির বিশিষ্ট ধনী শরৎ কোঙারের বড় ছেলে। বাপের ইচ্ছে ছেলে বিলেত থেকে পড়ে ব্যারিস্টার হবে। সেই ছেলে কিনা কংগ্রেস অফিসের বড়ো চালাঘরে দিনরাত কাটাচ্ছে। আশাভঙ্গের বেদনামথিত চিত্তে বাবা এলেন ছেলেকে ফিরিয়ে নিতে। ছেলে বাঁশের খুঁটি জড়িয়ে আছে। বাবা ডান হাত ধরে টানছেন। বাম হাত ধরে টানছেন বিজয় ভট্টাচার্য। ছেলেকে ঘরে ফেরাতে ব্যর্থ হলেন বাবা। লাভ হল মেমারিবাসীর। তারা পেল একটা হাসপাতাল, আধুনিক চিকিৎসার একটি প্রতিষ্ঠান। হরেকৃষ্ণর ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য যে পরিমাণ অর্থ তিনি সঞ্চয় করে রেখেছিলেন তা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করলেন। মাতৃহীন সন্তানের প্রতি স্নেহ ফল্গুধারার মতো পিতৃহৃদয়ে প্রবহমান ছিল তার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। হরেকৃষ্ণ কোঙার খ্যাতনামা জননেতা, অসাধারণ বাগ্মী, কৃষক আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা। কালনা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে হরেকৃষ্ণ কোঙার পার্টির প্রার্থী। সে সময় মহিলা কর্মীর সংখ্যা জেলায় খুবই কম ছিল। বিভাদি, রেণু ঘোষ, রেবা লাহিড়ী গ্রামে গ্রামে হরেকৃষ্ণদার পক্ষে প্রচার করছেন। রাত্রে ফিরছেন মেমারির বাড়িতে। দিন বিশ কোনো খবর নেই। একদিন তাই মেমারির বাড়িতে খবর

বিভা কোঙার

নিতে গেলাম। পুকুর, বাগান নিয়ে বিশাল দোতলা বাড়ি। বৈঠকখানা ঘর ঢুকতেই এক প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি কে, কী চাই?'' —''আমি রেবা লাহিড়ীর খোঁজে এসেছি।'' —''বড় বৌমার সঙ্গে কেষ্টর ভোটের প্রচারে বেরিয়ে গেছে। কোনো চিন্তা করো না। আমি নিজে ওদের সুবিধে অসুবিধের দিকে নজর রাখছি। আমার বাড়ির অতিথি বলে কথা।'' আমি বললাম, ''আপনি অনুমতি দিলে রানী কোঙারের সঙ্গে দেখা করে যাই। এসে পড়েছি, দেখা না করে ফিরে গেলে পরে অভিযোগ শুনতে হবে।'' এক চাকরকে ডেকে তিনি বললেন, ''একে অন্দরে ছোটো বৌমার কাছে নিয়ে যা।'' অন্দরমহলে বিনয় কোঙারের সঙ্গে দেখা হল। কথা প্রসঙ্গে ভোটের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হল। তিনি বললেন, ''গ্রামাঞ্চলে পার্টির পক্ষে ভালো ভোট হলেও কিন্তু মেমারি বাজার এলাকার অবস্থা ভালো না। তা সত্ত্বেও দাদা জিতবেন। বাবাকে দিয়ে বলানো যাচ্ছে না এইটাই সমস্যা। বাবা যদি বুড়োদের আড্ডায় একটিবার বলেন যে ছেলেটা ভোটে দাঁড়িয়েছে তোমরা একটু দেখো—তাহলেই হয়ে কেল্লা ফতে। দাদার প্রতি অভিমান এতটাই যে বাবা এ কথাটা বলবেন না। আপনি এসেছেন, অনুরোধ করে দেখুন, একটু বাবাকে নরম করা যায় কিনা। খুব সাবধানে কথাটা পাড়বেন।''

আমি বাইরে বৈঠকখানা ঘরে এসে দুই পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পদধূলি নিয়ে বললাম, ''আপনার দানশীলতার কথা অনেক শুনেছি। আজ সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়ায় নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপনার সযত্ন তদারকিতে মেয়েরা রয়েছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরছি। ফিরে যাওয়ার আগে ছোটো একটা অনুরোধ করবো। অপরাধ যদি হয় মনে করেন তবে আপনার মতো মহানুভব ব্যক্তি আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে।''

''কী কর তুমি?'' —''আমি হেডমাস্টারি করি।'' —''কথার বাঁধুনি তোমার এই জন্যই ভালো। তোমার অনুরোধ কী শুনি।'' —''কেষ্টদা ভোটে দাঁড়িয়েছেন। আপনার সম্মান রক্ষা করে মেমারি বাজার এলাকায় বয়স্কদের আড্ডায় আপনি যদি বলেন—কেষ্ট ভোটে দাঁড়িয়েছে, তোমরা একটু দেখো। 'তোমরা একটু দেখো' এইটুকু বলা যদি অসম্মানজনক মনে করেন তাহলে শুধু ভোটে প্রার্থী হওয়ার খবর তাদের কানে তুলে দেবেন। মেমারি বাজারে আপনার যা মূল্যবান অবদান ও জনপ্রিয়তা তাতে মানুষ আপনার মুখ থেকে সংবাদটা শুনে তাঁদের

করণীয় ঠিক করে নিতে চায়।''

সপ্তাহখানেক পরে বিনয় কোঙারের সঙ্গে দেখা। জানতে পারলাম—''ওষুধ ধরেছে। বাবা আড্ডায় বলতে শুরু করেছেন, 'ওগো ছেলেটা ভোটে দাঁড়িয়েছে, আমার মত নেয়নি তবু আমাদের সম্মানটা রেখো।' '' সেবার ভোটের ফলে দেখা গেল মেমারি শহর ও বাজার এলাকায় overwhelming majority ভোট পেয়েছেন কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার। কালনা বিধানভা কেন্দ্র বহু ভোটের ব্যবধানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে পরাজিত করে হরেকেষ্টদা জিতেছিলেন।

হরেকৃষ্ণ কোঙার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষক আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা। ভিয়েতনামের রাষ্ট্রনায়ক হো-চি-মিনের সঙ্গে এবং চীনের জননেতাদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল।

বক্তা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর সুখ্যাতির গল্প বলি। কলকাতার 'Institute of English'-এ চার মাসের D.E.L.T. কোর্স পড়েছি। আমি বয়োঃজ্যেষ্ঠ ছাত্র তার ওপর প্রধান শিক্ষক। অধ্যক্ষ কোলস্ সাহেবের সুপারিশে আমি ভর্তি হয়েছিলাম। তাই ছাত্রছাত্রীরা অধ্যক্ষ সাহেবের কাছে আমার মাধ্যমে আবেদন নিবেদন রাখতেন। আমি ছিলাম অলিখিত ক্লাস মনিটর। হাওড়া ময়দানে হরেকেষ্টদার সভা। শিবপুরের সহপাঠিনী আমাকে এসে ধরলেন, তিনি মিটিং শুনতে যাবেন। টিফিন পিরিয়ডের পর কলেজ ত্যাগের অনুমতি চাই। তাকে নিয়ে অধ্যক্ষ সাহেবের ঘরে গেলাম। যে কথাবার্তা হয়েছিল তা বলছি।

Principal : What's the matter?

—Sir, she strongly desires to hear the lecture of Mr. Harekrishna Koner at Howrah Maidan. She seeks your kind permission to leave the college after tiffin period.

Principal : Who is Mr. Koner?

—Mr. Koner is a famous pesant leader of Bengal and a great orator. He usually speaks continously for hours together on current political issues. IAS students must read his book on the problem of agricultural land in Bengal.

Principal : Is it so? She may go.

অতি সহজ সরল কথায় হরেকেষ্টদা সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতেন। শ্রোতার মনে তা গভীরভাবে দাগ

হরেকৃষ্ণ কোঙার

কেটে যেত। শ্রোতারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর বক্তব্য শুনে যেতেন। কর্জনায় এক বৃষ্টিস্নাত অপরাহ্নের জনসভায় হাজার দশেক শ্রোতাকে দেড় ঘণ্টা ভিজে তাঁর বক্তব্য শুনতে দেখেছি। একটি মানুষকেও সভাস্থল ত্যাগ করতে দেখিনি। আমি নিজেও বৃষ্টির ধারায় স্নাত হয়েছি। বক্তৃতা শেষে আমাকে দেখে সস্নেহে বললেন, ''মাস্টার, একদম জুবজুবে হয়ে ভিজে গেছো। গাড়িতে ওঠো। বাড়িতে পৌঁছে দেবো। বাসে ফিরতে হবে না।'' আমি বললাম, ''দেড় ঘণ্টা বলেছেন। লোকে আরও কিছুক্ষণ শুনতে চাইছিল।'' উত্তরে বললেন, ''ভিজিয়ে লাভ কী, তাই সংক্ষেপে সেরে দিলুম।''

বিনয়দার নির্বাচন। মিউনিসিপ্যাল গার্লস স্কুলে কালীবাজার গেটে আমাদের ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, পোস্টার সব পুকুরের জলে বিরোধীরা ফেলে দিয়েছে। হরেকেষ্টদাকে গিয়ে পার্টি অফিসে রিপোর্ট করে এলাম। ভোটের আগের দিন খুব ভোরে হরেকেষ্টদা চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ও অস্ত্রাগার দখলের নায়ক গণেশ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে হাজির। ''মাস্টার তোমার কতজন ভলান্টিয়ার চাই?'' সেই প্রথম দেখা গণেশ ঘোষকে। আমার বাইরের ঘরের ছয় ফুটের দরজায় ওদের দু-জনেরই মাথা ঠেকে গেল। বেশ কিছুটা নিচু হয়ে ওঁরা দু-জন ঘরে ঢুকলেন। শীতকাল, গণেশ ঘোষের গায়ে ওভারকোট ছিল। মিষ্টভাষী নিরীহ এই সুদেহী মানুষটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। কিছুক্ষণ বিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে যেন কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। হরেকেষ্টদা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আর একটা চেয়ারে গণেশ ঘোষকে বসতে বললেন। ''কী হলো মাস্টার? কথা বলছো না কেন?'' আমার ঘোর ইতিমধ্যে কেটে গেছে। আমি মিথ্যা করে বলেছিলাম, ''মনে মনে সংখ্যার হিসাব করছিলাম। জনা সত্তর তাগড়াই ভলান্টিয়ার পেলেই চলবে।'' —''সেনর‍্যালের ভলান্টিয়ার আপনাকে দেওয়া হবে।'' গণেশ ঘোষ বললেন।

''এবার উঠি মাস্টার। অনেক বাড়ি যেতে হবে।'' ওঁরা দু-জনে দরজা পেরিয়ে পথে নামলেন। ভোরের আলো ফুটে উঠল।

আপাত গম্ভীর অথচ দিলখোলা মানুষটি এমন সময় চলে গেলেন যখন আমি ঘরছাড়া। শেষ দেখাটুকু করার সুযোগ পেলাম না। দুঃসংবাদটা আমাকে বিকালে শোনালেন যমশেরপুর স্কুলের সহকর্মী অমিত সরকার। তাঁর অন্ত্রে ক্যান্সার ধরা পড়ে। তাঁর চিকিৎসার জন্য ভিয়েতনামের রাষ্ট্রনায়ক হো-চি-মিন ঔষধ পাঠিয়েছিলেন। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা বিফল হল। হরেকেষ্টদা চলে গেলেন পরবর্তী প্রজন্মের পার্টিকর্মীদের তাঁর আদর্শনিষ্ঠার উত্তরাধিকার দিয়ে। খবরটা শুনে মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। রাত্রে একা প্রধান শিক্ষকের আবাসকক্ষে ভাল করে ঘুম এল না। বর্ধমান পার্টি এক অমূল্য রত্নকে হারালো। ওঁর শূন্যস্থান কে পূরণ করবে? সারা রাত ধরে মনে হল কমরেড বিনয় কোঙার ও রামনারায়ণ গোস্বামী লাল পতাকা হাতে উত্তরাধিকারের যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছে। কমিউনিস্টদের কোনো অবস্থাতেই হতাশ হতে নেই। সেদিন রাত্রে মনে পড়েছিল আফতাব ময়দানে অনুষ্ঠিত বর্ধমান প্লেনামে পোলা রেড্ডির দলিলের বিরুদ্ধে হরেকৃষ্ণ কোঙারের ২ ঘণ্টা ব্যাপী যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্যে প্রতিনিধিরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন শুনেছি। এই প্লেনামের সময়ে সোমনাথ লাহিড়ীকে আমার বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় দু-বেলা তাঁকে দেখতে আমার বাড়িতে আসতেন। তিন-চার দিন কবির সান্নিধ্য পেয়েছি। সোমনাথ লাহিড়ী প্রখ্যাত রামতনু লাহিড়ীর বংশধর ছিলেন। মহিলা নেত্রীর মধ্যে কনক মুখার্জি, পঙ্কজ আচার্য, মঞ্জরী গুপ্ত এসে থেকেছেন। মঞ্জরীদির সঙ্গে ব্যারিস্টার সাধন গুপ্ত এসেছিলেন কোনো এক পার্টিসভা উপলক্ষ্যে। আমার ব্যক্তিগত একটা জটিল আইনের সমস্যার সহজ সমাধান করে দিয়েছিলেন।

পৌরসভার নির্বাচনে ষষ্ঠী সান্যাল ১০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী। ওর সপক্ষে প্রচারে এসেছিলেন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের অন্যতম সৈনিক অম্বিকা চক্রবর্তী। দিন দশেক আমার বাড়িতে ছিলেন।

এইসব ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট সংস্পর্শে এসে এঁদের সেবা করার সুযোগ পেয়ে নিজের চেতনাকে শাণিত করেছি।

শিবশংকর চৌধুরী সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলে আমি কথা শেষ করব। কালোদা সাইকেলে করে শহরের কর্মীদের বাড়ি টহল দিয়ে খোঁজখবর নিতেন। রেবা ছিল তাঁর একটা বোন। ছোটো বোনোর প্রতি হুকুমও চালাতেন হাসিমুখে। আমাদের বাড়ির টিউবওয়েলের জল খেয়ে মনে হয়েছিল জলে লোহার ভাগ বেশি। আমাদের এলাকায় তখন নলবাহিত পৌরসভার পরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না। কালোদা পৌরপতি শৈলেশ ব্যানার্জিকে ধরে নিয়ে এসে ওই জল খাইয়ে পাইপ লাইন বসানোর অনুমতি আদায় করে নিলেন। আমাকে না জানিয়ে পাইপের মাপ নিয়ে কলকাতার ভাইপোর দোকান থেকে লরিতে প্রয়োজনীয় পাইপ এনে ফেলেছেন 'যুগসাহিত্য' দোকানে। ন্যাড়াকে (ভাইপো) ঠেলাগাড়ি করে মাল আমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলেছেন। ওয়াটার ওয়ার্কস-এর সুপারিনটেনডেন্টকে নির্দেশ দিয়েছেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পাইপ লাইন বসিয়ে দিতে হবে। তখন কিশোরকণা স্কুলে কাজ করি। সন্ধ্যায় ফিরে দেখি বারান্দা ভর্তি পাইপ। এত টাকা কোথায় পাব? রেবা বললে, ''কালোদার কীর্তি।''

পরদিন সকালে সুলতান মিস্ত্রি নিয়ে সুধাংশুদা হাজির। ''আজ থেকেই লাইন বসাবার হুকুম হয়েছে কালোদার। কাল লোকজন এনে কাজ শেষ করে দেবে। আমাকে কাজের সময় সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কথা দিতে হয়েছে।

রবিবারে বিকেলে কালোদা এসে হাজির। ঘরে ঢুকে বললেন, ''রেবা তোমার কলের জল খেতে এলুম।'' রেবা প্লেটে দুটি মিষ্টি ও এক গ্লাস জল দিল। জল খেয়ে বললেন, ''এবার ঠিক আছে জল।'' ''তা তো হলো কালোদা, পাইপের দাম তো অনেক।'' ''ভাইপোর দোকানের পাইপ। টাকা জোগাড় হলে দেবেন। আমি ফোন করে আমার দরকার বলে চেয়েছি। কত দর তা কি জানি? আস্তে আস্তে দেবেন, তাড়া কিছু নেই।''

এই পরোপকারী, সেবাব্রতী, অজাতশত্রু মানুষটি বর্ধমান সদর থানার কাছে বি.সি. রোডের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে নিহত হন। প্রতিটি জলবিন্দু পানের সময় কালোদার কথা মনে পড়ে। সমাজতন্ত্রই বিশ্বের মানুষের ভবিষ্যৎ। শোষণ-মুক্ত সাম্যবাদী সমাজ মানুষই গড়ে তুলবে। এঁদের অনন্য সান্নিধ্যে এসে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে।

With best compliments of

AMC EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

Burnpur, Burdwan

Sl. No. 2

- ☑ মানসিক রোগ শারীরিক রোগের মতোই, কুসংস্কারের শিকার হবেন না।
- ☑ অধিকাংশ মানসিক রোগ সঠিক চিকিৎসায় সেরে যায়, চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন।
- ☑ মানসিক রোগীর বিয়ে দেবার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করুন।
- ☑ দুশ্চিন্তা বা অনিদ্রার ওষুধ নিজে নিজে ব্যবহার করা উচিত নয়, এতে দীর্ঘমেদায়ী ক্ষতি হতে পারে।
- ☑ অধিকাংশ মানসিক রোগীর চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী, ধৈর্য হারাবেন না।
- ☑ চিকিৎসকের অনুমতি ছাড়া মনোরোগের ওষুধ চলাকালীন গর্ভধারণ বা স্তন্যদান করবেন না।

উত্তরণ

মানসিক স্বাস্থ্য প্রকল্প

খোশবাগান, বর্ধমান
যোগাযোগ : ৯৪৩৪০৫৮২৭৫

Sl. No. 10

খাদ্য নিরাপত্তা : মানুষ ঠকানোর কৌশল রাজ্যে আশঙ্কা

মদন ঘোষ

খাদ্য নিরাপত্তা বিল, ২০১৩ সংসদের উভয় সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলেই আইনে পরিণত হবে। বিষয়টি বহু আলোচিত। তথাপি এর আনুপূর্বিক আলোচনা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যেহেতু আইনটি প্রকাশিত হয় নি তাই বিলটির ভিত্তিতেই আলোচনা করা হচ্ছে।

খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা

১৯৯৬ সালে বিশ্ব খাদ্য সংক্রান্ত শীর্ষ বৈঠকে খ্যদ্য নিরাপত্তার যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় সেটি হল, ''Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.'' (World Food Summit, 1996) অর্থাৎ ক্ষতিকারক নয় এমন পুষ্টিকর যথেষ্ট পরিমাণ পছন্দ মাফিক খাবার সংগ্রহের আর্থিক সামর্থ্য প্রত্যেকের থাকতে হবে এবং তাকে তার কর্মক্ষম সুস্থ জীবন যাপনের সহায়ক হতে হবে। এই সংজ্ঞাটিকে ধরে চারটি বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল : 1. **Food availability** : The availability of sufficient quantities of food of appropriate quality, supplied through domestic production or imports (including food aid). 2. **Food access** : Access by individuals to adequate resources (entitlements) for acquiring appropriate foods for nutritious diet. Entitlements are defined as the set of all commodity bundles over which a person can establish command given the legal, political, economic and social arrangements of the community in which they live (including traditional rights such as access to common resources). 3. **Utilization**: Utilization of food through adequate diet, clean water, sanitation and healthcare to reach a state of nutritional well-being where all physiological needs are met. This brings out the importance of non-food inputs in food security. 4. **Stability**: To be food secure, a population, household or individual must have adequate food at all times. They should not risk losing access to food as a consequence of sudden shocks (e.g., an economic or climate crisis), cyclical events (e.g., seasonal food insecurity). The concept of stability can therefore refer to both the availability and access dimension of food security.

এর সারমর্ম হল : (ক) গুণমান ঠিক রেখে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য পেতে হবে। (খ) কোনো ব্যক্তির পুষ্টিকর খাবার সংগ্রহের জন্য রসদ বা খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ চাই। (গ) কোনো ব্যক্তির পুষ্টিবিধান ও মানসিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যথেষ্ট খাবারের সাথে সুপেয় পানীয় জল, শৌচ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা দরকার। (ঘ) কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা জনগোষ্ঠী যেন সব সময়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাবার পায়। দুর্বিপাক বা অন্য কোনো কারণে সাময়িকভাবেও যেন খাদ্য পাওয়ায় বিঘ্ন না ঘটে। ম্যাকলিন ও নলাপো (Nhlapo) ২০০৪ সালে তাঁদের লেখায় জানিয়েছেন যে ৫৪টি খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে আইনি বিধান করেছে।

কী আছে খাদ্য নিরাপত্তা বিলে?

বিলের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল : (১) জনগণনার প্রকাশিত হিসাব অনুসারে কোনো রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে বা শহরাঞ্চলে কত সংখ্যক মানুষ 'লক্ষ্যনির্দিষ্ট (টার্গেটেড) গণবণ্টন ব্যবস্থা'-র আওতায় আসবে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যভিত্তিক নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেবে। (২) গ্রামাঞ্চলে মোট ৭৫ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে মোট ৫০ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তার আওতায় আসবে। (৩) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় যতগুলি পরিবার অন্তর্ভুক্ত সেটা বাদ দিয়ে কতগুলি পরিবার 'লক্ষ্যনির্দিষ্ট (টার্গেটেড) গণবণ্টন ব্যবস্থা'-র সুযোগ পাবে সেটা রাজ্য সরকার স্থির করবে। (৪) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাভুক্ত পরিবারগুলি মাসে ৩৫ কেজি হিসাবে খাদ্য পাবে। কিন্তু 'লক্ষ্যনির্দিষ্ট (টার্গেটেড) গণবণ্টন ব্যবস্থা'-র অধীনে বাকি পরিবারগুলি মাথাপিছু মাসে ৫ কেজি করে খাদ্যশস্য পাবে। রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে গমের বদলে আটাও দিতে পারে। (৫) খাদ্যশস্যের দাম (কেজি প্রতি) : চাল ৩ টাকা, গম ২ টাকা, ও অন্য মোটা দানাশস্য ১ টাকার বেশি হবে না। *এই দাম আইন চালু হওয়ার দিন থেকে ৩ বছরের জন্য চালু থাকবে। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার সময় সময় যে দাম স্থির করবে সেই দাম চালু হবে।* (৬) এই আইনের আওতায় আইসিডিএস প্রকল্প, বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প ও খাদ্য সহায়তা প্রকল্পগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে। (৭) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রস্তুত করা তালিকা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় এমন জায়গায় টাঙিয়ে দেবে এবং সময় সময় এই তালিকা সংশোধন করবে। (৮) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি এই প্রকল্পের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে—(ক) বাড়ির কাছে বণ্টন ব্যবস্থা করবে, (খ) প্রকল্পের স্বচ্ছতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ও খাদ্য অন্যত্র চালান আটকাতে সমগ্র পরিবহণ ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করবে, (গ) আধার কার্ড ব্যবহার করবে, (ঘ) হিসাবপত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখবে, (ঙ) একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বন্টিত দ্রব্যসামগ্রী অন্যভাবে ব্যবহার আটকাবে, (চ) চালু বন্টন ব্যবস্থা শস্য ব্যাঙ্কের প্রয়াসকে সহায়তা দেবে, (ছ) খাদ্যশস্য দেওয়ার বদলে অর্থ, খাদ্য কুপন বা কেন্দ্র নির্ধারিত অন্য প্রকল্পের ব্যবস্থা করবে। (৯) নারীর ক্ষমতায়ন : ১৮ বছরের কম বয়স নয় পরিবারের এমন জ্যেষ্ঠা মহিলাকে পরিবারের প্রধান হিসাবে গণ্য করে তাঁর নামেই পরিবারের রেশনকার্ড দেওয়া হবে। (১০) অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা : কেন্দ্র নির্ধারিত পথে রাজ্য সরকার রাজ্যস্তরে একটি খাদ্য কমিশন গঠন করবে এবং প্রতিটি জেলায় অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একজন অফিসার নিয়োগ করবে। সকলের বেতন, ভাতা ইত্যাদি ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করবে। রাজ্য কমিশনের কার্যপদ্ধতি বিলে দেওয়া আছে। রাজ্য সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতেও সময়ের মধ্যে জেলায় অভিযোগ দাখিল করতে হবে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় আধিকারিকদের দায়িত্ব

খাদ্য নিরাপত্তা বিলে যেভাবে তিনটি স্তরে দায়িত্ব নির্ধারণ করা আছে সেগুলোর সারসংক্ষেপ হল : **কেন্দ্রের দায়িত্ব** : (ক) কেন্দ্রীয় সরকার নিজে ও রাজ্য মারফৎ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করবে এবং রাজ্যের নির্ধারিত ধার্য বরাদ্দ নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করবে। (খ) কেন্দ্র-নির্ধারিত গুদামে রাজ্যে নিজ ব্যয়ে পরিবহণ করবে, রাজ্যের অভ্যন্তরে পরিবহণ ব্যয়, হস্তান্তর করা ও ডিলারদের কমিশন দেবে। (গ) বিভিন্ন পর্যায়ে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত গুদাম নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বহন করবে। (ঘ) যদি কেন্দ্র থেকে নির্ধারিত বরাদ্দ সরবরাহে ঘাটতি হয় তবে ঘাটতি খাদ্য সংগ্রহের জন্য অর্থ বরাদ্দ করবে। এর পদ্ধতি-প্রকরণ কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করবে।

রাজ্যের দায়িত্ব : (১) কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তর নির্ধারিত প্রাপক নির্দিষ্ট করবে ও প্রাপ্ত বরাদ্দ উপভোক্তাদের কাছে রাজ্য সরকার পৌঁছে দেবে। ২(ক) কেন্দ্র-নির্ধারিত গুদামে ও মূল্যে খাদ্য বুঝে নেবে, রাজ্যের অভ্যন্তরে আবণ্টন করবে ও পূর্বনির্ধারিত ডিলারদের কাছে পৌঁছে দেবে। (খ) উপযুক্ত প্রাপকরা যাতে নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য পায় তা সুনিশ্চিত করবে। (৩) কম সরবরাহের কারণে যদি যোগ্য প্রাপকরা খাদ্য ও রান্না করা খাবার না পায় তবে খাদ্য নিরাপত্তা ভাতা দেবে। ৪(ক) রাজ্য, জেলা ও ব্লকস্তরে খাদ্য নিরাপত্তা বিধি অনুসারে ও খাদ্য-নির্ভর অন্যান্য প্রকল্পের পর্যাপ্ত মজুত রাখার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি-নির্ভর গুদাম নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। (খ) গণবণ্টন বিধি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন অনুসারে ন্যায্যমূল্যের দোকানের লাইসেন্স দেবে।

স্থানীয় আধিকারিকদের দায়িত্ব : এই আইন যথাযথ রূপায়ণের দায়িত্ব স্থানীয় আধিকারিকদের। কেন্দ্রীয় আইনের বিধিগুলির পরিপন্থী নয় এমন দায়িত্ব রাজ্য সরকার মারফৎ স্থানীয় আধিকারিকদের দিতে পারে।

সি পি আই (এম)-এর দাবি ও যুক্তি

সি পি আই (এম) শুরু থেকে দাবি করে আসছে যে, (১) বিভাজন না করে সকলের জন্যই গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখা হোক। এক্ষেত্রে বড়জোর আয়করদাতাদের বাদ দেওয়া যেতে পারে। (২) বাকি সব পরিবারকে সর্বোচ্চ ২টাকা দরে মাসে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য গণবণ্টন ব্যবস্থা মারফৎ সরবরাহ করা হোক। এই দাবির যুক্তি হল : (ক) কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক নীতি বাজারকে নিয়ন্তাশক্তি করায়, একচেটিয়া কারবারিরাই বাজারের নিয়ন্ত্রণ করছে। এরই সাথে ডলারের সাথে ভারতীয় মুদ্রা টাকাকে বেঁধে ফেলায়, পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ছে। এর প্রভাব পড়ছে বাজারে। সব মিলে গরিব-মধ্যবিত্তের হেঁসেল সামলাতে নাভিশ্বাস উঠছে। এমন কোনো খাদ্যসামগ্রী নেই যার দাম বাড়েনি। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী (১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩) খাদ্যপণ্যের পাইকারি মূল্যসূচক তিন বছরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আগস্ট মাসে খাদ্যপণ্যের পাইকারি দাম বেড়েছে ১৮.১৮ শতাংশ। সবজির দাম গত বছরের জুলাই মাসের তুলনায় এবছর জুলাই মাসে বেড়েছিল ৪৬.৫৯ শতাংশ, আগস্ট মাসের তুলনায় বেড়েছে ৭৭ শতাংশ। সবথেকে বেশি বেড়েছে পিঁয়াজের দাম—২৪৫%। 'টাইম্‌স অব ইন্ডিয়া' ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ লিখেছে, ২০০৪ থেকে ২০১৩ সালে খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছে ১৫৭ শতাংশ ও সবজির দাম বেড়েছে ৩৫০ শতাংশ।... কিন্তু যদি কেউ গভীরভাবে আলোচনা করেন তখন এটা ভেবে কষ্ট পাবেন যে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় সবজি উৎপাদক দেশ। তা সত্ত্বেও ধারাবাহিক কম যোগান এবং মজুতদারি সবজির ৩৫০% সর্বনাশা মূল্যবৃদ্ধির কারণ।... এমনকি নুনের দামও বেড়েছে ৮৫%। লক্ষণীয় বিষয়, বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমও মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে যে, বিশ্বের যে-কোনো দেশের তুলনায় আমাদের দেশেই মূল্যবৃদ্ধির হার সব থেকে বেশি ৯.৬%। অন্য দেশগুলিতে ১ থেকে ৩ শতাংশের মধ্যে। (খ) ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির কারণে দারিদ্রসীমার ওপরের অংশ এপিএল রেশনকার্ডের মালিকরা রেশন দোকান থেকে চাল-গম তুলছেন অতীতের তুলনায় অনেক বেশি হারে। ২০১০-১১ আর্থিক বছর থেকে ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই সংগ্রহের হার ৯০%। এটা আমাদের দাবির যৌক্তিক যথার্থতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। (গ) ২০১১-এর সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে ভারতে মোট পরিবার ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ। দেশের খাদ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে ২০১৩ সালের ৩১ মার্চ দেশে অন্ত্যোদয় অন্ন

যোজনা, বিপিএল কার্ড ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৪৩ লক্ষ, ৮ কোটি ৬৮ পরিবারের—এই দুটি অংশ মিলে মোট ১১ কোটি ১১ লক্ষ পরিবারের। খাদ্য নিরাপত্তা আইনের আওতায় ৬৭% পরিবার এলে পরিবার-সংখ্যা হবে প্রায় ১৬ কোটি ৫৫ লক্ষ। অর্থাৎ ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ বাদ পড়বে। কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রকের হিসাব অনুসারে দেশে এপিএল কার্ডধারী পরিবারের সংখ্যা ১৩ কোটি ১৭ লক্ষ। ওই মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে ৯০ শতাংশ বা ১১ কোটি ৮৫ লক্ষের বেশি এপিএল কার্ডধারী নিয়মিত রেশন দোকান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। অঙ্কের হিসাবে এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির সময় ৩ কোটি ১০ লক্ষ পরিবারকে খোলা বাজারে খাদ্যশস্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে বেঁচে থাকতে হবে। এই নিষ্ঠুরতা মেনে নেওয়া উচিত? (ঘ) এক দশকের বেশি সময় ধরে কেন্দ্রীয় সরকার অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাভুক্ত পরিবারকে মাসে ২ টাকা কেজি দরে ৩৫ কেজি চাল বা গম দিয়ে আসছে। খাদ্য নিরাপত্তা আইন চালু হলে ওই পরিবারগুলিকে চালের জন্য এক টাকা বেশি দিতে হবে। অন্যদিকে পরিবার পিছু ৩৫ কেজির বদলে চাল পাবে মাত্র ২৫ কোজি। কী বলবেন রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারক দলটিকে? বাজার থেকে ১০ কেজি চাল কেনার সামর্থ্য এদের আছে কি? কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাজন নীতিতে এই অংশকেই তো দরিদ্র (বিপিএল) থেকে দরিদ্র বা দরিদ্রতর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। (ঙ) একই কায়দায় এখনকার তুলনায় বরাদ্দ ছাঁটাই হবে বিপিএল পরিবারগুলির। তারাও মাসে ৩৫ কেজির পরিবর্তে ২৫ কেজি পাবে। তাদেরও অর্ধাহারে দিন কাটাতে হবে সপ্তাহের কয়েকটা দিন। (চ) শুধু চাল বা গমই কি অপুষ্ট শরীরে পুষ্টির অভাব পূরণ করতে পারে? প্রোটিনের জন্য মাছ, মাংস বা ডিম কেনার সামর্থ্য নেই এই পরিবারগুলির। সবুজ খাদ্য সবজি সহ সবকিছু অগ্নিমূল্য। সেজন্য অন্তত ডাল, চিনি ও রান্নার তেল কিছু পরিমাণে যুক্ত করার আবশ্যিকতা বিবেচনায় রাখা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। (ছ) কোনো ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে খাদ্য সরবরাহে ব্যর্থ হলে নগদ অর্থ দেওয়ার কথা আইনে বলা আছে। আছে 'আধার' কার্ডের কথা। নগদ অর্থ দেওয়া হবে ওই কার্ড মারফৎ। ইতিমধ্যে আধার কার্ড নিয়ে বিতর্কমূলক নানা কথা আলোচনায় আসছে। এটা নাগরিক পরিচয়পত্র বা ভোটার কার্ডের বিকল্পও নয়। তাহলে কেন 'আধার কার্ড' নিয়ে অপব্যয় করছে, জেদ ধরছে কেন্দ্রীয় সরকার? (জ) খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প প্রয়োগের একটা বড় আর্থিক দায়িত্ব চাপানো হয়েছে রাজ্য সরকারগুলির কাঁধে। এটা করা হয়েছে কোনো পরামর্শ ছাড়াই। এই ধারা দেশের ফেডারেল গণতান্ত্রিক ধারায় রাষ্ট্র পরিচালনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই সিপিআই(এম) এই কার্যধারার বিরোধিতা করেছে। সর্বোপরি (ঞ) উপভোক্তা সংখ্যা কীভাবে নিরূপিত হবে? ২০১১ সালের জনগণনা হিসাব শুধুমাত্র জেলা নয়, ব্লক ও শহর বা ঘোষিত শহরাঞ্চল ভিত্তিক প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি স্তরে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, উপভোক্তা তালিকা ও সংখ্যা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের কাছেই আছে। সেটা বিবেচনায় রেখে কেন্দ্র থেকে অর্থ কমিশনের বরাদ্দ বা এম.এন.আর.জি.এ প্রকল্প অর্থের আদলে উপভোক্তা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এমনিতেই এই প্রকল্পের আওতা থেকে অনেক সাধারণ মানুষ বাদ গেছেন। এর ওপর হিসাবের কৌশলে আরও মানুষকে বঞ্চিত করাটা অন্যায় হবে।

রাজ্যে প্রয়োগে আশঙ্কা

গত আড়াই বছর হতে চললো পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের রাজ কায়েম হয়েছে। অধিকাংশ রাজ্যবাসীই উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে, দীর্ঘস্থায়ী জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করা মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর সরকারের ধাতে নেই। নেই সে ধরনের কোনো ভাবনাচিন্তা বা পরিকল্পনা। সবটাই চলছে তাৎক্ষণিক কোনো সুবিধা বা প্রতারণাপূর্ণ কৌশল (gimmick)-এর মাধ্যমে, তাতে যদি কোনো নরম সাম্প্রদায়িকতার পথ নিতে হয় তাতেও সরকার অরাজি নয়। সে কারণে সরকার ব্যর্থ হয়েছিল ২০১১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বিপিএল তালিকা তৈরিতে। এখনও সেই তালিকা সূর্যের আলো দেখেনি।

রাজ্য সরকারের করণীয়গুলির মধ্যে—১. কেন্দ্র নির্ধারিত গ্রাহক নির্বাচন করা ও তার খসড়া মানুষের দাবি ও আপত্তি জানানোর জন্য প্রকাশ করা এবং সেই মতামতগুলিকে বিবেচনায় রেখে চূড়ান্ত করাটাই প্রাথমিক কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির সহায়তায় একাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করতে হবে। এটা ঠিক যে বিভিন্ন পর্যায়ের আধিকারিকদের উপরেই এই কাজ তুলে আনার দায়িত্ব বর্তাবে। কিন্তু রাজ্যের বিরাজমান পরিস্থিতি, স্বশাসিত সংস্থাগুলিতে একটা অংশের সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং ওই অংশটি সম্পর্কে জনমানসে ধারণা ইত্যাদি মিলে কাজটির পরিণতি কী দাঁড়াবে সে সম্পর্কে আশঙ্কা থাকছেই। অন্যদিকে শুধুমাত্র আধিকারিকদের পক্ষে একাজ করাটাও বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই মুশকিলের। তাঁরাও পরিস্থিতি বিচার করে এতটা ঝুঁকি নিতে রাজি হবেন কিনা সেটা অনুমান করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে, ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে এ কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। (২) রাজ্য সরকারের ভূমিনীতির কারণে জনস্বার্থবাহী কয়েকটি প্রকল্প যেমন জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্প রূপায়ণে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অংশ এখনও আটকে আছে। সেক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ খাদ্য মজুতের জন্য গুদাম নির্মাণের জন্য জায়গা পাওয়া নিয়ে জটিলতার আশঙ্কা থেকেই যায়। রাজ্যে চাল সংরক্ষণের গুদাম সমস্যা প্রতি বছরই অনুভূত হয়। চলতি সংগ্রহ মরশুমেও রাজ্য নিজ ধার্য সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার কারণ হিসাবে গুদাম সমস্যার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। কারণ খাদ্যশস্য রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন এফ.সি.আই. আমাদের রাজ্য সহ সারা দেশেই ভাড়াতে নেওয়া অনেক গুদাম বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুসারে কয়েক বছরই বাদেই ছেড়ে দিয়েছে। তাই সমস্যাটির চটজলদি কোনো সমাধান হওয়া মুশকিল, বিশেষত হাতে যখন সময় মাত্র কয়েকটা মাস। (৩) বিলে বিধান রাখা হয়েছে যে, কোনো রাজ্য যদি উপভোক্তাদের সময়মতো খাদ্য/খাবার পৌঁছে দিতে না পারে তবে তাকে নির্ধারিত ভাতা দেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যের। সময় এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোনো ব্যক্তি খাদ্য না পেলে তাকে বাজার থেকে বাড়তি দামেই খাবার কিনতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সহায়তা প্রকল্পের টাকা সময়মতো পৌঁছে দেওয়ার ব্যর্থতা সম্পর্কে সকলেই অবহিত আছেন।

সামগ্রিক বিচারে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানটির রূপায়ণ সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি থাকবে উপভোক্তা, সমাজকর্মী ও সমাজবিজ্ঞানী সকলের।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বর্ধমান কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

ওল্ড কোর্ট কম্পাউন্ড, পোঃ ও জেলা : বর্ধমান
দূরভাষ : ০৩৪২-২৬৬২৩৯০, ২৬৬৫৭১২

১৯৪১ সাল থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দানে নিয়োজিত অগ্রণী সমবায় প্রতিষ্ঠান

উল্লেখযোগ্য ঋণ প্রকল্প

স্থায়ী চাকুরিজীবী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহজ শর্তে বাড়ি তৈরি ও মেরামতের জন্য ঋণ, যে-কোনো ক্ষুদ্র শিল্পের ঋণ, রাইস মিল, এস.আর.টি. ও ডেয়ারি প্রকল্প, মৎস্য চাষ, ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার ক্রয়, মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীদের (এস.এইচ.জি.) ঋণ।

শাখা অফিস : বর্ধমান ও সেহারাবাজার ■ **সাব অফিস** : আসানসোল ও দুর্গাপুর

Sl. No. 26

মুসলিম পশ্চাৎপদতা

রাকেশ বসন্ত কমিটি, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ও মানব উন্নয়ন রিপোর্ট এবং কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

সেখ সাইদুল হক

উপস্থাপনা

আমাদের দেশে মুসলিম পশ্চাৎপদতার বিষয়টি দেশজুড়ে চর্চিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ২০০৭ সালে সাচার কমিটির রিপোর্টের পরে বিষয়টি যথেষ্ট সামনে এসেছে। সাচার কমিটি রিপোর্টের আগে ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হবার পর 'গোপাল সিং কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৮৩ সালে সেই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। ওই কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে যে বঞ্চনাবোধ কাজ করছে তাকে শিকড় সহ উৎপাটিত করতে না পারলে তাদের মূল স্রোতধারায় আনা যাবে না। (Sense of discrimination prevailing among the minorities must be eliminated root and branch, if we want the minorities to form an effective part of the mainstream.) ওই রিপোর্ট আজও আলোর মুখ দেখেনি। পরবর্তী পর্যায়ে সংখ্যালঘু কমিশনও বিভিন্ন অনুসন্ধান চালায় এবং মুসলিম পশ্চাৎপদতার নানা চিত্রও তুলে ধরে। কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। ২০০১ সালে আদমসুমারির রিপোর্টেও তা ফুটে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য ১৫ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। প্রত্যেক বিভাগে ১৫ শতাংশ অর্থ সংখ্যালঘু উন্নয়নে ব্যয় করার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু পরিস্থিতির যে তেমন কোনো উন্নতি হয়নি তা বিভিন্ন সমীক্ষা রিপোর্টে ফুটে ওঠে।

সাচার-পরবর্তী পর্যায় ও রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন

সাচার-পরবর্তী পর্যায়ে সারা দেশ জুড়ে সাচার রিপোর্ট নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। আমাদের রাজ্যেও সে আলোচনা অব্যাহত থাকে। ওই রিপোর্টের প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের মধ্যে কমবেশি পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আরও প্রকট হয়। সাচার রিপোর্টকে মান্যতা দিয়েও প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ করা দরকার যে আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে জমির আন্দোলনের ফলে এবং পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুসলিম জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটেছে তা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। সাচার রিপোর্টের পরবর্তী পর্যায়ে ২০০৯-এর ডিসেম্বরে রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ওই রিপোর্টে সংখ্যালঘু জনগণের জন্য শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়। ওই কমিশনের সুপারিশগুলি এখনও কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর করেনি। অনেক আলাপ-আলোচনার পর কেন্দ্রীয় সরকার ৪.৫ শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাব করে যা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমাদের রাজ্যে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ২০১০ সালে পশ্চাৎপদতার নিরিখে মুসলিম জনগণের একটি বৃহৎ অংশকে অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু করে।

রাকেশ বসন্ত কমিটি

২০০৭ সালে সাচার কমিটির রিপোর্টের পর ২০০৯-১০ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৬৬তম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই নমুনা সমীক্ষায় দেখা যায় যে শিক্ষা ও চাকুরিতে মুসলিম জনগণের পশ্চাৎপদতা এখন অনেকাংশে বিদ্যমান। এই নিয়ে পরে আলোচনা করব। ওই সমীক্ষার পাশাপাশি আরও কিছু ব্যক্তি ও সংস্থাও অনুসন্ধান চালায় ও রিপোর্ট প্রকাশ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আইআইএম, আহমেদাবাদ-এর অর্থনীতির অধ্যাপক রাকেশ বসন্ত কমিটির রিপোর্ট। এই অনুসন্ধান আইআইএম, আহমেদাবাদ-এর উদ্যোগে পরিচালিত হয়। তাই অনেকে এই রিপোর্টকে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) আহমেদাবাদ সমীক্ষা রিপোর্ট বলেও উল্লেখ করছেন। এই অনুসন্ধানের পর একটি প্রাথমিক রিপোর্ট *Economic and Political Weekly* পত্রিকায় ২০১০ মার্চ 'Social, Economic and Educational Conditions of Indian Muslims' শীর্ষক প্রবন্ধে রাকেশ বসন্ত প্রথম প্রকাশ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে Observer Research Foundation, New Delhi যে গবেষণা প্রকল্প গঠন করে এবং যার বিষয় ছিল Condition of Muslims in India, সেখানে ২০১২ সালে অধ্যাপক রাকেশ বসন্ত যে সমীক্ষাপত্র প্রকাশ করেন তাকেই বলা হয়েছে রাকেশ বসন্ত রিপোর্ট। এই রিপোর্টে তিনি ২০০৭ সালে সাচার রিপোর্টের পর সরকারি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি উদ্যোগ সত্ত্বেও শিক্ষা এবং চাকুরিতে মুসলিম জনগণের যে বিশেষ একটা অগ্রগতি হয় নি তা তুলে ধরেন। তাঁর সমীক্ষার রিপোর্টের নাম IIM Study—Muslim Backwardness... Education and Employment among Muslims in India—An Analysis of

Patterns and Trends. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক রাকেশ বসন্ত সাচার কমিটিরও সদস্য ছিলেন। আরও উল্লেখ্য যে তিনি এবং সাচার কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আবু সালে শরিফ ২০১০ সালে 'Handbook of Muslims in India: Emperical and Policy Perspectives' নামে একটি পুস্তক সম্পাদনা করেন যা Oxford University Press প্রকাশ করে।

রিপোর্টের বিষয়বস্তু

পূর্বেই উল্লেখ করেছি শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলিম পশ্চাৎপদতা এখনও বিদ্যমান। রিপোর্টে তিনি যে সামগ্রিকভাবে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন সেগুলি সম্পর্কে বলার আগে তিনি যে-সব অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য দিয়েছেন তার কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করছি বিষয়টির উপলব্ধির জন্য।

তথ্যচিত্র : ১

পাঁচটি সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে অবস্থাকে (Perceived fairness for five different opportunities) একটি Mean Score বা বলা যায় গড় সাফল্যাঙ্ক হিসাবে দেখানো হয়েছে :

সুযোগ	হিন্দু	মুসলিম	খ্রিস্টান
সামাজিক মর্যাদা	১০.২০	৮.৪৮	৮.৭২
অর্থনৈতিক	১১.৯২	৯.০৪	১০.২৪
শিক্ষাগত	১১.৩২	৮.১২	১১.৩৬
চাকরি	১০.৯২	৮.৬০	৯.৪৮
রাজনৈতিক	১২.২৪	৮.০৮	৮.০০

অনুপাত শতাংশ ৪ হলে সবচেয়ে কম, অনুপাত শতাংশ ২০ হলে সবচেয়ে বেশি।

এই রিপোর্টে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর গড় সাফল্যাঙ্ক থেকে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে সুযোগপ্রাপ্তির পাঁচটি ক্ষেত্রেই মুসলিমদের অবস্থান সবচেয়ে নিচে। এটাও দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং চাকুরির ক্ষেত্রে অন্যান্য দুটি গোষ্ঠীর তুলনায় মুসলিম সাফল্যাঙ্ক সবেচেয়ে নিচে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ২০১০ সালে পূর্ণিমা সিং *Sociological Study* পত্রিকার ৫৪ সংখ্যায় (পৃ. ১২৪-১৩২) 'Perceived Justice of Available Opportunities and Self Esteem and Social Exclusion: A Study of Three Religious Groups in India' প্রবন্ধে একই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

তথ্য চিত্র : ২

প্রতিটি সামাজিক ধর্মীয় গোষ্ঠীর (গ্রামীণ, শহর এবং পুরুষ-স্ত্রী মিলে একত্রে) শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্তির গড় (১৭-২৯ বছর) [Percentage Distribution of Persons by Education for Each Socio-Religious Category (SRC) (Rural + Urban and Male + Female) 17-29 years]

বছর/শিক্ষা	হিন্দু-উচ্চ বর্গীয়	হিন্দু ও.বি.সি.	হিন্দু এস.সি.	হিন্দু এস.টি.	মুসলিম ও.বি.সি.	মুসলিম সাধারণ
১৯৯০						
নিরক্ষর	১৩.৪	৩৩.৭	৪২.৯	৫৩.১	৩৩.৭	৩৬.৯
মাধ্যমিক এবং নিচে	৫৮.৭	৫৪.৭	৪৯.৫	৩৯.৬	৫৯.০	৫৪.০
উচ্চ-মাধ্যমিক	১৫.৯	৮.০	৫.৩	৫.৮	৫.৩	৬.০
স্নাতক এবং তার উপরে	১২.০	৩.৬	২.৩	১.৫	২.১	৩.১
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**
২০০৪-০৫						
নিরক্ষর	৯.৬	২৫.২	৩৩.৯	৪৫.৬	৩২.৮	২৭.৩
মাধ্যমিক এবং নিচে	৫৭.১	৫৯.৯	৫৬.৪	৪৭.৫	৫৮.৮	৬২.১
উচ্চ-মাধ্যমিক	১৮.৬	৯.৭	৬.৬	৫.২	৫.৮	৬.৬
স্নাতক এবং তার উপরে	১৪.৭	৫.২	৩.০	১.৮	২.৬	৪.০
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**
২০০৯-১০						
নিরক্ষর	৫.৭	১৬.২	২৪.৭	৩০.১	২৬.১	১৮.৮
মাধ্যমিক এবং নিচে	৫১.২	৫৯.৩	৬০.৮	৫৮.০	৫৯.০	৬৭.৭
উচ্চ-মাধ্যমিক	২৪.০	১৬.১	১০.০	৮.৬	১০.২	৯.৭
স্নাতক এবং তার উপরে	১৯.২	৮.৫	৪.৫	৩.৩	৪.৮	৩.৮
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**

তথ্যচিত্র ২ থেকে দেখা যাচ্ছে ১৭-২৯ বছর বয়সের জনগণের মধ্যে সাক্ষরতার হারে হিন্দু জনগোষ্ঠীর এস.সি. এস.টি. বাদ দিলে মুসলিমরা এখনও পিছিয়ে। এ প্রসঙ্গে রাকেশ বসন্ত তাঁর সমীক্ষা রিপোর্টেও দেখিয়েছেন যে, মুসলিম সাক্ষরতার হার শহরের তুলনায় গ্রামে কম। বিশেষ করে মুসলিম ওবিসি মহিলাদের হার সবচেয়ে কম। আবার শহরের ক্ষেত্রে একই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তথ্যচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যালয়-ছুটের হারও মুসলিমদের মধ্যে বেশি, বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের পরে। কেননা দেখা যাচ্ছে অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় উচ্চমাধ্যমিক-স্তরে মুসলিমদের অংশগ্রহণ কম। স্নাতক স্তরেও মুসলিম অংশগ্রহণ কম। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ২০০৭ সালে সাচার রিপোর্টে একই প্রবণতা উল্লিখিত হয়েছে। সাচার রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলিম জনসংখ্যার মাত্র ৩.৪ শতাংশ স্নাতক স্তরে শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এই রিপোর্টেও সেই একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। ওবিসি মুসলিম ও সাধারণ মুসলিমদের যোগ করলে এই সংখ্যা হচ্ছে ৪.১ শতাংশ। অর্থাৎ অগ্রগতি খুবই নগণ্য। অপরদিকে সাধারণ হিন্দুদের ক্ষেত্রে সাচার রিপোর্ট অনুযায়ী এই হার ছিল ১৫.৩ শতাংশ। এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ১৯.২ শতাংশ। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় রাকেশ বসন্ত রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে। তা হলো উচ্চতর স্তরে শিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলে মুসলিমদের অংশগ্রহণ কম। এর একটা বড় কারণ হতে পারে সারা দেশে মুসলিম জনগণের একটা বৃহত্তর অংশ শহরে থাকে এবং তাদের বড় অংশ শিক্ষা অপেক্ষা জীবিকার জন্য নানা ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

বসন্ত ও সেরিফ কর্তৃক সম্পাদিত 'Handbook of Muslims in India: Empirical and Policy Perspectives' পুস্তকে সপ্তম অধ্যায়ে S. Bhalotra এবং B. Zamora কর্তৃক একটি প্রবন্ধ ('Social Divisions in Education in India')-কে উদ্ধৃত করে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে মুসলিমদের ক্ষেত্রে ছাত্র ভর্তির হার কিছু বাড়লেও তাদের মধ্যে বিদ্যালয়-ছুটের হার আরও বেশি বেড়েছে। এক্ষেত্রে রাকেশ বসন্ত এই বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন মুসলিমদের মধ্যে যে বঞ্চনাবোধ

কাজ করছে তার অন্যতম দুটি কারণ হল মুসলিম জনগোষ্ঠী এলাকায় উপযুক্ত শিক্ষা পরিকাঠামো এবং উন্নত মানের বিদ্যালয়ের অভাব এবং শিক্ষা সমাপ্তে নিযুক্তির সম্ভাবনা কম থাকা। তাঁর মতে কর্মসংস্থানের সুযোগের সম্ভাবনা শিক্ষায় অংশগ্রহণের মাত্রাকে বাড়াতে সাহায্য করে।

proportion of Muslim workers is engaged in street vending and are also without employee benefits and long term (even written) contracts. Besides, a larger proportion of Mulsim self-employed women work with contractors under poor

তথ্য চিত্র : ৩

১৪-৬৪ বছর বয়সী বিভিন্ন সামাজিক ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর (গ্রাম, শহর, স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে) কাজের সুযোগ প্রাপ্তির শতাংশ [Percentage Distribution of Workers by Activity Status of Different Sectors for Each Socio-Religious Category (SRC) (Rural+Urban and Male + Female, 16-64 years, 2009-10)

Sector/ Activity Status	হিন্দু-উচ্চ বর্ণীয়	হিন্দু ও.বি.সি.	হিন্দু এস.সি.	হিন্দু এস.টি.	মুসলিম ও.বি.সি.	মুসলিম সাধারণ
Primary Sector						
স্ব-নিযুক্তি	৭৯.১	৬৩.২	৩৬.৮	৫৩.৫	৫২.৫	৫৯.৬৭
স্থায়ী কর্মী	০.৭	০.৬	১.২	১.২	১.৪	০.৫
অস্থায়ী কর্মী	২০.২	৩৬.২	৬২.১	৪৫.২	৪৬.১	৩৯.৯
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**
Secondary Sector						
স্ব-নিযুক্তি	৩২.৪	৩১.৬	২১.৬	১৫.৫	৪৪.৮	৪০.২
স্থায়ী কর্মী	৪১.৮	১৯.৯	১৩.৬	১২.১	১২.৩	১৮.২
অস্থায়ী কর্মী	২৫.৯	৪৮.৫	৬৫.২	৭২.৪	৪২.৯	৪১.৬
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**
Tertiary Sector						
স্ব-নিযুক্তি	৪৬.৪	৫১.৮	৪৪.২	৩৬.৯	৬৩.৭	৫৮.০
স্থায়ী কর্মী	৫০.০	৩৯.৯	৪৩.১	৪৮.৩	২৩.১	৩১.৬
অস্থায়ী কর্মী	৩.৬	৮.৩	১২.৭	১৪.৯	১৩.২	১০.৫
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**

তথ্যচিত্র ৩ থেকে দেখা যাচ্ছে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ স্ব-নিযুক্তির কাজের সঙ্গে বেশি যুক্ত। সাধারণ চাকুরি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে এবং বৃহৎ মালিকানার শিল্প ক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের অংশগ্রহণ কম। রাকেশ বসন্ত তাঁর রিপোর্টে আরও দেখিয়েছেন যে, মুসলিম জনগণের একটি বড় অংশ, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, খুচরো ব্যবসার সাথে যুক্ত। মুসলিম নারীদের একটা বড় অংশ গার্হস্থ্য কাজকর্মের অথবা চুক্তিভিত্তিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। পূর্বে উল্লিখিত বসন্ত ও সেরিফ সম্পাদিত পুস্তকের নবম অধ্যায়ে (পৃ. ২২১-২৩৪) J. Unni— "Informality and Gender in the Labour Market for Muslims' প্রবন্ধে একই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। রাকেশ বসন্ত তাঁর রিপোর্টে J. Unni-এর অনেক তথ্যকে উল্লেখ করে বলেছেন, ''Vis-a-vis others a much larger contractual conditions.''

সাচার রিপোর্টে তথ্য দিয়ে দেখানো হয়েছিল যে ভোগ্য ব্যয় (Mean Per capita Consumption Expenditure—MPCE) তপশিলি জাতি ও উপজাতি বাদ দিলে অন্য সব সামাজিক ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিমদের কম। রাকেশ বসন্ত তাঁর রিপোর্টে তথ্য সহ দেখিয়েছেন যে ২০১০-এর তথ্যচিত্রে দেখা যাচ্ছে কর্মযোগ্য জনগণের মধ্যে তুলনায় গরিবের সংখ্যা মুসলিমদের মধ্যে বেশি [Proportion of poor among the working population (i.e. working poor) is higher among Mulsims]।

ঐ রিপোর্টে ভি.কে. বড়ুয়ার 'On the Risks of Belonging to the Disadvantaged Groups—Analysis of Labour Market Outcomes' (2010) প্রবন্ধে উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে স্থায়ী কাজে মুসলিম জনগণের কম অংশগ্রহণের মূল কারণ হলো Attributes এবং Access। অর্থাৎ Attributes-এর ক্ষেত্রে মুসলিমদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব এবং Access-এর ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগের অভাব। বড়ুয়ার গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে 'Employment Risk Ratio and Group Risk Ratio' এই দুটি উপাদানকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে কাজের বাজারে (Labour Market) সবচেয়ে অনুপাত মান ভালো হলো Forward Caste Hindu জনগোষ্ঠীর। সংরক্ষণের কারণের জন্য এমনকি দলিতরাও (এসসি ও এসটি) কিছুটা বাড়তি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে, কিন্তু মুসলিমরা সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তাদের অবস্থান পিছনে। রাকেশ বসন্ত তাঁর রিপোর্টে S.K. Bhowmik and M. Chakroborty কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ 'Earnings Inequality: The Impact of the Rise of Caste and Religion-based Politics'-কে উল্লেখ করে বলেছেন, "Earning differences between Muslims and Non-Mulims have increased to the detriment of the former."। ভৌমিক ও চক্রবর্তী তাঁদের প্রবন্ধে আরও দেখিয়েছেন যে আয়ের ব্যবধানের একটা বড়ো কারণ হলো অন্যদের অপেক্ষা মুসলিমদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত মানের শিক্ষার সুযোগের অভাব।

এ বিষয়ে রাকেশ বসন্ত তাঁর IIM আমেদাবাদ রিপোর্টে মন্তব্য করে বলেছেন, সাধারণ কাজের বাজারে (Formal labour market) কাজের সুযোগপ্রাপ্তি এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকেও পিছিয়ে থাকায় মুসলিমরা অন্য ধর্মীয় সামাজিক গোষ্ঠীর তুলনায় চাকুরি ও উপার্জনের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কম মুসলিম অংশগ্রহণের কারণ মৈত্রেয়ী দাস তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ (২০০৮) 'Minority Status and Labour Market Outcomes'-এ উল্লেখ করে বলেছেন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বঞ্চনা মুসলিমদের স্বনিযুক্তির প্রবণতার দিকে ঠেলে দিয়ে কর্মসংস্থানের জগৎ থেকে তাদের দূরে রেখেছে এবং তাদের মধ্যে নিজস্ব মুসলিম গোষ্ঠীবদ্ধতা (Muslim Enclasses) গড়ে তুলেছে। তাঁর মতে দলিতদের ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠীবদ্ধতা থাকলেও সংরক্ষণের সুযোগ তাদেরকে সুবিধাজনক অবস্থা দিয়েছে। শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রেও একই চিত্র কমবেশি দেখা গেছে।

রাকেশ বসন্ত তাঁর রিপোর্টে পরিশেষে

যে মন্তব্য করেছেন তা হলো : "As compared to other religious groups, Mulsims nurse a deeper feeling of being meted out unfair treatment and the sense of discrimination is especially strong in the employment and education spaces..."

ওই রিপোর্টে রাকেশ বসন্ত উল্লেখ করেছেন যে শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলিম পশ্চাৎপদতার বড় কারণ যোগানের অভাব (Lack of supply)। এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় তাঁরা চাকুরিতে পিছিয়ে পড়েন। আবার উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য যে উপযুক্ত মানের বিদ্যালয় দরকার তা মুসলিম এলাকাগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই নেই।

ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে "Muslims are significantly under-presented in the higher positions of society." রিপোর্টে এই মন্তব্য করা হয়েছে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার করে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং পরিচালন ব্যবস্থায় মুসলিমদের অংশগ্রহণ বাড়ানো উচিত।

জাতীয় নমুনা তথ্য
(National Sample Survey Programme-66th Round)

এবার আমরা ৬৬তম জাতীয় নমুনা তথ্য সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করবো। ওই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিমদের জীবনযাত্রার মান সবচেয়ে কম। একটি মুসলিম পরিবারের গড় আয় যেখানে ৩২.৬৬ টাকা, সেখানে হিন্দুদের (সমগ্র অংশ গোষ্ঠী ধরে) ক্ষেত্রে ৩৭.৫০ টাকা, খ্রিস্টান ৫১.৪৩, শিখ ৫৫.৩০ টাকা। জাতীয় নমুনা তথ্যমতে একটি পরিবারের গড় মাসিক ব্যয়—হিন্দু ১,১২৫ টাকা, খ্রিস্টান ১,৫১৩ টাকা , মুসলিম ৯৮০ টাকা। শহরে মুসলিম গড় ব্যয় ১,২৭২ টাকা, হিন্দু ১,৭৯৭ টাকা, খ্রিস্টান ২,০৫৩ টাকা, শিখ ২,১৮০ টাকা।

মুসলিম জনগণের একটি বড় অংশ—কী শহরে, কী গ্রামে—সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক নয় কিংবা তাদের মধ্যে স্থায়ী কর্মসংস্থান কম। হিন্দু বেকারত্বের হার যেখানে (তপশিলি জাতি-উপজাতি ধরে) নেমে হয়েছে ৩.৪ শতাংশ, সেখানে মুসলিমদের ক্ষেত্রে এই হার নেমে হয়েছে ১.৯ শতাংশ।

মুসলিমরা মূলত কাজে স্বনিযুক্ত অথবা গ্রামীণ মজুর। স্থায়ী বা বেতনভুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে নিচে আছে মুসলিমরা। বড় বড় ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ৩০.৪ শতাংশ মুসলিম পরিবারের কোনো না কোনো মানুষ যুক্ত আছেন স্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থানে (সংগঠিত ও অসংগঠিত মিলিয়ে)। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এটা ৪১ শতাংশ, খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে ৪৩ শতাংশ এবং শিখদের ক্ষেত্রে ৩৫.৭ শতাংশ। পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি মুসলিম পরিবার আছে (৪৬ শতাংশ) স্বনিযুক্তিতে। গ্রামাঞ্চলে ৪১ শতাংশ মুসলিম পরিবার গ্রামীণ মজুর হিসাবে কাজ করেন। একমাত্র আয়ের উৎস হিসাবে নিজস্ব জমির ওপর নির্ভরশীল হয়ে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মুসলিমদের ক্ষেত্রে ৩৬ শতাংশের কাছাকাছি, হিন্দুদের ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ, খ্রিস্টানদের ৩০ শতাংশ।

মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০১১

এবার আমরা মানব উন্নয়ন রিপোর্ট-২০১১-র দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন মাপকাঠিতে মুসলিম পশ্চাৎপদতার দিকটি ফুটে উঠেছে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের অবস্থা খুবই খারাপ। উত্তরপ্রদেশে মুসলিম সাক্ষরতার হার (৫৩.৬%) তপশিলি জাতির চেয়েও খারাপ (৫৭.৮%)। সারা দেশে শহরাঞ্চলের সাক্ষরতার ক্ষেত্রে তপশিলি জাতির হার বেড়েছে ৮.৭%, তপশিলি উপজাতির ৮%। সেখানে মুসলিমদের বেড়েছে ৫%।

রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে গত দশ বছরে দারিদ্রসীমার নিচে মানুষের সংখ্যার জাতীয় গড় যেখানে ৩৬% থেকে ২৭.৫% হয়েছে, সেখানে মুসলিমদের ক্ষেত্রে হয়েছে ৩২%। রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে কেবল শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিমদের অবস্থা পূর্বের তুলনায় একটু ভাল হয়েছে। যদিও অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর দিক থেকে তারা পিছিয়ে। মহিলাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ওই রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলিম মহিলাদের অবস্থা খারাপ। মহিলা রক্তাল্পতার হার মুসলিম মহিলাদের বেশি। সংখ্যালঘু উন্নয়নে ১৫ দফা কর্মসূচির সুফল ঠিকমতো মুসলিম জনগণের কাছে পৌঁছায়নি। সারা দেশে পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার যেখানে তপশিলি জাতিদের ক্ষেত্রে কমেছে ৩১.২%, তপশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে কমেছে ৩০.৯%, মুসলিমদের ক্ষেত্রে কমেছে ১২.৭%।

ওই রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৭-৯ বর্ষে শহরাঞ্চলে ২৩.৭% মুসলিম এবং গ্রামাঞ্চলে ১৩.৩% মুসলিম দরিদ্র। অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর তুলনায় এই সংখ্যা বেশি।

প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

ওইসব রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সাচার রিপোর্টের পর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা বলা হলেও মুসলিমরা সামগ্রিকভাবে এখনও উন্নয়ন-ঘাটতিতে (Development Deficit) ভুগছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা রিপোর্ট ২০১০, মানব উন্নয়ন রিপোর্ট-২০১১ এবং রাকেশ বসন্ত কর্তৃক আইআইএম আমেদাবাদ রিপোর্ট-২০১২তে তা প্রতিফলিত হয়েছে। সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখানোর দরকার তা দেখানো হয়নি। মুসলিমদের জন্য পৃথক Sub-Plan তৈরির দাবি দীর্ঘদিন ধরে উঠছে। তাও মানা হয়নি। মুসলিমদের শিক্ষা ও চাকুরিতে উন্নয়ন ঘটাতে গেলে ওই দুটি ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার নিরিখে সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নিজেরই গঠিত রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ২০১০ সালেই পশ্চাৎপদতার নিরিখে মুসলিম জনগণের ৮৫ শতাংশকে পশ্চাৎপদ ঘোষণা করে তাদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার অনেক টালবাহানার পর মাত্র ৪.৫ শতাংশ ঘোষণা করে। তাও আবার আদালতের বিচারাধীন। সাচার রিপোর্টে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের স্বল্পতার কথা তথ্য দিয়ে বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিমদের অংশগ্রহণ বাড়াতে না পারলে বঞ্চনাবোধকে (Feeling of deprivation) কমানো যাবে না এবং তা বিচ্ছিন্নতার মানসিকতাকে (Sense of alienation) বাড়িয়ে তুলবে। সাচার তাঁর রিপোর্টে, তথ্যচিত্রে দেখিয়েছেন যে এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি অথচ বিধানসভা ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষিত হয়েছে তপশিলি জাতির জন্য। সাচার রিপোর্টের ওপর ২০০৯-এর লোকসভা এবং বেশ কিছু রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে, কিন্তু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব তুলনায় বাড়েনি।

স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত লোকসভার আসনের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব সারা দেশে মুসলিম জনসংখ্যা যেখানে প্রায় ১৫%, সেখানে লোকসভার প্রতিনিধিত্ব গড়ে ৬-৭%।

লোকসভা নং	নির্বাচন বছর	মোট মুসলিম প্রতিনিধি	শতকরা মুসলিম প্রতিনিধি
১	১৯৫২	১১	২
২	১৯৫৭	১৯	৪
৩	১৯৬২	২০	৪
৪	১৯৬৭	২৫	৫
৫	১৯৭১	২৮	৬
৬	১৯৭৭	৩৪	৭
৭	১৯৮০	৪৯	১০
৮	১৯৮৪	৪২	৮
৯	১৯৮৯	২৭	৬
১০	১৯৯১	২৫	৫
১১	১৯৯৬	২৯	৬
১২	১৯৯৮	২৮	৬
১৩	১৯৯৯	৩১	৬
১৪	২০০৪	৩৪	৭
১৫	২০০৯	৩০	৬

পশ্চিমববঙ্গের বর্তমান অবস্থা ও কিছু মন্তব্য

সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিষয়ে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অবস্থায় কিছুটা আলোকপাত করতে চাই এই কারণে যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে মুসলিম-দরদি বলে দেখানোর চেষ্টা করেন। নিজেকে মুসলিম জনগণের পরিত্রাতা হিসাবে প্রচার করেন।

শুধু চটকদারি কাজই নয়, আচারে, আচরণে, পোশাকে-আশাকে তিনি নিজেকে একেবারে পাক্কা মুসলমান হিসাবে হাজির করেন। কখনও মাথায় ঘোমটা, কখনও ইফতার পার্টিতে গিয়ে রোজা না রেখেও ইফতার করা, কখনও রেড রোডে গিয়ে ঈদের নামাজে অংশ নিয়ে সুমধুর প্রতিশ্রুতি প্রদান, আবার কখনও মাথায় সাদা কাপড় জড়িয়ে হাজিবিবির বেশে মোনাজাত (প্রার্থনা) করেন। মুসলিমদের প্রতি সত্যিকারের গভীর ভালোবাসা না থাকলে এটা কি সম্ভব? অসংখ্য পূজামণ্ডপে ফিতে কেটে, ইসকনের রথের দড়ি টেনে, নিজের হাতে নিজের বাড়ির পুজো করেও মুসলিমদের এত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া, তাদের আনন্দের সঙ্গী হওয়া একেবারে কম কথা নয়। অন্তত এমনটাই তিনি এবং তার তোষামোদকারীরা প্রচার করেন।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। এটা ঠিক, ইচ্ছা থাকলেও সাংবিধানিক বাধার কারণেই সংরক্ষণ করা যায়নি। কিন্তু আন্তরিকতা বা প্রচেষ্টার কোনো অভাব ছিল না। অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপন, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মর্যাদা প্রদান সহ অনেক কাজ করার চেষ্টা করেছে। রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারই প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সংখ্যালঘু কমিশনের মাধ্যমে ওদের অনগ্রসর হিসাবে চিহ্নিত করা হবে এবং ওদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে। সেই মতো আইনও করা হয়। এটাও ঠিক করা হয় যে, সংখ্যালঘু মুসলিমদের ১০ শতাংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য দুটো ক্যাটিগরি করা হবে। ক্যাটিগরি 'এ' হবে সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য, আর ক্যাটিগরি 'বি' হবে ওবিসিদের জন্য যা হবে ৭ শতাংশ, তাতে মুসলিমরাও থাকবেন। ২০১১ সালের মার্চ পর্যন্ত ৩৫টি সাম্প্রদায়কে ওবিসি হিসেবে ঘোষণা করা হয়, এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল সংখ্যালঘু। আরও ৩৬টি গোষ্ঠীর সংযুক্তির ব্যাপারে প্রস্তাব সরকারের কাছে পড়েছিল। নির্বাচনের জন্য ঘোষণা করা হয়নি। ২০১১ সালের মে মাসে সরকারের পরিবর্তন হলো। তৈরি হল নতুন জোট সরকার। তারা আইনের পরিবর্তন করে সংখ্যালঘুদের আলাদা ক্যাটিগরি উড়িয়ে দিয়ে তাদের উভয় দলে ভাগ করে দিল। নতুন এই ৩৬টির মধ্যে ২৬টি ছিল মুসলিম, নিয়ম অনুসারে এদের এ ক্যাটিগরিতে যুক্ত থাকার কথা। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এদের 'বি' ক্যাটিগরিতে যুক্ত করা হলো, আর বাকি মুসলিমদের 'বি'এর পরিবর্তে 'এ'তে যুক্ত করা হলো। ফলে সংখ্যালঘুদের ১০ শতাংশ সংরক্ষণ অনিশ্চিত হয়ে গেল। এখন অনেক ক্ষেত্রে ওবিসি-রা পেলেও সংখ্যালঘুরা পাবে না। সংখ্যালঘুদের প্রতি বর্তমান রাজ্য সরকারের ভালোবাসা আর দরদের এটা একটা বড় নিদর্শন। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (বিধানসভায় সর্বদলীয় সভার পর) আইন করে ওবিসিদের জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সংবিধান মেনে ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়েই, এমনকি মাননীয় রাজ্যপালের সম্মতি নিয়ে গেজেট নোটিফিকেশনও হয়। পরে অযৌক্তিক কিছু যুক্তি দেখিয়ে আবার আইনের পরিবর্তন করে একেবারে অগণতান্ত্রিক কায়দায়, বিধানসভার শেষ দিনে দু-ঘণ্টা আগে নোটিশ দিয়ে মাত্র আধঘণ্টার আলোচনায় (বিরোধীদের ওয়াক আউটের ফলে সেটুকু আলোচনাও হয়নি) এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিল জোর করে পাস করিয়ে নেওয়া হল। ফলে পঞ্চায়েতে শুধু ওবিসিদের সংখ্যাই কমলো না, কোথাও কোথাও তাদের সংরক্ষণ থাকবে না। মুসলিম-দরদি সরকারের মুসলিম-দরদের এটা একটা জ্বলন্ত উদাহরণ।

শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঠিক রাখতে প্রায় ৪৫ হাজার শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে মাধ্যমিক আর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এবং তার নিয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। অথচ মাদ্রাসাগুলিতে একই নিয়মে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শিক্ষক পাওয়ার কথা, যার প্রস্তাব সব টেবিল ঘুরে অনেক দিন ধরে মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে পড়ে আছে। মুখ্যমন্ত্রী অনুমোদন না করায় এতগুলো মুসলিম ছেলেমেয়ে চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। মুসলিম-দরদের এর থেকে ভালো উদাহরণ আর কী হতে পারে!

মুখ্যমন্ত্রী ভাবলেন, মাদ্রাসা বোধহয় মুসলমানদের কাছে বড় বিষয়। মাদ্রাসা করতে হবে, সগর্বে ঘোষণা করলেন দশ হাজার মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেওয়া হবে তবে কোনো টাকা দেওয়া হবে না। তার মানে ছাত্রছাত্রীর টাকা দিয়েই শিক্ষকদের বেতন হবে। তাই দিয়েই মাদ্রাসা চলবে। ঘোষণা শুনে মনে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী জানেন না যে আমাদের রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক, অথবা তিনি চান না সবাই বিনা পয়সায় পড়ুক, তিনি চান মাদ্রাসাগুলিতে মুসলমানরা টাকা দিয়ে পড়ুক।

তারপরে অনেক গবেষণা করে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নতুন এক পথ আবিষ্কার করলেন। মুসলমানদের জন্য বড় বড় স্কুল, সাধারণ কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের চেতনা বাড়াতে পারে, তাদের উন্নতি হতে পারে। কিন্তু পরে ভাবলেন এতে ভোট বাড়বে না, ভোট বাড়ানোর মতো কাজ করতে হবে। তাই ঢাক ঢোল পিটিয়ে চালু করলেন ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের ভাতা, যাতে ওরা সরকারের গুণগান করতে পারে এমনকি ভোটেরও ব্যবস্থা করতে পারে। আইনের ডিগ্রিধারী মুখ্যমন্ত্রী ভালো করেই জানেন, এটা করা যায় না। এটা সংবিধান-বিরোধী। ইতিমধ্যেই বিচারপতিরা সেই রায় ঘোষণাও করেছেন। তা সত্ত্বেও বলে চলেছেন যে কিছু পরোয়া নেই—সব করে যাবো। শেষে করায় সমর্থ না হলে, সিঙ্গুরের কৃষকদের মতো মুসলিমদেরও বলা যাবে, আমার তো সদিচ্ছা ছিল, আইনি বাধায় হলো না। এর ফলে টাকাও লাগবে না, অন্যদিকে মুসলিম ভোট বাড়বে।

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা যাদের আছে তারা ভালো করেই জানেন, ইমামের মতো পদে থেকে ওই ধরনের অর্থ নেওয়া শুধু অনৈতিকই নয়, ইসলাম ধর্মের মূল আদর্শের বিরোধী। এই ধরনের ভাতা পেয়ে কিছু মানুষ লাভবান হতে পারেন, কিন্তু মুসলিম সমাজের সামগ্রিক কোনো লাভ হবেনা। তাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে না। তবে একটা কাজ নিশ্চয়ই হবে, মুসলিমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো মানুষের পরিবর্তে মাথা নিচু করা, অনুকম্পা আর সাহায্যপ্রার্থী হবে। মুসলিমদের নিয়ে এর চেয়ে বড় উপহাস আর কী হতে পারে! বরং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি সমীক্ষা করে এটা প্রমাণ করুন যে গত দু-বছরে যত চাকরি হয়েছে (সরকারি প্রতিষ্ঠানে, কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা পুলিশ প্রশাসনে) তার কত শতাংশ মুসলিম, গত দু-বছরে মুসলিম এলাকায় কটি বিদ্যালয় হয়েছে। তারপর তার আগের বাম আমলের দুই বছরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখান অর্থাৎ ২০০৯-১০, ২০১০-১১ বর্ষে কী কী হয়েছে এবং ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ বর্ষে কী হয়েছে।

এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। গরিব সংখ্যালঘু মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ২০০৯ সালে Minority Women Empowerment Programme গ্রহণ করে। এই প্রকল্পে ২০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে যাঁদের বয়স তাঁরা সুযোগ পান। ব্যক্তিগতভাবে বা অন্ততপক্ষে ৬ জন সংখ্যালঘু মহিলাকে নিয়ে গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে এই প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়। সুদের হার বছরে ৩ শতাংশ। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ দু-বছরে এই প্রকল্প ৯ হাজার জন পেয়েছিলেন ৯ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। আর তৃণমূল সরকারের এই দু-বছরে এই প্রকল্পে ১ হাজার ৪৩৮ জন পেয়েছে মাত্র ৪৫ লক্ষ টাকা।

দু-বছরের অভিজ্ঞতা

এটা ঠিকই, তৃণমূল দল ২০১১-র নির্বাচনে মুসলিম জনগণের একটা বড় সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু গত দু-বছরের অভিজ্ঞতা কী বলে? আমি আমার কথা বলছি না। এখানে আমি কেবলমাত্র দুটি পত্রিকা থেকে দুটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবো। একটি হলো 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং অন্যটি হলো 'বর্তমান'। ওই দুটি পত্রিকা বামফ্রন্টের সমর্থক একথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। বরং তৃণমূলকে ক্ষমতায় আনতে, তৃণমূল সুপ্রিমোকে দেবীর আসনে বসাতে জনমত গঠনে তাদের ভূমিকা অনেকাংশে কাজ করেছে।

''বাজেটে প্রতিশ্রুতি ছিল, রাজ্য সরকার এমন কিছু উন্নয়ন করবে, যার দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাবেন সংখ্যালঘু মানুষ। কিন্তু সরকারি তথ্যই বলছে, জনমোহিনী নীতিকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে ঘোষিত লক্ষ্য থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর। যে দফতরের দায়িত্ব খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। বছরের শেষ ভাগে এসে অর্থ দফতর জানাচ্ছে, ওই দফতরের জন্য পরিকল্পনা খাতে যত টাকা ধরা হয়েছিল, তার ৫০ শতাংশেরও বেশি এখনও খরচই করা সম্ভব হয়নি। অথচ হাততালি কুড়ানোর প্রকল্পে দান খয়রাতি করতে গিয়ে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে বেরিয়ে গেছে বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ। বাড়তি খরচের সেই সংখ্যটা খুব কম নয়, ১০০ কোটি টাকা।... সরকারি হিসাব বলছে, পরিকল্পনা খাতে বাজেটে ধরা ৫৭০ কোটি টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ২৫৫ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর। অথচ, পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে সরকার যেখানে ৩৬৬ কোটি টাকা খরচ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছিল, সেখানে ইতিমধ্যেই ৪৬৬ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। অর্থাৎ পরিকল্পনা খাতে ৪৪ শতাংশ খরচ হলেও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ১২৭ শতাংশ টাকা খরচ হয়েছে।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩-০১-২০১৩০

''তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী নিরুপণে নতুন মুখ্যমন্ত্রী মমতাজ হয়ে উঠুন—রাজ্যের মুসলিম সমাজের এমন কাম্য নয়। তারা চান উনি মমতাময়ী হয়ে সবার প্রতি সুবিচার করুন। প্রাপ্য দিন। কিন্তু গত দেড় বছর তাদের ওই প্রত্যাশার ছিটেফোঁটার বেশি পূরণ হয়নি। ওদের বক্তব্য, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হয়তো তিন হাজার ইমামকে মাসে আড়াই হাজার টাকা খয়রাতি দেওয়াকেই রাজ্যের পৌনে তিনকোটি মুসলিমদের উন্নয়নের বিরাট কাজ বলে মনে করেন। নয়তো ভাবছেন, গোটাকতক হজ হাউস বানালেই অথবা কয়েক হাজার খারিজি মাদ্রাসাকে সরকারি অনুমোদনের টোপ দিলেই গোটা মুসলিম সমাজ কৃতার্থ হয়ে যাবে। অথচ, বাস্তব হল, এতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নের এক শতাংশও হয় না, কিন্তু প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী প্রায় দাবি করে থাকেন, মুসলিমদের জন্য তিনি ইতিমধ্যেই ৯০ শতাংশ কাজ করে ফেলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথায় রাজ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একই সঙ্গে কৌতুক ও উষ্মার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই দাবী করেছেন, দেড় বছরের পরিবর্তনের সরকারের আমলে রাজ্য সরকারী, আধা সরকারী চাকরী এবং অন্যভাবে মোট কতটা কর্মসংস্থান হয়েছে, আর মুসলিমরা এর কত অংশ পেয়েছেন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হোক। একই সঙ্গে নতুন স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, বিদ্যুতায়ন সহ বিভিন্ন বিষয়ে নতুন জমানায় মুসলিম জনগোষ্ঠী কতটা উপকৃত হয়েছে তার খতিয়ানও প্রকাশ করা হোক। অনেকেরই স্থির বিশ্বাস সরকার ওই পথে এগোবে না।'' (বর্তমান, ২২-১২-২০১২)

উপসংহার

উপসংহারে তাই বলা যায় যে, কী বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কী রাজ্যের তথাকথিত পরিবর্তনের সরকার—কেউই প্রকৃত অর্থে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন চায় না। তারা চায় মুসলিম ভোট। আর তাই নিজেদেরকে সংখ্যালঘু-দরদি হিসাবে উপস্থাপন করতে নানান ধরনের চমকদারি কর্মসূচি ঘোষণা করছেন। সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন নির্ভর করবে তাদের শিক্ষার উন্নতি করণে, কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানে এবং সামাজিক জীবনে মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়। শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক জীবনে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণের উন্নয়নকে দেখতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে। তা না হলে যেভাবে বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে তা মৌলবাদীদেরই উৎসাহিত করবে। সংখ্যালঘু মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা বৃদ্ধি পাবে। সামগ্রিকভাবে তা দেশের সংহতিকে বিপন্ন করবে।

আমাদের মনে রাখা দরকার সংখ্যালঘু জনগণের স্বার্থের বড়ো গ্যারান্টি হলো ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের ঐক্য। তাই সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণের মধ্যে যে বঞ্চনাবোধ তৈরি হয়েছে তাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তা দূরীকরণের নির্দিষ্ট পদক্ষেপ সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে বর্ধমান জেলার পঞ্চায়েত নির্বাচন

অমল হালদার

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে অনেক টালবাহানার পর অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পাঁচ দফায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান জেলায় ১৫ জুলাই দ্বিতীয় দফায় ভোটপর্ব সমাধা হয়। ফলাফল প্রকাশিত হয় ২৯ জুলাই, ২০১৩। বামপন্থীরা প্রতিটি নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পর্যালোচনা করার চেষ্টা করে। সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থনে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে কিনা, সাংগঠনিক দুর্বলতার কোনো ক্ষেত্র ছিল কিনা, বামফ্রন্টের ঐক্যের কোনো ঘাটতি ছিল না—ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে জনগণের রায়ের প্রতিফলন বুঝে নেওয়ার চেষ্টা হয়, পর্যালোচনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এবার যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, সেই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা করা খুবই কঠিন, কারণ বুথ দখল এবং ভোট গণনার দিন যে হারে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে তাতে জনগণের রায়ের চিত্র কিছুটা অনুমান নির্ভর হতে পারে। ফলে বাস্তব চিত্র খুঁজে বের করা কার্যত অসম্ভব। গত বিধানসভা নির্বাচনে সারা রাজ্যে পরিবর্তনের ঝড়ের মধ্যেও বর্ধমান জেলার বামপন্থীরা ২৫টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৯টিতে শুধু জয়লাভ করেনি, ৪৪.৮০ শতাংশ ভোট যায় বামপন্থীদের অনুকূলে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সঠিকভাবে ফলাফল পাওয়া গেলে গত বিধানসভা নির্বাচনের সাথে তুলনা করা সম্ভব হতো। সাধারণভাবে জেলা পরিষদের ফলাফল পর্যালোচনা করাটাই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু যে ফলাফল আমরা পেয়েছি তাতে জনগণের রায়ের কোনো প্রতিফলন ঘটেনি, কষ্টকল্পিত দায়সারা হিসাব মেলানোর চেষ্টা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে কয়েকটি ব্লকের নির্দিষ্ট কয়েকটি বুথে যেখানে নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণ এবং গণনা হয়েছে, সেইগুলি চিহ্নিত করে জনগণের রায়ের প্রবণতা বোঝার চেষ্টা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার যে, মেমারি-১, মন্তেশ্বর, রায়না-১, বর্ধমান-১ ও ২, ভাতাড়, গলসী-১ ইত্যাদি এলাকাগুলিতে ভোট বৃদ্ধির হার স্পষ্ট। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের তুলনায় ২-৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। কাটোয়া ও সালানপুর এলাকায় সন্ত্রাসের তীব্রতা ছিল না। বিরোধীদের অর্থের আধিক্য ছিল প্রবল, সেক্ষেত্রেও ২ শতাংশের বেশি ভোট বৃদ্ধি হয়েছে। সাথে সাথে সাংগঠনিক দুর্বলতার দিকটিও চিহ্নিত হওয়া দরকার। কিছু বুথ আছে সেখানে অন্তত ভোটের দিন কোনো সন্ত্রাস ছিল না এমনকি গণনাকেন্দ্রেও কোনো সমস্যা ছিল না, সেইসব কেন্দ্রে প্রত্যাশিত ভোট না পাবার বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

আক্রমণের রূপ

গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই রাজ্যের কিছু জেলার মতো বর্ধমান জেলাতেও কমরেডদের উপর তৃণমূল কংগ্রেসের ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে আসে। নির্বাচনের পরই নিহত হন মহিলা আন্দোলনের কর্মী পূর্ণিমা ঘড়ুই (রায়না)। এই সময়কালে সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সরকার, পার্টির জেলা কমিটির সদস্য প্রদীপ তা ও কমল গায়েন, বিধানসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগে পার্টির জেলা কমিটির সদস্য ফাল্গুনী মুখার্জি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন। এই সময়েই খুন হন নির্গুণ দুবে (হীরাপুর), অর্পণ মুখার্জি (হীরাপুর), ভীমরাজ তেওয়ারি (জামুড়িয়া), সেখ হাসমত সাগা (জামুড়িয়া), মদন সোরেন (বুদবুদ-গলসী), রাধানাথ সোরেন (জামালপুর)। কয়েকটি খুনের ঘটনা ছিল অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক, বলা যেতে পারে আজও সেই এলাকায় শূন্যস্থান পূরণ করা যায়নি। এই সময়ের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের আক্রমণে আহত হয়েছেন তিনশতাধিক কর্মী। মিথ্যা সাজানো মামলায় ২৮২ জন বামফ্রন্ট প্রার্থীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, ৪,১৪১ বামফ্রন্ট কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে, ৩৮৩ জন কর্মী মিথ্যা মামলায় জেলে গেছেন অথবা অতি সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন, ১৪ জম পার্টির জেলা কমিটির সদস্য মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত। একইভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্বে বর্ধমান জেলায় ১০৯ জন জোনাল কমিটি সদস্য, ২৫৩ জন লোকাল কমিটি সদস্য এবং ৬৮৫ জন পার্টি সদস্য মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত।

আক্রান্ত হয়েছেন বিধায়ক চৌধুরী মহঃ হেদায়েতুল্লাহ (টগর)-সহ অন্যান্য বিধায়কগণ। মন্তেশ্বর এলাকার কুসুমগ্রামে মিছিলের পুরোভাগে থাকাকালীন হেদায়েতুল্লাহ্‌কে আক্রমণ করা হয়, আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আক্রান্ত হয়েছেন আউসগ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক কার্তিক বাগ, অন্তত তিনবার আক্রান্ত হয়েছেন মেমারির প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি, মেমারির প্রাক্তন দুই মহিলা বিধায়ক মহারানি কোঙার, সন্ধ্যা ভট্টাচার্য। বামফ্রন্টের মিছিল চলাকালীন তাঁদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। পরে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে তাঁদের বিরুদ্ধে গলার হার ছিনতাইয়ের অভিযোগ দায়ের করা হয়। জামুড়িয়া এলাকার সিপিআই(এম) নেতা, জেলা কমিটির সদস্য মনোজ দত্তকে মিথ্যা মামলায় দীর্ঘদিন জেলে আটক রাখা হয়। বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে সমগ্র জেলায় ২৪টি লোকাল কমিটির অফিস, ৮টি ট্রেড ইউনিয়ন অফিস এবং কৃষক ও ছাত্র-যুব সংগঠনের ৪টি অফিস আজও বন্ধ। বর্ধমান শহরে ছাত্র-যুব সংগঠনের জেলা কেন্দ্র শহিদ সুকুমার ব্যানার্জি ভবন বলপূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত বিধানসভা নির্বাচনে যে এলাকাগুলিতে সিপিআই(এম) জয়লাভ করেছে সেই এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে ধারাবাহিক সন্ত্রাস চালানো হয়েছে ন্যূনতম ব্যবধানে পরাজয়ের কেন্দ্রগুলি ও কৃষক আন্দোলনের সামনের সারির এলাকাগুলিতে। কেতুগ্রাম-১-এর

বিস্তীর্ণ এলাকা সমাজবিরোধীদের দখলে, আক্রান্ত হয়েছেন কয়েকশো কর্মী, এলাকা ছাড়া বহু সিপিআই(এম) সদস্য। একই অবস্থা মঙ্গলকোট, রায়না, খণ্ডঘোষ, সদর, গলসী ও আউসগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকাতে। কাঁকসা এলাকাতেও দুটি অঞ্চলে কার্যত বামপন্থীদের প্রবেশ নিষেধ। মেমারি এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত একজন শিক্ষককে খুন করার চক্রান্ত হয়, মেয়েদের প্রতিরোধে তিনি প্রাণে বাঁচেন। রায়না এলাকার এক জোনাল কমিটির সদস্যকে সাজানো অস্ত্র মামলায় বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। দীর্ঘদিন জেলে থাকার পর আইনি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জামিন পান। অন্ডাল এলাকায় মিথ্যা মামলায় সিপিআই(এম)-এর কয়েকজন জোনাল কমিটির সদস্য ও আর.এস.পি.-র নেতৃস্থানীয় সদস্যদের নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রাখা হয়। সত্তর দশকে এই ধরনের আক্রমণ অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, সেদিন আক্রন্ত হয়েছেন নেতৃত্বস্থানীয় কর্মীরা, পরবর্তীকালে জনগণ। এবার প্রথম থেকে সাধারণ কর্মী ও জনগণ আক্রান্ত। বামপন্থীদের সমর্থন করার অপরাধে নিজ জমিতে চাষ বন্ধ, পাট্টা ও বর্গা জমি থেকে গরিবদের উচ্ছেদ, ভ্যান চালকের ভ্যান কেড়ে নেওয়া, পুরনো জিনিসপত্র কিনে গ্রামে গ্রামে ঘোরা ফেরিওয়ালার ঘোরা বন্ধ, গঞ্জের ছোট্ট দোকান আজও বন্ধ, কৃষককে ভাতে মারার জন্য সরকারি গভীর নলকূপ থেকে সেচের জল থেকে বঞ্চিত। এর সাথে যুক্ত বিপুল হারে জরিমানা। পুকুরের মাছ লুঠ, বাগানের গাছ কেটে ধ্বংস, ঘরবাড়ি ভাঙা বা লুঠ, দোকানপাট লুঠ কিংবা বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা প্রতিদিনই বেড়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন সাধারণ মানুষ, কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাঁদের রুটি-রুজি। তৃণমূলের এই দুষ্কৃতীরা কতটা অমানবিক, নিষ্ঠুর তার বেশি দৃষ্টান্ত স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার সুযোগ নেই। গলসি এলাকার রামপুর গ্রামে মধ্যবিত্ত এলাকায় হাস্কিং মেসিন, মোটর সাইকেল, টিভি লুঠ এবং ভাঙচুর করার পর গরিব পাড়াতে শুরু হয় অমানবিক নির্যাতন। এক রাত্রে ৩০০ জন মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন। গোয়াল বা বাড়িতে রাখা গরু-ছাগলকে একফোঁটা জলও খেতে দেওয়া হয়নি। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে কিংবা এলাকার বিধায়কদের নেতৃত্বে একাধিকবার জেলা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া সত্ত্বেও কোনো ফল হয়নি। তদন্ত তো দূরের কথা, কিছু ক্ষেত্রে আক্রমণের মাত্রা আরও বেড়েছে। জেলা পুলিশ সুপারের নিকট বহুবার ঘরছাড়া কর্মীদের বাড়িতে বসবাসের অধিকার নিয়ে আবেদন করলেও কোনো কর্ণপাত করা হয়নি। এমনকি বিধায়কদের নিজ এলাকায় নির্বিঘ্নে থাকার পরিবেশ নেই। কৃষক সহ গরিব ঘরের কর্মীরাই শুধু আক্রান্ত হন নি, আক্রান্ত হয়েছেন বাড়ির মেয়েরা। মহিলাদের গ্রেপ্তার করে জেল খাটানো হয়েছে। রাতের অন্ধকারে গরিব পাড়াগুলিকে সন্ত্রস্ত করার জন্য মহিলাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। শুধু দু-একটি গ্রামে নয়, প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তত ৫০/৬০টি গ্রামে পরিকল্পিত হামলা চালানো হয়েছে। কিছু গ্রামে ৪০/৫০ জন গরিব ঘরের কর্মীকে মিথ্যা মামলায় জেলে রাখা হয়েছে। নজিরবিহীন এই আক্রমণ গরিবদের মনোবলে বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারেনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁদের বাড়ির যুব অংশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এর সাথে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল নজর কাড়ার মতো, প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এঁরাই সামনের সারিতে থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বে

এবারের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা ছিল ৪,০৬৭, পঞ্চায়েত সমিতির ৭৭৯ এবং জেলা পরিষদের ৭৫। ২০০৮ সালের সপ্তম পঞ্চায়েত নির্বাচনের তুলনায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ৪৬৭, পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে ৩০ এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ৮টি আসন বৃদ্ধি হয়। এবার সন্ত্রাসজনিত কারণে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে ৩১০টি আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করা যায়নি। মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর বাইক বাহিনীর প্রচণ্ড হামলা, বাড়ি বাড়ি আক্রমণ, তীব্র সন্ত্রাস মোকাবিলা করেও গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩০২১, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৬২৩ এবং জেলা পরিষদে ৭৩ জন বামপন্থী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেস মারাত্মক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮০৫টি আসন, পঞ্চায়েত সমিতির ১২৫টি এবং জেলা পরিষদের ২টি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে।

এবার মনোনয়নপত্র দাখিল করাটাই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। অভূতপূর্ব সন্ত্রাসের মধ্যে এই মনোনয়নপত্র জমা দেবার কাজটি করতে হয়েছে, নির্বাচন কমিশন বর্ধমান জেলার ৩১টি ব্লককেই সন্ত্রাস কবলিত হিসেবে চিহ্নিত করে মহকুমা শাসকের নিকট মনোনয়নপত্র জমা দেবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নজিরবিহীন সন্ত্রাসের জন্য ৯টি ব্লক থেকে মহকুমা শাসকের নিকট প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন আক্রান্ত ও গুরুতর আহত হন দুর্গাপুর-১ বি জোনাল সম্পাদক সুশান্ত ব্যানার্জি। আক্রান্ত হবার পর তাঁর একটি কানের শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ওই দিনই লাউদোহা এলাকায় লোকাল কমিটি অফিস ভাঙচুর ও লুঠ করা হয়। বামফ্রন্টের সমস্ত প্রার্থী ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসকবলিত পাণ্ডবেশ্বরে ৫ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র দাখিল করে। মেমারি-১ এলাকাতেও কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র দাখিল হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা সাইকেল, মোটর সাইকেল ভাঙচুর করে, কয়েকজন কর্মীকে আক্রমণ করে, তবু কর্মীরা পিছু হঠেননি। শক্তিগড় সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা বিগত দুই বছর ব্যাপক সন্ত্রাসের মধ্যেও মাথা উঁচু করে লড়াই করে গেছে। এক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা লক্ষণীয়। মনোনয়নপত্র দাখিল শুরু হতেই কংগ্রেস সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আক্রান্ত হতে থাকে। বড়শুলে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হলে জমায়েত ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। প্রশাসন এলাকার নেতৃত্বকে জানায় যে জমায়েত করার প্রয়োজন নেই, প্রার্থীদের যথোপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। মনোনয়নের ১৮ ঘণ্টা আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ব্লকের ১০০ গজের মধ্যে ছাড়া কোনো ক্ষেত্রে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই এলাকার কর্মীরা ব্যাপক জমায়েত করেন। আদিবাসী সহ ব্যাপক গরিব মানুষ জমায়েত হন। কোনো প্ররোচনা বা কোনো ঘটনা ঘটেনি। হঠাৎ পুলিশ জমায়েতের উপর হামলা করে, স্থানীয় পার্টি নেতা জাবেদ আলী সহ বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করে, এলাকার লোকাল কমিটির সম্পাদক জহর দত্ত সহ ৪০ জন কর্মীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সহ অন্যান্য কর্মীরাও আক্রান্ত হন। পুতুণ্ডা, করন্দা, ভৈটা, খাড়গ্রাম, শক্তিগড় উত্তর বাজার, পালসিট, আমড়া এলাকায় গভীর রাত্রে পুলিশের হামলা শুরু হয়। গরিব পাড়ার মহিলারাও রক্ষা পাননি। উল্লেখ্য, এখানে বিস্তীর্ণ এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো দাপট ছিল না, পর পর স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় তৃণমূল কংগ্রেস। কার্যত সুচতুর পরিকল্পনার মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনকে উলঙ্গ ভাবে ব্যবহার করে এলাকার দখল নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। এই ধরনের ঘটনা শুধু শক্তিগড় এলাকায় নয়, নির্বাচনের আগে শক্তিশালী এলাকাগুলিতে ঘটানো হয়। নেতৃস্থানীয় কর্মীদের বিভিন্ন সাজানো মামলায় গ্রেপ্তার করে, গভীর রাত্রে পুলিশি হামলায় গ্রামগুলিকে সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা হয়। তৃণমূলের আধিপত্য বৃদ্ধির এই নগ্ন প্রচেষ্টার

বিরুদ্ধে মূলত গরিব মানুষ সোচ্চার হয়েছেন, দলবদ্ধভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। প্রার্থীদের বিরুদ্ধে এত হামলা সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসন কোনো অভিযোগ গ্রহণ করেনি, বরং আহত অভিযোগকারীকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর থেকেই পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে বলপূর্বক মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার জন্য আক্রমণ বাড়তে থাকে। গলসী-২ ব্লকের ভুঁড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কেটনা গ্রামের প্রার্থীদের তৃণমূল দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করলে এলাকার আদিবাসী সহ গরিবরা প্রতিরোধ করেন। তৃণমূল দুষ্কৃতীদের আক্রমণে নিহত হন মদন সোরেন। আজও তার খুনীদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। উল্টে আক্রমণ করা হচ্ছে মদন সোরেনের পরিবারকে। এই ঘটনার পর বামপন্থী প্রার্থী ও প্রস্তাবকদের অন্যত্র সরিয়ে রাখতে হয়। শুরু হয় প্রার্থী ও প্রস্তাবকদের পরিবারের উপর আক্রমণ, ওদের আক্রমণে প্রার্থীর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা রেহাই পাননি। বাড়ির বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল, মেয়েদের হুমকি দেওয়া হল কামদুনি করে দেওয়া হবে বলে। মোটর সাইকেল বাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরছে, প্রশাসন নীরব। জেলা প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন ও পুলিশকে জানিয়ে কোনো ফল হয়নি। প্রকাশ্য দিবালোকে সন্তানের মাথায় পিস্তল ধরে মনোনয়নপত্র তোলার হুমকি, কতক্ষণ এই যন্ত্রণা সহ্য করবে? স্ত্রী ও সন্তানদের পর্যন্ত অন্যত্র রাখতে বাধ্য হয়। কয়েক হাজার মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে রাখা, এটা সাংগঠনিক শক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৩৪ এবং পঞ্চায়েত সমিতির ১২২টি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য হতে হয়। ৪১ জনকে বলপূর্বক অপহরণের নির্দিষ্ট তথ্য পুলিশ সুপারকে জানানো হয় এবং সাংবাদিক সম্মেলনেও তা পেশ করা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

এই প্রতিকূলতার মধ্যেও সেলাম জানাতেই হবে সেই সাহসী, সংগ্রামী বন্ধুদের এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে যাঁরা প্রবল আক্রমণের মধ্যেও অসীম সাহসিকতার সাথে শেষ দিন পর্যন্ত মাথা উঁচু করে লড়াই-এর ময়দানে সামিল হয়েছেন। এবার নির্বাচনে পর্যাপ্ত দেওয়াল লিখন এমনকি পোস্টার দেওয়ার মতো পরিবেশ ছিল না। প্রকাশ্য প্রচার করার সুযোগ ছিল সীমিত। প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন, কর্মীরা রাতের অন্ধকারে ছোটো ছোটো বৈঠক করেছেন। নির্বাচনী সভার জন্য প্রশাসনের নিকট অনুমতি সংগ্রহ ছিল কঠিন কাজ। অভিযোগ নিয়ে পাঁচ শতাধিক চিঠি জেলা প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয়। বর্তমান প্রশাসন রাজনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে এই অভিযোগ সম্বলিত চিঠির কোনো মূল্য দেননি। সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের প্রায় সকল অংশ নিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে উলঙ্গভাবে শাসকদলের পক্ষে দাঁড়ানোর এমন নজির অন্য কোনো জেলায় ছিল কিনা জানা নেই। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় এই ঘটনাগুলি থেকে প্রশাসনের প্রতি সাধারণ জনগণেরও যে ঘৃণা বেড়েছে, তারও কিছু বহিঃপ্রকাশ পরবর্তীকালে দেখা গেছে।

নির্বাচন না প্রহসন?

নির্বাচনী প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের বক্তব্য শুনে মনে হয়েছিল ভোটের দিন আক্রমণের মাত্রা আরো তীব্র হবে। আমাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো। গত বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের অনুকূলে থাকা ৯টি বিধানসভা কেন্দ্র ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী এলাকাগুলি ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ্য। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন সকালেই জামুড়িয়া ব্লকের মদনতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মধুডাঙ্গা বুথে সেখ হাসমত খুন হন। আগের দিন রাত্রি থেকে বহিরাগত সমাজবিরোধীরা জড়ো হয় ওই গ্রামে। মধুডাঙ্গার মুসলিম গরিব পাড়ার মানুষ সতর্ক ছিলেন। আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা দেখে পুলিশকে খবর দেন, পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। পরিস্থিতি অনুধাবন করে সকল মানুষ ভোরবেলাতেই ভোটকেন্দ্রে যাবার চেষ্টা করে। ওরা বাম-সমর্থক ভোটারদের উদ্দেশ্যে বোমা ছোঁড়ে। ছুটে আসে কমরেড হাসমত। তাঁর পেটে বোমা লেগে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, আহত হন বেশ কিছু মহিলা ও পুরুষ। হাসমত সাগার স্ত্রী মনোয়ারা বিবি ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী। এই ঘটনায় তাঁকে দমানো যায়নি। সমস্ত মানুষকে তিনি বলেন, আমার স্বামী ভোটের জন্য জীবন দিয়েছে, যে-কোনো মূল্যে ভোট করতে হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে অন্যান্য ভোটারদের ডেকে আনেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ওই বুথে বিধানসভায় সিপিআই(এম)-এর প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৬৫ শতাংশ, পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেটা বেড়ে হয় ৮৩ শতাংশ।

সমগ্র জেলায় নির্বাচনের দিন বেলা ৯টার পর থেকেই শুরু হলো বুথ দখল। বামফ্রন্টের পোলিং এজেন্টদের আক্রমণ করে বুথ থেকে সরিয়ে দিয়ে শুরু হলো বুথ দখল। বেশিরভাগ অবজারভারদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সেক্টর অফিস চুপচাপ। সারা জেলায় বুথ দখলের যে চিত্রটি উঠে এসেছে তা এরকম—বেলা ১০টার মধ্যে ৩৫৭টি বুথ, বেলা ১০টা থেকে ১.৩০ টার মধ্যে আরও ৩১১টি বুথ, দুপুর ১.৩০টার পর থেকে ৫টা পর্যন্ত আরও ৩৮৭টি বুথ, এবং ৫টার পর ২৩টি বুথ—সর্বমোট ১০৭৮টি বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়। তৃণমূলিরা দখলীকৃত বুথগুলিতে প্রতি স্তরেই ২০০-৩০০ ব্যালট পেপার প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে ছিনিয়ে ছাপ দেয়। কোনো কোনো বুথে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের কর্মীরা ভোটারদের ভয় দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিতে বাধ্য করে। আবার কোনো জায়গায় ভোটকক্ষের প্লাইউডের আড়াল সরিয়ে ভয় দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিতে বলা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাতে কালি ও টিপছাপ নেবার পর ব্যালট কেড়ে নেওয়া হয়। সশস্ত্র আধা-সামরিক বাহিনীর কোথাও দেখা পাওয়া যায়নি। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন শুধু তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু উপর তলার ইঙ্গিতে কোনো ভূমিকা নিলেন না। কিছু প্রিসাইডিং অফিসার রুখে দাঁড়ালেন, কিন্তু নিরাপত্তাহীনতার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। মনোনয়নপর্ব থেকেই বামপন্থীরা 'গণতন্ত্র বিপন্ন' এই আওয়াজ তুলেছিল, জনগণ নির্বাচনের দিন প্রত্যক্ষ করলো গণতন্ত্র সত্যিই বিপন্ন।

গণনার উপরেও ভরসা করা গেল না

আমাদের ধারণা ছিল যে-এলাকাগুলিতে নির্বাচনের দিন ব্যাপক বুথ দখল হয়েছে, সেখানে ভোট গণনায় সমস্যা হবে না। কিন্তু বাকি এলাকায় যেখানে সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে জনগণ ভোট দিয়েছেন, সেখানে গণনায় গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা বেশি। আমাদের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হলো। মন্তেশ্বর ব্লকে গণনার আগের দিন গভীর রাত পর্যন্ত কাউন্টিং এজেন্টদের পরিচিতিপত্র দেওয়া হয়নি। রায়না-১ ব্লকে বিডিও অফিসের মধ্যেই সমস্ত কাউন্টিং এজেন্টদের কার্ড কেড়ে নেওয়া হয়। সাংগঠনিক তৎপরতায় কয়েক ঘণ্টায় সেই কার্ড তৈরি করতে হয়। হুমকি দেওয়া হতে থাকে কোনো কাউন্টিং এজেন্টকে গণনা কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হবে না। নির্বাচন কমিশন, জেলা প্রশাসনকে তা জানানো হয়, কিন্তু কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়নি। গণনার দিন সকালেই আউসগ্রাম-১ এলাকায় গণনাকেন্দ্রে, গুসকরা কলেজে সমস্ত কাউন্টিং এজেন্টদের পুলিশের সামনেই ব্যাপক মারধোর শুরু হলো। কোনো বামপন্থী এজেন্ট গণনাকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারেননি। একই চিত্র সন্ত্রাস-কবলিত কেতুগ্রাম-১

এলাকায়, সেখানে কেউ উপস্থিত হতে পারেননি। জামালপুর এলাকার কর্মীরা গণনা শুরু হবার সাথে সাথেই আক্রান্ত হন। প্রতিটি বুথে বামপন্থীদের জয়লাভ দেখে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উত্তেজনা বাড়তে থাকে, সেখানে শুরু হয় স্থানীয় বিধায়কদের নেতৃত্বে ব্যাপক আক্রমণ। মহিলা এজেন্ট সহ সকলেই আক্রান্ত হন। প্রথম দেড় ঘণ্টার মধ্যে গণনাকেন্দ্রে বামপন্থীদের বিপুল জয়লাভ দেখে আক্রান্ত হন রায়না-১ এলাকার কর্মীরা, মহিলা প্রার্থী সহ ১৯ জন কাউন্টিং এজেন্ট পুলিশের সামনে আক্রান্ত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় ৫ জনকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করতে হয়। মেমারি-১ এলাকায় গণনার ২ ঘণ্টা পরই শুরু হয় আক্রমণ। একজন কর্মীর হাত ভেঙে দেওয়া হয়। আক্রমণের মুখে গণনা টেবিল থেকে এজেন্টরা চলে আসতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রেও পুলিশ ছিল নির্বাক দর্শক। মেমারি-২ এলাকায় আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়ে। গুজব ছড়ানো হয় ৪ জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে তীরবিদ্ধ করা হয়েছে। এর পরই ২০০ গজের বাইরে সিপিআই(এম)-এর জমায়েতকে পুলিশ আক্রমণ করে। আর পুলিশ আক্রমণের পর শুরু হয় তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে নষ্ট করে দেয়। বিডিও বাধা দিতে গেলে তিনি আক্রান্ত হন। মহিলা বিডিওকেও যেভাবে আক্রমণ করা হলো, সিপিআই(এম) কর্মীরা না থাকলে অনেক বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেত। বিডিও-কে আক্রমণের পর শুরু হলো সিপিআই(এম) এজেন্টদের উপর আক্রমণ। এক গর্ভবতী মহিলাকর্মীর পেটে লাথি মারে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। পেটের সন্তান বাঁচবে কিনা চিকিৎসকরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কয়েকশা তৃণমূল কর্মী গণনাকেন্দ্রে ঢুকে পড়ে গণনা ভণ্ডুল করে দেয়। বর্ধমান সদর-১ ব্লকেও মাত্র ১ ঘণ্টা এজেন্টরা ছিলেন। তাঁদের মেরে হঠিয়ে দেওয়া হয়। বর্ধমান-২, রায়না-২, মন্তেশ্বর, মঙ্গলকোট—সর্বত্র একই চিত্র। বিকাল ৩টার পর ভাতাড়, পাণ্ডবেশ্বর এবং বিকাল ৫টার পর কালনা-১ এবং পূর্বস্থলী-১-এর কাউন্টিং এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়। আর আউসগ্রাম-২-এর গণনাকেন্দ্রে সিপিআই(এম) এজেন্টরা ব্যাপক বোমাবৃষ্টির জন্য ঢুকতে পারেন ঘণ্টা তিনেক পর। কেতুগ্রাম-২ এবং কাটোয়া-২ পঞ্চায়েত সমিতিতে বামপন্থীদের জয়লাভ ঘোষিত হবার পর পুনর্গণনার নাম করে ২টি করে আসন জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়। সর্বমোট ১৬টি ব্লকের গণনাকেন্দ্রে এই অবস্থা চলতে থাকে। পরপর দুটি চিঠির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে গণনা বন্ধ রাখার আবেদন জানানো হয়। বিকাল ৩টায় সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হয় ১২টি গণনাকেন্দ্রে সিপিআই(এম) এজেন্ট নেই। প্রতি ক্ষেত্রেই গণনা কেন্দ্রের মধ্যে কয়েকশো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ঢুকে তাদের আক্রমণ করছে। বামফ্রন্ট এজেন্টদের ক্ষেত্রে ছিল প্রশাসনের কড়া মনোভাব, নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাড়া কারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না, কিন্তু তৃণমূল কর্মীরা অবাধে কোনো কার্ড ছাড়াই মোবাইল হাতে গণনা কেন্দ্রে ১৫০/২০০ জন ঢুকে পড়ে। কার্যত ১২টার পর গণনাকেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী ফলাফল তৈরি শুরু হয়। জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ এলাকায় আর গণনা হয়নি, তৃণমূল কংগ্রেস কত পাবে, খুশি মতো সেই সংখ্যা বসানো হয়। কার্যত গোটা ঘটনাটা প্রহসনে পরিণত হয়। অণ্ডাল জেলা পরিষদের আসনে বামপন্থী প্রার্থী জয়লাভ করার পর পুনর্গণনার নামে তৃণমূল প্রার্থীকে জেতানোর চেষ্টা চলে। বংশগোপাল চৌধুরী ও সিপিআই নেতা আর সি সিং-এর দৃঢ়তায় তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। গণনাকেন্দ্রে আক্রমণ লক্ষ করেই আমাদের বক্তব্য ছিল যে, বামপন্থীদের অনুকূলে ফলাফল লক্ষ করেই এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ। বামপন্থীদের ফলাফল খারাপ হলে তৃণমূল কর্মীরা তা উপভোগ করতো, এই ধরনের আক্রমণ সংগঠিত হতো না। আমাদের ভাবনার সঙ্গে মিলেছে গণনাকেন্দ্র থাকা কমিশন নিযুক্ত কর্মীদের অভিমত। বিরোধী অংশের কর্মীরা কেউ কেউ বলতে বাধ্য হচ্ছেন—"এই পাপ লুকাবো কোথায়?" দীর্ঘদিন গণনার সঙ্গে যুক্ত বহু কর্মী এখন বলতে বাধ্য হচ্ছেন জেলা পরিষদে অন্তত ৪২/৪৩টি আসন, পঞ্চায়েত সমিতিতে অন্তত ১৬টি, গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ৪৫-এর জায়গায় ১৪৫টিতে হতো বামপন্থী বোর্ড।

১১টি গণনাকেন্দ্রে মাত্র ২ ঘণ্টা বামপন্থী এজেন্টদের উপস্থিতিতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এমন গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,১৫২টি অর্থাৎ ৩৮.১৩ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে শতাংশ বিচার করাটা অনেকটাই কঠিন, তবু সাংগঠনিক উদ্যোগে যে তথ্য সামনে এসেছে তা হলো জেলায় মোট বুথ ৪,৭৯৪, ভোটের দিন ১০৭৮টি বুথে এবং গণনাকেন্দ্রে ২,৬১৯টি বুথে ভোট লুট হয়েছে। আবার জেলার এমন অসংখ্য বুথ রয়েছে যেগুলিতে ভোটের দিন এবং গণনার দিন উভয়ক্ষেত্রেই ভোট লুট হয়েছে। সাংগঠনিকভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে জেলার মোট ১,০৯৭টি বুথে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে ও গণনায় কারচুপি হয় নি বলা চলে। এই ১,০৯৭টি বুথে বামফ্রন্ট ভোট পেয়েছে ৪৮.৬০ শতাংশ। উল্লেখ্য, এই বুথগুলির অধিকাংশই অন্য এলাকার তুলনায় সাংগঠনিক ক্ষেত্রে দুর্বল। তাই, বিরোধীদের আত্মসন্তুষ্টির কারণে তারা এই এলাকাগুলিতে সন্ত্রাস করেনি বা বাড়তি নজর দেয়নি। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই বুথগুলিতে বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৪২ শতাংশ। ফলে, গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় দেখা যাচ্ছে এই বুথগুলিতে বামফ্রন্টের ভোটের শতাংশের হারে বৃদ্ধি ঘটেছে।

বামপন্থীদের অনুকূলে সমর্থন কতটা ছিল দু-একটি উদাহরণে বোঝা যায়। এক্ষেত্রে মেমারি-১ ব্লকের ফলাফল থেকে ধারণা কিছুটা স্পষ্ট হবে, গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটে সমগ্র এলাকায় সিপিআই(এম) তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে ১,৭৯১টি ভোট বেশি পেয়েছে। কিন্তু গণনাকেন্দ্র থেকে সিপিআই(এম) এজেন্টদের তাড়িয়ে দেবার পর পঞ্চায়েত সমিতির গণনায় দেখা গেল সিপিআই(এম) তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে ১,১৩৬টি ভোট কম পেয়েছে। একটি জেলাপরিষদ আসনে ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বামপন্থীরা তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে ৩,০২১টি ভোট বেশি পায়, অন্যদিকে সেই এলাকাতেই জেলা পরিষদ স্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে ৩,৪৭১টি ভোট কম। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অনেক বুথে বামফ্রন্টের ব্যালট পেপার স্ট্যাম্প মেরে বাতিল বলে গণ্য করা হয়েছে। ফলে এই সকল বুথে অস্বাভাবিক হারে বাতিল ব্যালটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপর দিকে উদাহরণ হলো ভাতাড়ের বনপাশ গ্রাম পঞ্চায়েত। ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে শাসকদল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে, কার্যত জোর করে মনোনয়নপত্র তুলতে বাধ্য করে। ৬টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৬টিতেই সিপিআই(এম) জয়লাভ করে। গত বিধানসভা নির্বাচনে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্টের প্রার্থী পারুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ সাহাকে একটি সাজানো মামলায় প্রায় ২ বছর জেল বন্দি করে রাখা হয়েছে। মানুষ সুযোগ পেয়ে এবার ব্যালটে তার জবাব দেয়। কালেখাঁতলা-২ এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সব কটি আসনে বামপন্থীরা জয়লাভ করেন। তৃণমূল কোনো আসনই পায়নি।

জেলা পরিষদে গণনায় কারচুপি অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। ভাতাড়ের ৭৭ নং বুথ, যেখানে বিধানসভায় বামপন্থীরা ৩০২ ভোট পেয়েছিল। এবার মাত্র ৩। ৭৬ নং বুথে বিধানসভায় ভোট পেয়েছিল ৩২১ এবার মাত্র ৫। ৭৫ নং বুথে বিধানসভায় ভোট পেয়েছিল ৪১০ এবার মাত্র ৯। এই রকম ৬২টি বুথ আছে যেখানে এরকম ভোট

হয়েছে। জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সর্বত্র একই চেহারা। মঙ্গলকোট বিধানসভায় বামপ্রার্থীদের ভোট ছিল ২১৭, এবার মাত্র ৩, ৪১ নম্বর বুথে বিধানসভায় বামপ্রার্থীদের ভোট ছিল ৩৭৩, এবার মাত্র ৫। এইভাবে ৭৯টি বুথ আছে যেখানে বামপ্রার্থীরা ৩, ৫, ৬, ১১, ১৪ এই সংখ্যায় ভোট পেয়েছে। বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে ৫১টি বুথ আছে যেখানে সর্বোচ্চ ভোট এবার ৯৯, অথচ বিগত বিধানসভায় ৫৬৭, ৫৮৫, ৬২৭, ৬২৮ ভোট বামপ্রার্থীরা পেয়েছে। রায়না বিধানসভা কেন্দ্রে ২৮টি বুথে যেখানে গত বিধানসভায় বামপ্রার্থীরা পেয়েছিল ৫,৭৭৪ ভোট, এবার পঞ্চায়েতে মাত্র ৭২৯টি ভোট। ভোট যে লুঠ হয়েছে এই প্রচার বাড়ছে ক্রমশ। প্রচারমাধ্যম তৃণমূলের জয়-জয়কার দেখছে। আসল সত্যটা জানে এলাকার মানুষ আর গণনার দিন কমিশন-নিযুক্ত গণনাকর্মীরা। সামগ্রিক এই ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করে প্রবীণ মানুষরা মন্তব্য করছেন, ''এই আক্রমণ ৭২ সালকেও লজ্জা দিচ্ছে, এ যেন আধা-ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি।''

এই নির্বাচনে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এমন বেশ কয়েকটি বুথ আছে, যেমন—রায়না ১নং ব্লকের সীতাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কেউগুড়ি-পূর্ব সহ কিছু বুথ যেখানে অতীতে কোনোদিনই বামপন্থীরা জয়লাভ করতে পারেনি। সে সকল বুথে শান্তিপূর্ণ ভোট ও গণনা হবার কারণে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থীরা উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জয়লাভ করেছে। সাধারণ মানুষের মনোভাবের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন।

আজকের কাজ

বিগত দুই বছরে কৃষক ফ্রন্টের নেতৃত্বে ফসলের দর নিয়ে আন্দোলন, মজুরি বৃদ্ধির লড়াই, কৃষকের আত্মহত্যা ও চিটফান্ডের প্রতারণার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। সার, কীটনাশক, ডিজেল, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, সর্বোপরি মহিলাদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হয়। বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্ষোভ প্রতিদিনই বাড়ছে। শিল্পাঞ্চল ও কৃষি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় জাঠা কর্মসূচিতে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণ হয়। এই অবস্থায় মানুষ এই রায়কে মেনে নিতে পারে না।

সাথে সাথে মনে রাখতে হবে, মাত্র ২ বছরেই এই সরকার সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে জনগণের মোহভঙ্গ হয়ে গেছে এমন দাবি আমরা করতে পারি না। কিন্তু, ক্রমশ শাসকদলের সমর্থন যে কমছে, তা তাদের ঘৃণ্য আক্রমণ থেকে স্পষ্ট। নির্বাচনটা অবাধ ও সুষ্ঠু হলে নির্বাচনী ফলাফলের প্রকৃত চিত্র যেমন আমরা বুঝতে পারতাম তেমনি পর্যালোচনা করায়ও সুবিধা হতো। শ্রমজীবী অংশের শত শত তরুণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রহসনে পরিণত করার বিরুদ্ধে আদিবাসী মহিলা, গরিব মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে কয়েক হাজার জমায়েত হন। ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করে গরিবরা তাঁদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই ধরনের ঘটনা জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সম্পদ আমরা পেয়েছি তাঁদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলাই এখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আক্রান্ত কর্মীদের পাশে আমাদের দাঁড়াতেই হবে। কীভাবে নিচের তলার কর্মীরা মাথা উঁচু করে লড়াই করছেন, মনোযোগ দিয়ে যদি শুনি তা আমাদের বিস্মিত করবে। ভবিষ্যতে বড় ধরনের সংগ্রামের জন্য কর্মীরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করাটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

জাল-জোচ্চুরি করে পঞ্চায়েত ভোটে জিতে তৃণমূল কংগ্রেস যতই আস্ফালন করুক, মানুষ সুযোগ পেলে এর যথাযোগ্য জবাব দেবেই। এই ধরনের অগণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা কঠিন। মানুষের রায়ের প্রতিফলন স্পষ্ট হবে আগামী লোকসভা নির্বাচনে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ২০০৩ ও ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোট দেখেছেন। এই ধরনের ভয়ংকর সন্ত্রাস এবং গণনাকেন্দ্রে ব্যাপক কারচুরি কখনও দেখেননি। অতীতে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনে বিচ্ছিন্ন কিছু অনভিপ্রেত ঘটনাকে সামনে এনে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর এই নির্লজ্জ ও পাশবিক আক্রমণকে লঘু করে দেখানোর এক অপপ্রয়াস শুরু হয়েছে। ন্যূনতম চক্ষুলজ্জাকে উপেক্ষা করে জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ একাংশ যেভাবে শাসকদলের হয়ে প্রকাশ্য কাজ করছে তাও নজিরবিহীন। নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি নির্দেশ এখানে উপেক্ষিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নিচুতলার আধিকারিকরা অসহায় বোধ করেছেন। ভোট গ্রহণে এবং গণনা কেন্দ্রের সাথে যুক্ত সরকারি আধিকারিক, শিক্ষক, কর্মচারী সহ অন্যান্য অংশ সকলেই গণতন্ত্রের এই চেহারা দেখে হতবাক হয়ে গেছেন। এমনকি বামফ্রন্টের বিরোধী সংগঠনের কর্মীরাও অনেকে এই অন্যায় মেনে নিতে পারেননি। ফলাফল প্রকাশের এক মাসের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও সরকারি দপ্তর পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রকাশ করতে পারেনি। কেন সম্ভব হয়নি এটা বুঝতে কারো বাকি নেই। অথচ অন্যান্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে চার দিনের মধ্যে জেলা পরিষদের বুথওয়ারি ফলাফল জানা সম্ভব হয়েছে। এই নির্বাচনী ফলাফল জেলার গ্রামীণ জনগণের মনোভাবের স্বাভাবিক প্রতিফলন বলে মেনে নেওয়া যায় না। জেলার সাধারণ মানুষও তা মনে করেন না।

গণতন্ত্রের উপর আঘাতের বিরুদ্ধে আমাদের ধারাবাহিক প্রচারাভিযান চালাতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ প্রতিদিনই বাড়ছে, টাকার দাম কমছে, ডিজেল, পেট্রোলের দাম বাড়ছে, বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম, শিল্পে উৎপাদন কমছে, কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, নতুন শিল্প গড়ার সম্ভাবনা নেই, ফলে কর্মহীনতা বাড়ছে, কর্মসংস্থানেরও সুযোগ নেই। বেকার যুবকদের যন্ত্রণা আরও বাড়বে। কৃষকের জীবনে নামছে ভয়ঙ্কর অন্ধকার। ঋণভারে জর্জরিত হয়ে বর্ধমান জেলাতেই ৬৭ জন কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। অপরদিকে, কেলেঙ্কারির পর কেলেঙ্কারিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিপর্যস্ত। মহিলাদের উপর আক্রমণ আজ দৈনন্দিন ঘটনা, রাজ্যের মহিলারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। রুটি-রুজির জন্য সংগ্রামের সাথে মানুষের অধিকারের আন্দোলনকে যুক্ত করতে হবে। গণতন্ত্রের উপর আঘাতের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা আজ সবচেয়ে জরুরি। বামপন্থী কর্মীদের প্রতি মুহূর্তে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ইতিহাসের শিক্ষা হলো—সন্ত্রাস শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে জনগণ।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

রানীগঞ্জ পৌরসভা

নাগরিকদের নিকট আবেদন

- বাড়ি তৈরি করার আগে আপনার জমির মিউটেশন করান। বাড়ির নকশা অনুমোদনের পর বাড়ি করুন। অনুমোদিত নকশা মেনেই বাড়ি করুন। এই আইন ভাঙলে পৌর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- রাস্তার কলের পানীয় জল অপচয় করবেন না। ব্যবহারের পর কলের মুখ বন্ধ রাখুন। যেখানে কলের মুখ নেই পৌরসভার পক্ষ থেকে তা লাগিয়ে দেওয়া হবে।
- নিয়মিত পৌরকর দিন।
- পৌর আইন অনুযায়ী গঠিত ওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করুন।
- যে-কোনো প্রয়োজনে পৌরসভায় যোগাযোগ করুন।
- জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজে সহযোগিতা করুন। যত্রতত্র জঞ্জাল না ফেলে নির্ধারিত 'ভ্যাট' ব্যবহার করুন।

ধন্যবাদান্তে

অনুপ মিত্র
পৌরপতি

Sl. No. 9

পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৩

কিছু ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ও কর্তব্য

রথীন রায়

পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৩ মানুষের সামনে অনেক দিক উন্মোচিত করেছে, অনেক প্রশ্নের জন্মও দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার সৃষ্ট ত্রিস্তর পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা বৃহৎ পুঁজি পরিচালিত পুঁজিপতি-ভূস্বামীদের রাষ্ট্রে একটা বিস্ময়। বর্তমান যুগে গোটা পৃথিবীতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটছে। সাম্রাজ্যবাদ যখন একমেরু বিশ্বের প্রবক্তা, আমাদের দেশেও কর্পোরেট হাউসগুলির হাতে বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। আসলে কেন্দ্রীয় সরকারগুলি পরিচালিত হচ্ছে সেই লক্ষ্যেই। সে নেতৃত্বে কংগ্রেস অথবা বিজেপি যেই থাকুক। কারণ তারাই বৃহৎ পুঁজির আস্থাভাজন বৃহৎ দুই দল। উভয়েই নয়া উদারনীতির একনিষ্ঠ সমর্থক। এবং উভয়েই সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কত ঘনিষ্ঠ তার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের হাতে যে ক্ষমতাগুলি সংবিধানের নির্দেশে ছিল সেগুলিও কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। যুগ্ম তালিকার নামে প্রায় সব ক্ষমতাই কেন্দ্রের হাতে চলে গিয়েছে। অথচ বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের হাতে থাকা সামান্য ক্ষমতারও বিকেন্দ্রীকরণ ঘটালো পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। শুধু ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নয়, অর্থের জোগানেরও সুবন্দোবস্ত করা হয়।

গণতন্ত্রের এই বিকেন্দ্রীকরণ গ্রামবাংলার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। ভূমিসংস্কারের ভিত্তির উপরই পঞ্চায়েতের সাফল্য গড়ে উঠতে থাকে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সাতবার নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন হয়, কিন্তু নতুন সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে প্রথম থেকেই জটিলতা তৈরি করে। জটিলতা সৃষ্টি করে প্রসারিত গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য।

এই চক্রান্ত নিছক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের মনে হল তাই করল, বিষয়টা এমন সরল নয়। নয়া উদারনীতির অভ্যন্তরে থেকেও উন্নয়নের বিকল্প পন্থা কখনও কি সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের কেন্দ্রীয় মিত্রদের পছন্দের হতে পারে? সম্পদ যখন কর্পোরেট হাউসগুলির হাতে কেন্দ্রীভূত এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়া অতি সক্রিয় তখন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, জনগণের গণতন্ত্রে সরাসরি অংশগ্রহণ ও অর্থবহ ভূমিকা স্বৈর-শক্তির পছন্দের হতে পারে? রাজীব গান্ধীর সময়ে PM to DM তত্ত্ব আর এখন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এমনকি বিডিও-র সরাসরি যোগাযোগের তত্ত্ব গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার লক্ষণ?

সুতরাং পঞ্চায়েত-২০১৩ নির্বাচন শাসকশ্রেণির নির্ধারিত পথেই অগ্রসর হয়েছে। মনোনয়নপর্বে সন্ত্রাস, মনোনয়ন প্রত্যাহার করানোর জন্য সন্ত্রাস, পোলিং বুথে সন্ত্রাস, ভোটারদের সন্ত্রস্ত করা, গণনাকেন্দ্রে সন্ত্রাস এবং শেষ পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে বামফ্রন্ট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘুদের বোর্ড গঠনও হয়েছে। এমন নজির আর নেই। গণতন্ত্র, নির্বাচন কমিশন, কোর্ট, সংবিধান কাউকে তোয়াক্কা না করেই সব চলছে। কিন্তু লক্ষ করুন কী চমৎকারভাবে উপভোগ করছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি—রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় সরকার, নির্বাচন কমিশন, বামপন্থীরা ভিন্ন সর্বভারতীয় বা প্রাদেশিক রাজনৈতিক দলগুলি, সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম। কল্পনা করুন যদি এমন ঘটনা ঘটতো বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তবে কী চেহারা নিত সর্বভারতীয় রাজনীতি!

বোধহয় এটাই স্বাভাবিক। শ্রেণিনীতি সমূহের কী চমৎকার প্রতিফলন। গণতন্ত্র ধ্বংস হলে কোনো আঞ্চলিক দলই সুখে থাকবে না। সব রকম স্বায়ত্তশাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। জাতিসত্তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। স্বৈরতন্ত্রে শ্রমজীবী মানুষের আর্থিক দাবির লড়াই করার কোনো অধিকারই আর থাকবে না। শ্রমিকশ্রেণির সামনে এরকম পরিস্থিতি বহুবারই এসেছে। পৃথিবীর দেশে দেশে, আমাদের দেশেও। আমরা বামপন্থীরা গণতন্ত্রের শব বহন করার জন্য বসে নেই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা হল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা যখন ভূ-লুণ্ঠিত হয়, শ্রমিকশ্রেণির কর্তব্য হল সেই পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। সেই কর্তব্য পালনে আমাদের দ্রুত প্রস্তুতি নিতে হবে।

স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রয়োজন। ঐক্যই এই সময়ের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি।

২.

অনেকে বলেন যে সত্তরের দশকের মতো সন্ত্রাসের আশংকা দেখা দিয়েছে। সত্তরের দশকের সাথে অনেক পার্থক্য আছে। সেই সময় বামপন্থীদের জনসমর্থন ক্রমবর্ধমান ছিল। এখন ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সমর্থনও ধরে রাখাই কষ্টকর হচ্ছে। সত্তরের দশকে সন্ত্রাস সংগঠিত হয়েছিল পার্টির সংগঠিত গণভিত্তির সীমাবদ্ধ এলাকায়। অল্প সময়েই সহস্রাধিক সিপিআই(এম) সদস্য-কর্মী শহিদ হয়েছিলেন। এর বিরূপ প্রভাব পড়েছিল জনমানসে। কংগ্রেস ছিল মূলত নির্বাচন সর্বস্ব পার্টি। গণসংগঠন গড়ে তোলার দিকে তাদের তেমন মনোযোগ ছিল না। নকশাল আন্দোলনের হঠকারী পথকে ব্যবহার করতে পেরেছিল। যুব কংগ্রেস নামে এক খুনে বাহিনী তৈরি করতে পেরেছিল। নকশাল আন্দোলনের পথভ্রষ্ট যুবকদের সঙ্গে পেয়েছিল। সিপিআই(এম)-বিরোধিতাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। এখন তৃণমূল কংগ্রেসেরও একমাত্র লক্ষ্য সিপিআই(এম)-বিরোধিতা।

অন্য কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই। এখনও অতিবাম বিচ্যুতির শিকার মাওবাদীদের ব্যবহার করা হয়েছে। সত্তরের দশকে কমিউনিস্ট হত্যা করা হয়েছে, মিসায় আটক করা হয়েছে বিনা বিচারে। কেউ বামপন্থী হলে তার পরিবারকে আক্রমণ করা হয়নি। বাড়িঘর আক্রমণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা কমই ঘটেছে। এখন সেটাই দস্তুর। কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিগুলি অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েছে। তারা বুঝেছে শুধু সন্ত্রাস করে মানুষকে তার অধিকার থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত করা যাবে না। জনগণের মধ্যে সরাসরি হস্তক্ষেপের উপযুক্ত গণসংগঠনগুলিও তৈরি করতে হবে। সেজন্য ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক, ছাত্র, যুব, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, সংস্কৃতি, মহিলা প্রভৃতি সমাজের সব অংশের মানুষের জন্য গণসংগঠনগুলি পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক অতি দ্রুত তৈরি করতে পেরেছে। লুম্পেন কথাটার মধ্যে একটা শহরকেন্দ্রিক ভাব থাকে। শুধু শহুরে লুম্পেন নয়, গ্রামাঞ্চলের ডাকাত প্রভৃতি সমাজবিরোধীদেরও ব্যাপকভাবে সংগঠিত করা হয়েছে। এই অংশকে বার্তা দেওয়া হচ্ছে—এই সরকার তোমাদেরই। যতখুশি অপকর্ম করে যাও, শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য রেখে যাও। পুলিশ, সাধারণ প্রশাসন সংবিধানের নির্দেশে চলবে না, চলবে শাসকদলের নির্দেশ মেনে। তার জন্য হাইকোর্ট, মানবাধিকার কমিশন, নির্বাচন কমিশন—এমনকি রাজ্যপালকেও প্রয়োজনে কটুকাটব্য করা যাবে। তার জন্য তামাম ভারতে কোনো কথা কেউ বলবে না। বলছেও না। কারণ আক্রমণটা তো কমিউনিস্টদের উপর। পশুশক্তি, অর্থশক্তিতে (সে চিটফান্ড থেকেই আসুক, অথবা তোলা আদায় থেকে) প্রচার মাধ্যম, দেশিবিদেশি প্রতিক্রিয়ার শক্তি—শত্রুতামূলক রাষ্ট্রযন্ত্র— সমবেত এই শক্তিকে খাটো করে দেখা ভুল হবে। আবার এটা ভাবাও ভুল হবে যে এই শক্তি অপরাজেয়। গণতান্ত্রিক জনগণের ক্ষমতাই সর্বশক্তিমান।

৩.

এটা নিশ্চিত যে এই সরকার কখনোই গরিব মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থে কাজ করতে পারে না। কারণ এই সরকারের শ্রেণি অভিমুখ বিপরীত দিকে। বামপন্থী ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য অনর্গল মিথ্যাভাষণ ও মানুষকে প্রতারিত করছে। প্রতারকের মুখোস একদিন খুলে পড়বে। কিন্তু যদি মনে করা হয় নিজে থেকেই খুল যাবে তাহলে ভুল হবে। গণআন্দোলনের চাপেই মুখোস খুলে দিতে হবে।

আন্দোলনের বিষয়বস্তুর অভাব নেই। জনগণের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি ক্রমশই তীব্র হচ্ছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যবস্তুর মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণেই এই মূল্যবৃদ্ধির আগাম বাণিজ্যনীতি, পেট্রলের বিনিয়ন্ত্রণ, সারের ক্ষেত্রে ভর্তুকি হ্রাস, গণবন্টন ব্যবস্থা তুলে দেওয়া ইত্যাদি। সমস্ত সিদ্ধান্ত হয় এন.ডি.এ. অথবা ইউ.পি.এ.-২ সরকারের নেওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন। বামপন্থীরা যখন ইউপিএ-১ সরকারের সমর্থনে ছিল, সর্বনিম্ন সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলিকে বাধা দিয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। আর মুখ্যমন্ত্রী হয়েই শ্রীমতী ব্যানার্জী ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কামান দেগে চলেছেন। উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করা এবং নিজের সংগ্রামী ভাবমূর্তিকে পালিশ করা। এই শঠতায় মানুষকে দীর্ঘদিন বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না।

বামপন্থীদের দুর্বলতা হল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ফসলের লাভজনক দাম, সারের দাম—এইসব জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে আমরা বামপন্থীরা আন্দোলন করেছি, কিন্তু ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি।

উপরোক্ত দাবিসমূহের সাথে খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ বন্ধ, ব্যাঙ্ক, বীমায় বিদেশি পুঁজির বিরুদ্ধে, কয়লা, ইস্পাত, টেলিফোনের শেয়ার বিক্রির বিরুদ্ধে, ১০ হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরির দাবিতে, ভারতে মার্কিন সামরিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে জোরালো ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম গড়ে তোলার সর্বতো প্রচেষ্টা নিতে হবে।

গত আড়াই বছরে বর্তমান সরকার অনেক কৃতিত্ব অর্জন করেছে। নারী নির্যাতনে ভারতে রাজগুলির মধ্যে প্রথম হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রথম দিকে নারীনির্যাতনকে সাজানো ঘটনা বলে লঘু করার চেষ্টা করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক নৈরাজ্য। রায়গঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষকে মারধোর দিয়ে শুরু। এখন প্রতিদিনই এমন ঘটনা ঘটছে। এক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী ছোটোছেলেদের কাজ বলে আস্কারা দিয়েছেন। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে হাঙ্গামা, ছাত্রসংসদ নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। নানা ধরনের ঘটনায় শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য। আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের সর্বস্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের খবরদারি। তাদের নির্দেশেই সব চলছে। চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে শাসকদলের মন্ত্রী ও নেতারা জড়িত। লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এজেন্টরা অধকাংশই ছিল তৃণমূলের মস্তান বাহিনীর লোক। সরকার নিজে কোনো মামলা করেনি। রাজ্যজুড়ে ভুক্তভোগীরা মামলা করেছে। আর এ আদালত থেকে অন্য আদালতে ঘুরিয়ে চলেছে দোষীদের। হাস্যকর ব্যবস্থা। টাকা ফেরৎ দেওয়ার জন্য একটি কমিশন গড়া হয়েছে। হাজার হাজার লোক দরখাস্ত করেছে। আশায় রাখা হয়েছে টাকা ফেরৎ পাবে। কোথা থেকে ? সারদা গোষ্ঠীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। গোপনে হস্তান্তরও হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ৫০০ কোটি টাকার ফান্ড গঠনের কথা বলছেন, সিগারেটের উপর কর চাপিয়ে। আবার বাজেটে অর্থমন্ত্রী বললেন, ওই টাকা স্বাস্থ্য খাতে খরচ করা হবে। সি.বি.আই-কে অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিতে ঘোর অনীহা। এমনকি হাইকোর্টেও বিরোধিতা করা হয়। সব ফাঁস হয়ে যাবে বলে ভয়? ছাত্রনেতা সুদীপ্ত বসুর পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু—এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা নিয়ে জনগণকে সমবেত করা যেত, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি। মনে রাখতে হবে এই অপশাসন আপনা থেকে ভেঙে পড়বে না। জনগণের সচেতন হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এখন স্বতঃস্ফূর্ততার অবকাশ নেই। সংগঠিত প্রয়াস জরুরি। সেই চেষ্টাই চালিয়ে যেতে হবে।

৪.

স্থানীয় সমস্যার উপরও দৃষ্টি দিতে হবে। কী শহর কী গ্রাম অধিকাংশ স্থানেই আমরা বিরোধী পক্ষে। বিরোধী পক্ষের ভূমিকা পালনে আমাদের যত্নবান হতে হবে। যেমন ধরা যাক, শহরাঞ্চলে বস্তিবাসীদের সমস্যা। রাজ্যের সব জেলাতেই বস্তিবাসীদের সংগঠন গড়ে উঠেছে। এইসব মানুষদের অসংখ্য সমস্যা। বাসস্থান, পানীয় জল, স্যানিটেশন, শিক্ষা, কাজ—অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। শাসকশ্রেণির আক্রমণেরও নরম স্থল (সফ্‌ট্ টারগেট)। বামপন্থী আন্দোলনের শক্তিশালী মিত্র। এদের বিভ্রান্ত করার অবিরাম প্রচেষ্টা চলছে। মাংস আর মদের ফিস্ট-এর বিরাম নেই। এদের মধ্যে থেকেই লুম্পেন অংশকে পশুশক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। সেজন্যই বস্তিবাসীদের সমস্যা নিয়ে প্রথমে ছোটো ছোটো দাবি যা সহজেই আদায়যোগ্য এমন দাবি নিয়ে আন্দোলনে যেতে হবে। বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা—

দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকার তালিকা, প্রভৃতি অসংখ্য দাবি আছে। যা নিয়ে আন্দোলন করা যায়।

অসংগঠিত শিল্পশ্রমিকদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার সামাজিক নিরাপত্তার অনেকগুলি প্রকল্প নিয়েছিল। নতুন সরকার একটাও প্রকল্প চালু করেনি। সামাজিক সুরক্ষার সেই প্রকল্পগুলিকে রূপায়িত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন, পরিস্থিতির বাস্তবতা হিসেবে ধরে।

গ্রামাঞ্চলে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এখানেই দরিদ্র মানুষদের বঞ্চিত করে কারচুপির সম্ভাবনা বেশি।

সংখ্যালঘুদের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি। কিন্তু কোনোটাই কার্যকর হয়নি। রঙ্গনাথন কমিশনের রিপোর্ট—যার উপর বামফ্রন্ট সরকারই কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এরা কিছুই করেনি। মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বিস্তর কথা, কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি। উপরোক্ত দাবিসমূহ বা সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়নি এমন নয়। আন্দোলনগুলি দীর্ঘস্থায়ী, ধারাবাহিক এবং জনমানসে যথাযথ প্রভাব ফেলতে পারেনি বলেই আমার ধারণা। কারণগুলির অন্যতম হল সন্ত্রাসজনিত পরিস্থিতি, স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব, সংবাদমাধ্যমের নেতিবাচক ভূমিকা এবং সর্বোপরি সাংগঠনিক দুর্বলতা।

এটা লক্ষ করা গেছে, বিগত কয়েকটি নির্বাচন থেকে জনসমর্থনে আমাদের ভাটার টান দেখা দিয়েছিল। এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। কারণগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টাও হয়েছে। ত্রুটি সংশোধন, মতাদর্শগত আলোচনায় জোর দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ ৩৪ বছর আপাত শান্তিকালীন অনেক অভ্যাস তৈরি হয়েছিল, যা ছিল অনভিপ্রেত। ১৯৭৭ সালের পর থেকে কোনো নির্বাচনেই প্রায় আমরা পরাজিত হইনি। লাগাতার সাফল্য সংগঠনের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টি ও আত্মম্ভরিতার জন্ম দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ তা ভালো চোখে দেখেননি।

আমাদের সংগঠনে প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মী সত্তরের দশকের আধাফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস দেখেননি। সে অভিজ্ঞতা নেই। বেশিরভাগই প্রথম পরাজয়ের অভিজ্ঞতা পেল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই একটা হতচকিত মনোভাব ছিল। সার্বিক সন্ত্রাস ভীত সন্ত্রস্ত করে দিয়েছে। মতাদর্শগত ভিত্তি দুর্বল থাকার কারণে পরিস্থিতির উপযোগী মানসিকতা গড়ে তোলার দুর্বলতা থেকে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আড়াই বছর প্রায় অতিক্রান্ত। ভয়-ভীতি-জড়তা কাটিয়ে অধিকাংশ সিপিআই (এম) কর্মীরা কাজ করছেন। বহু পার্টিকর্মী ঘরছাড়া। চাকরি খুইয়েছেন অনেকে কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে অধিকাংশ সিপিআই(এম) কর্মী-সমর্থকরা নজিরবিহীন সন্ত্রাসে অকুতোভয় লড়াই করেছেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া, জবরদস্তি প্রত্যাহার করানো, প্রচার করতে না দেওয়া, নির্বাচনের দিন সন্ত্রাস, গণনার দিনে সন্ত্রাস এমনকি বোর্ড গঠন করা নিয়ে সন্ত্রাস—যা প্রকৃতই নজিরবিহীন এবং গণতন্ত্র ধ্বংসকারী।

এহেন পরিস্থিতিতে সিপিআই(এম) কর্মী-সমর্থকরা অসীম সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সাথে, পরিবারের উপর অত্যাচারকে উপেক্ষা করে জীবনমরণ সংগ্রাম করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। এই সমস্ত কমরেডদের লাল সেলাম। কিন্তু অন্ধকারের দিকও আছে। প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ পার্টি সদস্য কোনো কাজই করেননি। নিরাপদ দূরত্বে বসে ছিলেন। কিছু কিছু শান্তি ক্রয় করেছেন। তথ্য দিয়ে এবং নানা ভাবে। এই বোঝা কেন সংগঠন বহন করবে? আপাত স্ফীত দেখালেও কার্যকর নয়। একটা বড় কারখানার সিপিআই(এম) নেতা বললেন যে, যারা পার্টিসদস্য এবং গণসংগঠনের উচ্চপদে আসীন, তাদের কাজে ঢিলেমি, অথচ অল্পবয়সী সাধারণ কর্মীরা সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন। পার্টি বড় কিন্তু ইউনিয়ন দুর্বল। এটা ভালো, না পার্টিটা ছোটো কিন্তু ইউনিয়নটা সবল—কোনটা ভালো? এই সমস্ত দুর্বলচিত্তের সুবিধাবাদী কমরেডরা পার্টির সমর্থক হয়ে থাকলেই ভালো!

সিদ্ধান্ত নিলেও কোনো আন্দোলন দানা বাঁধছে না। তার অন্যতম কারণ এইসব নিষ্ক্রিয় কমরেডদের অবস্থান।

৬.

পঞ্চায়েত নির্বাচন-২০১৩ আমাদের সামনে একটি রূপালি রেখা তুলে ধরেছে। এক. বিভিন্ন গ্রামে শ্রমজীবী গরিব মানুষের সংঘবদ্ধ প্রত্যয়ী প্রতিরোধ। কখনও তৃণমূলী পশুশক্তির বিরুদ্ধে কখনও বা তৃণমূলের আজ্ঞাবাহী পুলিশের বিরুদ্ধে।

দুই. এই প্রতিরোধগুলি ছিল অধিকাংশই স্বতঃস্ফূর্ত। এরা বুঝেছিল যে তাদের অর্জিত অধিকার এবং গণতন্ত্র লুণ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিরোধ প্রয়োজন।

তিন. মহিলাদের, বিশেষ করে, গরিব ঘরের মহিলাদের সংগ্রামে ব্যাপক অংশগ্রহণ ও সাহসিকতা। মিছিল, সমাবেশ থেকে শুরু করে সশস্ত্র পশুশক্তি এবং পুলিশি নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে সাহসিক প্রতিরোধ।

চার. পঞ্চায়েত নির্বাচনে নজিরবিহীন সন্ত্রাসের আবহাওয়ায় যখন অনেক পুরনো কর্মীরা নিষ্ক্রিয় অথবা শান্তি ক্রয়কারী, তখন অল্পবয়সী তরুণ কমরেডরা এগিয়ে এসে সংগ্রামের প্রতিরোধের লাল ঝাণ্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, শত প্রলোভন প্ররোচনাকে উপেক্ষা করেই তাঁরা এগিয়েছেন। এঁরাই ভবিষ্যৎ।

আজকের পরিস্থিতিতে সিপিআই(এম)-এর কর্তব্য হল সংগ্রাম জারি রেখে এইসব নতুন কমরেডদের সংগঠনের অভ্যন্তরে নিয়ে আসা। রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে নেতৃত্বের পদে তুলে আনার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা ধারাবাহিকভাবে চালানো। শত্রুর শক্তিকে ছোটো করে দেখা মারাত্মক ভ্রান্তি। ওদের পতন সমাসন্ন এমন ধারণাও সমান ক্ষতিকর। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। জয় অবশ্যই আমাদেরই হবে। সেজন্য সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে হবে। যে সংগঠন প্রত্যেকটি বাঁক ও মোড়ের মুখে যথাযথ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। গোঁদপেয়ে নয়, সংগঠনকে হতে হবে চাবুকের মতো।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে অষ্টম পঞ্চায়েত যাত্রা শুরু করেছে। জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণে ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়নে নজির সৃষ্টি করেছে। আগামী দিনে উন্নয়নের সেই ধারা অব্যাহত রাখতে জনগণের সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ কামনা করি। পঞ্চায়েত জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য।

ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ পানাগড় বাজার, জেলা : বর্ধমান, ডাক সূচক : ৭১৩১৪৮
ফোন : ০৩৪৩-২৫২৪৩০৭

মহঃ মুরশিদ আলি
উপ-প্রধান

কাজল বাউরী
প্রধান

Sl. No. 74

বর্ধমান পৌরসভা নির্বাচন ২০১৩

রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট ভোটলুটের বর্বরতা

অপূর্ব চ্যাটার্জি

সন্ত্রাসের পথে

সংসদীয় গণতন্ত্রে কোনো রাজনৈতিক দলের সরকার পক্ষে বসা আবার পরে বিরুদ্ধপক্ষে বসা—অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কেরালায় বামপন্থীরা এই বাস্তবতায় অভ্যস্ত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটানা ৩৪ বছর বাম জামানার পর এখন তৃণমূল নেত্রীর শাসন—এই পরিবর্তন কারও কাছে স্বাভাবিক, কেউ বা দোলায়মানতায়। জনগণের একটা অংশের পক্ষে এই ঘটনাকে স্বাভাবিক হিসাবে গণ্য করার ক্ষেত্রে অসুবিধার একটি কারণ তৃণমূলের ধ্বংসাত্মক, হিংসাত্মক, কমিউনিস্ট-বিরোধী রক্তাক্ত অভিযান। ঘোর বামপন্থী সমর্থক একথা স্বপ্নেও ভাবে না একটানা ৫০ বছর বামপন্থীরা জিতেই যাবে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস-এর চেহারাটা কী? একটা ফ্যাসিস্ট মনোভাব নিয়ে দল ও সরকার চালাচ্ছে। বিরোধীকণ্ঠ স্তব্ধ কর। বিধানসভা পঙ্গু। একজনই শেষ কথা। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী দলের প্রতি আচরণ অনুমেয়। শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা দুষ্কর হয়ে উঠবে। হাঁ—এটা কিছুটা তাত্ত্বিক হলেও, বর্ধমান শহরের জনগণ বা রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই মানুষ অভিজ্ঞতায় তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। বর্ধমান পৌরসভা নির্বাচন, ২০১৩ শহরবাসীকে বোধ হয় তৃণমূলের চরিত্র ও চেহারাটা স্পষ্ট করে দিল।

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৩—বর্ধমান শহরের মানুষের কাছে এক কালো দিন এবং সমগ্র পৌর নির্বাচন প্রক্রিয়া একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বর্ধমান জেলায় ঐ দিনে গুসকরা শহরেও পৌর নির্বাচন ছিল। গুসকরা শহরে শাসক রাজনৈতিক দলের আক্রমণ প্রতিহত করে জনগণ ভোট দানে সক্ষম হলেও বর্ধমান শহরে সন্ত্রাসের চরিত্র ছিল স্বতন্ত্র। ভোটের লাইনে দাঁড়াতেই শহরবাসী তৃণমূল কংগ্রেসের ভৈরব বাহিনীর কুৎসিত, কদর্য, হিংস্র চেহারা আরও নগ্নভাবে প্রত্যক্ষ করলেন। ২০১৩ সালের পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচনে, বিশেষত বর্ধমান জেলায়, শাসকদল যে কলঙ্কজনক নজির সৃষ্টি করেছে তা কখনও মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। মনোনয়নপত্র পেশ থেকে ভোট গ্রহণ, ভোট গণনা হয়েছে, কিন্তু কী হয়েছে, কেমনভাবে হয়েছে তা তৃণমূল কংগ্রেস-দোসর মিডিয়া বন্ধুদের শত চিৎকারেও ভবিষ্যতে রাজনীতির ইতিহাসে কুৎসিত, বীভৎস চিত্র হিসাবে জীবন্ত থাকবে। এই নির্বাচনে বাইক বাহিনীর তাণ্ডব, দুষ্কৃতীদের সন্ত্রাস, জেলা শাসকের (পঞ্চায়েত নির্বাচনপর্বে) শাসক রাজনৈতিক দলের নেতাসুলভ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া, পুলিশি ক্ষমতার চরম অপব্যবহার, ভোটের দিনে অবাধ রিগিং, আর গণনাকেন্দ্রে ভোট লুটের এক স্বতন্ত্র আবহাওয়ায় নতুন কলঙ্কজনক অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে। প্রবীণ মানুষেরা বলছেন—এই ভোট লুট ১৯৭২ সালকেও লজ্জা দিচ্ছে। তখন রাজ্য নির্বাচন কমিশন ছিল না, এখন আছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন স্বস্তি পেলেও অবাধ শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে—এমন দাবি নির্বাচন কমিশন করতে পারে নি। বরং দেয় প্রতিশ্রুতি ও কর্তব্য পালনে নির্বাচন কমিশন চরম ব্যর্থ। কী ঘটলো পঞ্চায়েত, পৌরসভা নির্বাচনে? রাজ্য সরকার বনাম নির্বাচন কমিশনের লড়াই। রাজ্য সরকার নির্বাচন কমিশনকে পাত্তা দেবে না, আদালতের নির্দেশ গ্রাহ্য করবে না। নির্বাচন কমিশনের অনুব্রত মণ্ডলদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ সরকার মাছি তাড়ানোর মতো উপেক্ষা করলো। যে করে হোক তৃণমূলের জয় চাই—পুলিশ প্রশাসনের সুপার থেকে ও.সি.-কে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী-নেতাদের চরম বার্তা। নির্বাচনের নীতি অনুসারে লোকসভা-বিধানসভা নির্বাচনে যেমন ভারতের নির্বাচন কমিশন বা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা জেলা প্রশাসনের, একইভাবে পঞ্চায়েত-পৌরসভা নির্বাচনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা জেলা প্রশাসনের। কিন্তু পরিবর্তনের জামানায় এতেও পরিবর্তন। রাজ্যের মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন তাঁদের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে পুলিশ সুপার থেকে আই.সি./ও.সি.-রা। বিরোধীদের বৈধ কোনো অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না। এই নির্দেশ চরম প্রভুভক্তিসহকারে পুলিশ প্রশাসন থেকে সাধারণ প্রশাসনের একটি বড় অংশ পালন করে চলেছে। যাঁরা নিরপেক্ষতা পালনে সচেষ্ট হচ্ছেন তাঁদের চরম হুঁশিয়ারি, শাসক দলের ইচ্ছা পূরণে তাঁরা নিরুপায়। নিরপেক্ষতা দূরে থাক, বর্ধমান জেলায় পুলিশ প্রশাসন কার্যত শাসক দলের একটি শাখা সংগঠনের মতো আচরণে লিপ্ত। এটা রাজ্যের মধ্যে ব্যতিক্রমী। এর পরিণতিতে দুষ্কৃতীরাজ ও পুলিশরাজ কায়েম হলো। নির্লজ্জ দলতন্ত্রের এ এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

বর্ধমান জেলায় অনেক আগে থেকেই বেশ কিছু ব্লকে পুলিশি তত্ত্বাবধানে 'তৃণমূলি মুক্তাঞ্চল' প্রস্তুত করা হয়েছে। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বামপন্থীসহ বিরোধীদের বাড়িতে হামলা, পরিবারকে আক্রমণ, মনোনয়নে বাধা দান, প্রত্যাহারে পুলিশ ও তৃণমূলের যৌথ চাপ, প্রচারপর্বে পুলিশি বাধা, তৃণমূলি সন্ত্রাস, সাজানো মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার, ভোটের দিন জেলায় ১০৭৮ বুথ দখল, পুলিশ প্রহরায় গণনা কেন্দ্র দখল, ব্যালট ছিঁড়ে ফেলা, বামপন্থী প্রার্থীর প্রাপ্ত ব্যালটের বাণ্ডিলে উপর-নিচে তৃণমূলের ব্যালট দিয়ে ভোটের ফলাফলকে উল্টো করে দেওয়া কিংবা বামপন্থী প্রার্থীর ব্যালটে স্ট্যাম্প মেরে

বাতিল করানো—এই ধরনের ঘৃণ্য কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে শাসক দলের পক্ষ থেকে। নতুন করে ব্যালট ছাপিয়ে হিসাব মেলানো অবধি ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশ না করা—এক নজিরবিহীন ভোট সন্ত্রাসের বর্বরতায় জনমতের প্রকৃত প্রতিফলনকে খুন করে গণতন্ত্রের অন্তর্জলি যাত্রার পথকে সুগম করা হলো।

ফাউল করেও দখল কর—বর্ধমান পৌরসভা

এই পটভূমিতেই উলঙ্গভাবে জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েত দখল করার পর টার্গেট হলো বর্ধমান ও গুসকরা পৌরসভা। বিশেষত জেলা কেন্দ্র ও আর্থিক সঙ্গতিতে স্বয়ম্ভর, ১২১ কোটি টাকার বাজেট ও বিপুল স্থায়ী সম্পদে সমৃদ্ধ বর্ধমান পৌরসভা হলো আক্রমণের কেন্দ্র বিন্দু। এই সময়ে শহরের পরিকল্পিত উন্নয়নে, নাগরিক পরিষেবা প্রদানে, বস্তি উন্নয়নে, শান্তি-সম্প্রীতি-গণতন্ত্র রক্ষায় বামপন্থী পৌর বোর্ডের উজ্জ্বল ভূমিকার সাক্ষী শহরবাসী। তাই, নির্বাচনের প্রাক্কালে বামপন্থীদের পক্ষে জনমতের জমি যখন শক্ত ও দৃঢ় হচ্ছিল তখন কার্যত মন্ত্রিসভার বড় অংশ এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব পুলিশ প্রশাসনকে সামনে রেখে বল্গাহীনভাবে পৌর বোর্ড দখলে সন্ত্রাস-আক্রমণ-মিথ্যাচারে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই এই শান্ত শহরে তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশের সক্রিয় সহায়তায় অভূতপূর্ব নারকীয় সন্ত্রাস কায়েম করেছিল। রাজ্যের কিছু শহরের মতো বর্ধমান শহরেও তৃণমূল কংগ্রেসের ভয়ংকর আক্রমণ নেমে আসে। নির্বাচনের পর পরই টার্গেট করা হয় শহরের সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে। প্রায় ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী আক্রান্ত হয়। অনেক ছাত্রকর্মীকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে শহরের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণ নেমে আসে অধ্যাপক-আধিকারিক-কর্মচারী-অধ্যক্ষদের উপর। ছাত্র-যুব জেলা দপ্তরসহ শহরে বামপন্থীদের অসংখ্য পার্টি ও গণসংগঠনের অফিস হয় দখল নেওয়া হয় কিংবা বলপূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্ধমান শহরের দুটি সিপিআই(এম) লোকাল কমিটি দপ্তর বারবার আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু বন্ধ করা যায় নি। আজও বর্ধমান শহরের অনেক বাম কর্মী ঘর ছাড়া। সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা প্রাক্তন বিধায়ক শ্যাম বসুকেও তৃণমূল দুষ্কৃতীরা নীলপুর অঞ্চলে গায়ে হাত দিতে দ্বিধা বোধ করে নি। আবার শহরের অনতিদূরেই ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিলে সকাল বেলায় অংশ নিতে গিয়ে খুন হতে হয় প্রাক্তন বিধায়ক প্রদীপ তা ও প্রবীণ নেতা কমল গায়েনকে। এছাড়াও এই সময়ে শহরের নানা ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রবীণ নেতা দিলীপ দুবে, অধিক্রম সান্যাল, মদন কর্মকার, শৌভিক চট্টরাজ সহ অনেক যুব-মহিলা-ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। বিশেষত ২ মে, ২০১৩ সকাল বেলায় মিথ্যা সাজানো মামলায় এক শাখা সম্পাদক, সুশান্ত দে-কে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে বিকালে বর্ধমান সদর থানায় আই.সি.-র দেওয়া সময় মতো যখন শান্তিপূর্ণ ডেপুটেশন চলছিল তখন থানার ভেতর থেকেই তৃণমূল দুষ্কৃতীরা আক্রমণ চালায়। পরে আরো দুষ্কৃতীদের জড়ো করে মোবারক বিল্ডিং-এ সিপিআই(এম) জোনাল দপ্তরে হামলা চালায়। আক্রমণে আহত হন প্রাক্তন চেয়ারম্যান আইনুল হক, দিলীপ দুবে, জনার্দন রায়, যুব নেতা অঞ্জন বিশ্বাস সহ অনেক পার্টিকর্মী ও মহিলারা। পরের দিনই স্টেশন থেকে টাউনহল পর্যন্ত নিরুপম সেন, সূর্যকান্ত মিশ্র, মদন ঘোষের উপস্থিতিতে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল হয় এবং টাউনহলে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ধমান শহরের পৌর ভোট যে প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে তার পূর্বাভাষ গত ২৮ মাসে এবং বিশেষত গত তিন মাস পুলিশ সুপার, সদর থানার আই সি-র প্রত্যক্ষ মদতে তৃণমূল কংগ্রেসের বেপরোয়া হিংসাত্মক ঘটনার মধ্যেই ছিল। পৌর নির্বাচনের কয়েকদিন আগে সরকারের অধিকাংশ মন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা প্রকাশ্য রাস্তায় প্ররোচনামূলক বক্তৃতায় ভোটকে প্রহসনে পরিণত করার সুস্পষ্ট আভাষ দিয়েছিলেন—'অফ সাইড বা ফাউল করে হলেও গোল করতে হবে। আমাদের সে রকম রেফারিরা আছে যারা গোলের বাঁশিও বাজিয়ে দেবে।'

নির্বাচন পর্বে—মারাত্মক ফাউল ও হিংসাত্মক দাপাদাপি

প্রথমেই কয়েকটি ওয়ার্ডে বামপন্থীরা যাতে প্রার্থী দিতে না পারে তার জন্য ভীতি প্রদর্শন করা হয়। যখন ৩৫টি ওয়ার্ডেই সাহসের সাথে বামপন্থীরা প্রার্থী দেয় তখন কয়েক জনের প্রার্থীপদ (১২,১৩, ১৫, ১৭, ২৪, ২৭ নং ওয়ার্ড) প্রত্যাহার করাতে বাড়ি বাড়ি আক্রমণ এমনকি বাড়ি ছাড়া করেও তারা ব্যর্থ হয়। একজন প্রার্থীকে স্ক্রুটিনির দিন মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে থেকে অপহরণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রতিরোধে তা ব্যর্থ হয়।

এরপর প্রচার পর্ব চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেস দুষ্কৃতীদের জড়ো করে ক্রমাগত বেপরোয়া তাণ্ডব চালায়। প্রাক্তন চেয়ানম্যান আইনুল হক সহ ৩৫টি ওয়ার্ডের বামপন্থী প্রার্থীদের কয়েকজনকে একেবারেই প্রচার করতে দেওয়া হয় নি, বাকিদের প্রচারে তীব্র বাধা দেওয়া হয়েছে, আক্রমণ করা হয়েছে, বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। আক্রান্ত হন ৪, ৬, ৯, ১০, ১১, ১৬, ১৮, ২১, ২৪, ২৯, ৩০, ৩৫ নং ওয়ার্ডের প্রার্থীসহ কর্মীরা।

১০ সেপ্টেম্বর কালনাগেট বাজারে বামফ্রন্টের বৈধ মিছিল সশস্ত্র তৃণমূলিরা পুলিশের সহায়তায় রক্তাক্ত করেছে। ৭ জনের গুরুতরভাবে মাথা ফেটেছে, ২৫ জন আহত হয়েছে। মহিলারা আক্রান্ত হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদে কার্জনগেট অবরোধ ও পরে মিছিল করে পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে অবস্থান করা হয়। উল্লেখ্য, এই সময় চলে বাম কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর এবং আক্রান্তদেরই একজনকে পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে থেকেই মিথ্যা অস্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশের অনুমতিক্রমে যেখানেই বামফ্রন্টের সভা বা মিছিল সেখানেই তৃণমূল দুষ্কৃতীরা জড়ো হয়ে সভা বা মিছিল ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেছে। কার্যত শহরের ওয়ার্ডগুলিতে কোথাও বাম প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারের জন্য হোর্ডিং, ফেস্টুন, পোস্টার, ফ্ল্যাগ লাগাতে দেওয়া হয় নি, বলপূর্বক বাধা দেওয়া হয়েছে। অথচ শহরের সমস্ত সরকারি দেওয়াল, সম্পত্তি নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে তৃণমূল কংগ্রেস সমস্ত প্রচার কাজ চালিয়েছে। শহর জুড়ে বাইক বাহিনী তাণ্ডব করেছে ভোটের আগের দিনের রাত পর্যন্ত। অথচ কোনো ওয়ার্ডেই পুলিশ টহল দেখা যায় নি। এই সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে জেলা বামফ্রন্টের বা শহর বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনার, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, পুলিশ সুপারকে চিঠি দিয়ে বারবার অবহিত করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেলার সাংসদ, বিধায়করা মাননীয় রাজ্যপালের নিকট (১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩) ডেপুটেশন দেন। একটা ঘটনারও প্রতিকার হয় নি।

বরং শহরবাসীও এ সময়ে দেখলেন, আক্রান্তরাই আসামি হচ্ছে, জেলে যাচ্ছে। আর বর্ধমান সদর থানা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়—মিথ্যা মামলা ও সাজানো মামলায় বাম নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করার কাজে। ৩৩নং ওয়ার্ডে দুজন পৌর কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে অস্ত্র আইনে গভীর রাতে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানকেও নির্লজ্জভাবে মিথ্যা মামলায় আসামি হিসাবে অভিযুক্ত করতেও কুণ্ঠা বোধ করে নি। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারমান প্রাক্তন বিচারপতি অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অনুষ্ঠানের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য : ''পুলিশ এখন অপরাধ

দমনের বদলে অপরাধীদেরই সাহায্য করছে।...'' বামফ্রন্টের প্রচার কর্মসূচি, জনসংযোগের প্রাত্যহিক কাজ পদে পদে শাসকদল ও পুলিশ প্রশাসনের হাতে নানাভাবে আক্রান্ত হয়েছে। এই প্রবল আক্রমণের মধ্যেও ধৈর্য ও সাহস নিয়ে, বামফ্রন্টের সমগ্র পার্টি ও কর্মীবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। স্মরণে রেখেছে সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশনের (৭-৮ সেপ্টেম্বর) গৃহীত সিদ্ধান্ত—দৃঢ়তা বজায় রাখতে হবে কিন্তু প্ররোচনা এড়িয়ে চলতে হবে। আক্রমণের মাত্রা যখন তীব্র হতে থাকে, জেলা বামফ্রন্ট সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বর্ধমান শহরে ভোটারদের নিয়ে সুবিশাল মিছিল সংগঠিত করতে হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর বর্ধমান টাউনহল থেকে রাজবাটী এক বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়েছিল যা সাম্প্রতিক সময়ে রেকর্ড। এই মিছিল সমগ্র শহর জুড়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা তৈরি করে। এতেই শাসক দল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

ভোটের দিন—রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট ভোট লুটের সন্ত্রাস

তৃণমূল কংগ্রেস শহরের হোটেলগুলিতে এবং নির্মীয়মান ফ্ল্যাটগুলিতে জেলার অন্যত্র ও অন্য জেলা থেকে সমাজবিরোধীদের জড়ো করতে শুরু করেছিল। শহরের একটি হোটেলে জেলার এক মন্ত্রী ঘাঁটি গেড়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেছেন। বিহার থেকে আসা দুষ্কৃতীরাও এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। বারবার প্রশাসন, নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছিল। পুলিশ ও নির্বাচন কমিশন কী ভূমিকা নিয়েছিল? অনেক আক্রমণ প্রতিকূলতার মধ্যেও শহরবাসী যাতে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে আসতে পারেন, নির্ভয়ে তাদের অর্জিত অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার জন্য অসংখ্য কর্মী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভোটের দিন ২৯৪টি বুথেই সক্রিয় থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। ভোটের দু-দিন আগে সন্ত্রাস মারাত্মক চেহারা নেয়। বাড়ি বাড়ি তালিকা তৈরি করে হুমকি, মারধর চলতে থাকে। অনেক পরিবারের, বিশেষত, গরিব মানুষের ভোটার পরিচয়পত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কোথাও পার্টির পতাকা লাগাতে দেওয়া হয় নি, বুথ তৈরি দূরের কথা। কিন্তু ভোটের দিন সকালেই সদর থানার সামনে ৩৩নং ওয়ার্ডের বুথগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সশস্ত্র বাহিনীর রক্তচক্ষু ও সন্ত্রাস স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল শহর জুড়ে অবাধে ভোট লুঠ হতে চলেছে। পুলিশ নির্লজ্জ দলদাসের ভূমিকায়—সদর থানা যেন তৃণমূলের একটি কার্যালয়। অনেক ওয়ার্ডের বুথগুলিতে বামপন্থী পোলিং এজেন্ট, প্রার্থীরা প্রবেশ করলেও ভোট শুরুর আধ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টার মধ্যেই জনগণের সামনে তাদের মারধোর করে পোলিং অফিসারের নিষ্ক্রিয়তা ও পুলিশের সক্রিয় সহায়তায় বার করে দেয়।

বামপন্থী কর্মী, দরদি, ভোটারদের কোথাও বাড়িতে কোথাও রাস্তার মোড়ে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের জড়ো করে বাধা দিতে থাকে, মারধোর করে। এতদসত্ত্বেও বামফ্রন্টের মনোভাব ছিল তাদের পোলিং এজেন্ট, কর্মী বা দরদীরা আক্রান্ত হলেও বা ভোটদানে বাধা পেলেও সাধারণ ভোটাররা যদি অবাধে ভোট দিতে সক্ষম হন বামফ্রন্ট ভোট প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকবে। কিন্তু ৩৫টি ওয়ার্ডের বুথগুলিতে যখন কোথাও সকাল ৭টা থেকেই বা ৮.৩০টা বা কোথাও ৯.৩০টার মধ্যে ইভিএম-এর সামনে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা দাঁড়িয়ে ভোটারদের বলপূর্বক তাদের প্রার্থীর সমর্থনে বোতাম টিপতে বাধ্য করলো বা নিজেরাই সে কাজ শুরু করে দিল, তখন ভোট প্রক্রিয়ার চেহারাটাই সম্পূর্ণ পালটে গেল। অনেক তৃণমূল সমর্থকও ভোট দিতে পারে নি। বুথের মধ্যে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কার্যত বুথগুলিকে সশস্ত্র তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী দখল নিয়ে নেয়। পুলিশ জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগে যথাযথ ভূমিকা না নিয়ে দুষ্কৃতীদের কার্যকলাপকেই প্রশ্রয় দেয়। বর্ধমান জেলা ও শহর পুলিশ প্রশাসন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ যোগসাজসেই এই বর্বরোচিত, অগণতান্ত্রিক কাজ গতি পেল। ১৯৭৭ সালের পর এই শহরে অসংখ্য নির্বাচন হয়েছে, জনগণ কখনও এমন নজিরবিহীন ভোট-সন্ত্রাস দেখেন নি। স্বাভাবিকভাবে যখন শহরের সাধারণ ভোটারদের ভোট ব্যাপকভাবে লুট হতে শুরু করলো ও বুথগুলি যখন সশস্ত্র তৃণমূল দুষ্কৃতীদের দখলে গেল তখন বামফ্রন্টের সামনে করণীয় কী? কমিশন অসহায়-নিষ্ক্রিয়, সাধারণ প্রশাসন নির্লিপ্ত, পুলিশ প্রশাসন নির্লজ্জ তৃণমূল সেবায় অবতীর্ণ, অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় যখন শহরবাসীর অবাধ নির্বাচন অংশ নেওয়ার বা স্বাধীন মতো প্রকাশের অধিকার খর্ব করা হল, তখন এই প্রহসনের নির্বাচন থেকে সরে আসা ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকল না। নির্বাচন থেকে বামফ্রন্টের সরে আসার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর শহরের প্রায় সমস্ত বুথ ছিল ফাঁকা, কীভাবে ৮১ শতাংশ ভোট পড়লো? বুথগুলিতে কী চলেছে নিচের কয়েকটি ওয়ার্ড বা বুথের ফলাফলের তথ্যই বুঝতে সাহায্য করবে।

পুলিশ প্রশাসনের মদতে ভোটের কারচুপির প্রমাণ

এই ওয়ার্ডগুলিতে সাধারণ ভোটাররা কোন কোন বুথে শুরু থেকে মাত্র আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা ভোট দিতে পেরেছেন—

ওয়ার্ড নং	২০১১ বিধানসভায় প্রাপ্ত বামফ্রন্টের ভোট শতাংশ	২০১৩ পৌর নির্বাচনে প্রাপ্ত বামফ্রন্টের ভোট শতাংশ	২০১৩ পৌর নির্বাচনে প্রাপ্ত টি এম সি ভোট শতাংশ
১	৩৬.৮৪	১০.৮১	৮৪.২৪
৩	২৮.৫৪	৬.৫৫	৮৩.৩৬
৫	৩৯.০৫	১৪.০৭	৮১.৮৭
১১	৩৯.৬৪	১৯.৭৩	৮০.২৭
১৩	৪৫.০৬	১৮.৮৩	৬৯.৮২
১৮	৪১.২৫	১২.৫৫	৮৪.০৫
২২	৪৪.৩২	২৮.৮৯	৭১.১১
২৩	৪৭.২৭	৬.২৫	৯১.৩৭
২৪	৪৩.০৫	৬.৫৬	৯১.৩৫
২৫	৩৪.৭৬	১৩.২৫	৮০.৮৪
৩৩	৪৪.৩৮	১৩.০৯	৮৪.০৩

কারচুপির আরও কয়েকটি নজির—বামপন্থীদের দুই অঙ্কের নিচে প্রাপ্ত ভোট : ওয়ার্ড ১—বুথ ১/৭ ঃ ৮, ১/১৩ ঃ ৬, ওয়ার্ড ৩—বুথ ৩/১৩ ঃ ৮, ওয়ার্ড ৪—বুথ ৪/৭ ঃ ১১ : ওয়ার্ড ৬/৭ ঃ ৭।

আবার কয়েকটি ওয়ার্ডের পার্টি/বুথভিত্তিক ফল দেখলেই জালিয়াতির ছবি স্পষ্ট হয়। ১৮ নম্বর ওয়ার্ড : ১/১৮—পৌর নির্বাচনে বামপন্থীদের ভোট—৩৫, বিধানসভা নির্বাচনে ২৫১। ১১ নম্বর ওয়ার্ড : ৭/১১—বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভোট ছিল ৪১৬, পৌরভোটে তা দাঁড় করানো হল ৭৭টিতে। ৩৩ নং ওয়ার্ড : ৩/৩৩ বিধানসভাতে বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোট ৩৮৩টি, পৌরসভাতে তা হল ২৪টি। ২৯নং ওয়ার্ড : ৩/২৯—বিধানসভাতে বামফ্রন্টের ভোট ২২২টি, এবারে তা করা হয় ৪০টি। ২৭ নং ওয়ার্ড : ১ ও ২/২৭ : বিধানসভায় ছিল ৪৩৪টি এবার হল ৭২টি।

বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভায় ২০১১ সালে (৩৫টি ওয়ার্ড) বামপন্থীদের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ ছিল ৩৭.৮৯। আর ভোট লুটের ২০১৩ পৌর নির্বাচনে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভায় বামপন্থীদের প্রাপ্ত ভোট দাঁড় করানো হয়েছে ১৬.৭৬ শতাংশে। তৃণমূল ভোট পেয়েছিল ২০১১ সালে ৫৭.৭০ শতাংশ আর এবার তারা নিজেদের ভোট দাঁড়

করিয়েছে ৭৭.১৫-এ। কোনো সুস্থ রাজনীতি সচেতন মানুষ এই ফল বিশ্বাস করবেন? এই ফলাফল কি সত্যিই জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন? নাকি এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট ভোট লুটের ছবি। তাই, ভোটের দিন নির্বাচন থেকে বামফ্রন্টের সরে আসা নিয়ে রাজ্য জুড়ে প্রচার মাধ্যম কর্তৃক হইচই বর্ধমান শহরের মানুষ নিজের অভিজ্ঞতায় ভালোভাবে দেখছেন না। গুসকরায় ৫টি ওয়ার্ডে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা দখল নিলেও বাকি ওয়ার্ডগুলিতে বামপন্থী কর্মীরা সন্ত্রাস প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালায়। এখানে দমবন্ধ করা সন্ত্রাসেও ৫টি ওয়ার্ড শুধু জয়লাভই হয়নি, ভোটের প্রাপ্ত হার ঊর্ধ্বমুখী।

গত ২৮ মাসে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার যে কাজের ধারায় অভ্যস্ত তাতে জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন নিতে তারা প্রস্তুত নয়। তাই সন্ত্রাস, রিগিং, ভোট লুটের রাস্তায় জয় ছাড়া তাদের টিকে থাকা অসম্ভব। এই পেশী প্রদর্শন, দাদাগিরি, সন্ত্রাস, রক্তচক্ষু, ভোটলুট রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ও অসহায়তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ হল গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের রাস্তা, সন্ত্রাসের সড়ক।

সংবাদ মাধ্যমের একটা অংশ তৃণমূলের এই জয়ে উল্লসিত হতে পারেন ও বিকৃতভাবে বলতে পারেন—বামপন্থীরা ওয়াকওভার দিল বা হারার ভয়ে ময়দান ছাড়ল। কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন, সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা হয়েছিল? তাহলে এই শহরে আরও রক্ত ঝরলে কি ঠিক হতো? শহরে দু-তিনটি লাশ পড়লে বা প্রতিরোধে বড় সংঘর্ষ হলে তবেই প্রার্থীপদ প্রত্যাহার যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করা যেত? বর্ধমান শহরে এরকম হিংস্র সরকারি ও তৃণমূলের লুম্পেন বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তাই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে বাধ্য। দায়িত্বশীল বিরোধী সংগঠন হিসাবে সেই মাত্রায় বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিরোধে যাওয়ার যৌক্তিকতা কতটা? এটা তো বাস্তব সত্য, তৃণমূল কংগ্রেস মাত্র ২৮ মাস ক্ষমতাসীন। কিন্তু তারা বিরোধীদলের ভূমিকায় যেমন ছিল, সরকারে থেকেও একই রকম বেপরোয়া, উন্মত্ত, হিংসাত্মক। শহরে পুলিশ-তৃণমূলের সন্ত্রাসের রূপ বহুমাত্রিক। প্রতিরোধ আন্দোলনের চেহারার রূপ কী হবে এরকম হিংসাত্মক, বেপরোয়া সরকারের বিরুদ্ধে? স্বাভাবিক, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-আন্দোলনেও ব্যাপক চেহারা নেবে—মুখ্যমন্ত্রীর ভাষাতেই বলি, রাফ অ্যান্ড টাফই হবে। রাজ্যব্যাপী বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সেই মাত্রায় প্রতিরোধ শুরু হয়নি। যদিও কৃষক আত্মহত্যা থেকে মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য থেকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে নানা ইস্যুতে নানা ফর্মে ধর্মঘট, আইন-অমান্য, বড় সমাবেশ, মিছিল পথ অবরোধ কর্মসূচি শহরেও করা হয়েছে। কোনো বড় ধরনের প্রতিরোধের ঘটনা ঘটলে এই প্রচার মাধ্যমই উলঙ্গভাবে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রচারে নামতো। এই প্রবল আক্রমণ সন্ত্রাসের মধ্যেও বাম কর্মীরা লড়াইয়ের ময়দানেই আছে।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস নয়, সমাবেশ—আরো বড় সমাবেশের মধ্য দিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তৃণমূল সরকার ও দল যে পরিকল্পনামাফিক পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচনে হিংসা, বেপরোয়া তাণ্ডব, সন্ত্রাস ও ভোটলুটের মাস্তানি করল তা কিসের ইঙ্গিত ? এটা জনপ্রিয়তা বা জনগণের প্রতি আস্থার নিদর্শন নয়। হিংসা, গণতন্ত্র হরণ, লুম্পেন বা দুষ্কৃতীদের উপর নির্ভর করে রাজনীতি বা গুণ্ডারাজ জনগণ কখনোই মেনে নেবে না।

বামপন্থীরা যে-কোনো নির্বাচনের ফলাফল, প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে পর্যালোচনা-আত্মসমীক্ষা করে। রাজনৈতিক-সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সবলতা-দুর্বলতার চুলচেরা বিশ্লেষণ স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ভোট সন্ত্রাসের আবহের পটভূমিতে জনমতের বাস্তব চিত্র অনুসন্ধান কার্যত অসম্ভব। আবার সংবাদ মাধ্যমের একটি অংশ পঞ্চায়েত ও পৌরনির্বাচনের ফলাফলকে বৈধতার পোষাক পরিয়ে মমতা ম্যাজিকের স্বাভাবিক জয় দেখাতে মরিয়া। কেউবা আবার শুধুই সাংগঠনিক দুর্বলতার তত্ত্ব সামনে এনে নজিরবিহীন পুলিশি মদতপুষ্ট সন্ত্রাসকে আড়াল করতে বা বাম জামানায় এমনটাই ঘটেছে এরূপ সরলীকরণ করে বর্তমানে অগণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের অধিকার ও মর্যাদাকে ভূলণ্ঠিত করার ঘৃণ্য প্রয়াসকে সমর্থন করছে। এটা বিস্মৃত হওয়ার কথা নয়, বিগত লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান জেলার তিনটি কেন্দ্রেই বামফ্রন্ট জয়লাভ করেছিল আর বিধানসভা নির্বাচনের ঝোড়ো সময়েও ৯টি বিধানসভাতে শুধু জয়লাভ নয়, বামফ্রন্ট ভোট পেয়েছিল ৪৪.৮০ শতাংশ।

প্রবীণ এক মানুষের কথায়—'শীতের রাতে যখন কারোর বাড়িতে আগুন জ্বলে তখন সেই দহনের উত্তাপ কাউকে আরাম দেয়। কিন্তু যার বাড়ি পুড়ে ছাই হয় সেই বোঝে যন্ত্রণার উত্তাপ।' আমরা বিশ্বাস করি, এই নির্বাচনী সংগ্রামই শেষ যুদ্ধ নয়—সামনে আরও বড় সংগ্রাম। সেখানেও যুক্ত হবে জনগণ। বিপন্ন মানুষ—বিপন্ন গণতন্ত্র। তাই, গণতন্ত্র ও শান্তি পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে মানুষের স্বার্থে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শহরে বামপন্থীরা লড়াইরে ময়দানেই থাকবে। মনে রাখতে হবে সন্ত্রাস শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে জনগণ।

With Best Compliments of

Banerjee Enterprise

[Registered Contractor of SAIL-ISP, Burnpur]
Expert in : **Fabrication, Erection, Structural, Civil, Mechanical, Piping & Crane Jobs**
Fax : 0341-2282678, Mob. 9233379749, 9474540470

HEAD OFFICE : Benimadhab Nagar, 58, S.B. Gorai Road, Asansol-713301 (W.B.), E-mail : be.isp@rediffmail.com
SITE OFFICE : Behind RDCIS Building, SAIL-IISCO Steel Plant, Burnpur-713325
WORKSHOP : Vill. Kuilapur (Maji Para), Begunbari, P.O. Suryanagar, Burnpur-713361

Sl. No. 7

লড়াই দীর্ঘস্থায়ী

আভাস রায় চৌধুরী

নজিরবিহীন ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হল রাজ্যের অষ্টম পঞ্চায়েত নির্বাচন। স্বাধীন ভারতের গণপঞ্চায়েতের আঁতুড়ঘর ও পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গে এবারের নির্বাচনী প্রহসনে রুদ্ধ হল জনগণের মতামত, আক্রান্ত হল গণতন্ত্র। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তৃণমূল রাজ্যের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের সমর্থন লাভ করে ক্ষমতায় এসেই গণতন্ত্রের সিঁড়িকে সবার আগে ঠেলে ফেলছে। মানব উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি পূরণে আন্তরিকতা অপেক্ষা গণকণ্ঠ রুদ্ধ করতেই বেশি সক্রিয় বর্তমান সরকার। এ কাজে তার দুই হাতিয়ার—সরকারি প্রশাসনকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার ও দল হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠিত সন্ত্রাস। কখনো কখনো সরকারি পুলিশবাহিনী ও তৃণমূল কংগ্রেসের বেপরোয়া বাহিনীর আক্রমণের মুখে পড়েছে সরকার-বিরোধী সবকটি রাজনৈতিক দল, সাধারণ জনগণ এমনকি প্রকৃতপক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের একাংশ। অনেকে বলছেন রাজ্যে এখন ফ্যাসিস্তদের সরকার। সরকারটা ফ্যাসিস্ত কিনা সেই প্রশ্নের চর্চা বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য নয়। আবার বিশ্বব্যাপী নয়া উদার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের সমাজ অর্থনীতি ও ভৌগোলিক ক্ষেত্রে তা সম্ভব কিনা সে বিতর্কও থেকে যায়। তবে এ প্রশ্নে কোনো সন্দেহ নেই যারা সরকার চালাচ্ছেন তারা চূড়ান্তভাবে স্বৈরতন্ত্রী, বিরুদ্ধমত তো দূরের কথা যে-কোনো প্রতিমতের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে চায়, দমিয়ে রাখতে চায়। ফলে এরা যে ফ্যাসিস্ত মনোভঙ্গির সেটা বোধহয় বলাই যায়।

যাক সে কথা, তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণকণ্ঠকে রুদ্ধ করতে চাওয়া কিংবা প্রতিমতকে দমিয়ে রাখার নির্লজ্জ উদাহরণ কিছুটা উল্লেখ করা যেতেই পারে। এবারে রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতে বামফ্রন্টকে মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেওয়া হয়নি ৫২০৬টি আসনে, তার মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুর আর হুগলিতে সংখ্যায় যথাক্রমে ১০০১ এবং ১৩৫৫; পঞ্চায়েত সমিতিতে ৭৮২টি আসনে, এখানেও পশ্চিম মেদিনীপুর ১৩৫, হুগলি ২২১, বাঁকুড়া ১১৯ এবং বীরভূম ১১৬। হুগলির ৬টি এবং বীরভূমের ২টি জেলা পরিষদ আসনে বামফ্রন্ট মনোনয়নপত্র পেশ করতে পারেনি। এর একমাত্র কারণ ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস। সন্ত্রাসের পরিধি আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায় জোর করে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করানোর সংখ্যার দিকে নজর দিলে—গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৮২৫ জন, তার মধ্যে কেবলমাত্র বর্ধমান জেলায় ৭৩৬ জন; পঞ্চায়েত সমিতি ৩৩২ জন, তার মধ্যে বর্ধমানে ১২০ জন। জেলা পরিষদে ১৯ জন; তার মধ্যে বীরভূমেই ৭ জন, জেলা পরিষদ প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। সব মিলিয়ে বামফ্রন্টের ৮১৮৫ জনকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথমেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়নি। এর সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী তো রয়েছেন। নির্বাচনী প্রহসননাট্যের তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কগুলির নির্দিষ্ট তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়, বলা যেতে পারে এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য, আরো খুঁজলে আরো তথ্য মিলবে। নির্বাচনে রাজ্য প্রশাসন কার্যত নির্বাচন কমিশনকে বেপরোয়াভাবে অস্বীকার করেছে। সাধারণ পুলিশ প্রশাসন প্রত্যক্ষ মদত দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের লুম্পেনবাহিনীকে। পাঁচ পর্বে রাজ্যে ১৬টি জেলায় ৩৮৩৪টি বুথে প্রথম থেকেই এবং ২৩০৯টি বুথে বিভিন্ন সময়ে ভোট লুঠ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিযুক্ত আট হাজার বুথের সাথে ৬১৪৩টি বুথকেও যুক্ত করে নিতে হবে আমাদের এই আলোচনায়। প্রহসননাট্যের চতুর্থ অঙ্কের ছবিটা আরও ভয়ঙ্কর। এত আক্রমণের মধ্যে লড়াই করে গণনায় জয়ী কিংবা এগিয়ে থাকা বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪৮৩, সমিতিতে ৩৬৩ এবং জেলা পরিষদে ৫৮টি আসনে। এ তথ্য কেবলমাত্র ১৩টি জেলা থেকে প্রাপ্ত। এর বাইরে আরো ৪টি জেলায় জনমত লুটের নির্লজ্জ ছবি রয়েছে। মাননীয় পাঠক নিশ্চয় ক্লান্ত বোধ করছেন। ফলে তথ্যের বিরাম দিলাম। কিন্তু এটাতো সবার জানা, চার পর্বের আক্রমণ অতিক্রম করেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও বহু পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করতে দেওয়া হয়নি তৃণমূল-বিরোধীদের। এবারের নির্বাচনী প্রহসননাট্যের অন্তিমপর্বে রাজ্যের শাসকদল প্রমাণ করে দিল যে কোনোরকম প্রতিমত তাদের চোখের বালি। নির্বাচনের সময় গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা যে আসলে তৃণমূল নামক ফ্যাসিস্ত মনোভঙ্গির রাজনৈতিক দলের মুখোশ ছিল তা আজ অনেক সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন। ঠিক যেমন অনেক পরের বিশ্ব জনতা বুঝতে পেরেছিলেন হিটলারের জাতীয় সমাজতন্ত্রের ঘোষণা ছিল আসলে সমাজতন্ত্র ও মানবতার প্রতি চরম প্রতারণা। ২০০৬ থেকে পথভ্রষ্ট বামপন্থীদের সাথে সন্ত্রাসের আগুন জ্বেলে রাজ্যে নৈরাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে এবং আজ রাজ্যের শাসনক্ষমতায় থেকে রাজনৈতিক লুম্পেনিকরণের মাধ্যমে সন্ত্রাসকে অব্যাহত রাখতে দায়বদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেস। এই সন্ত্রাস অব্যাহত থাকবে যদি সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা না যায়।

অনেকে বলছেন, আজকের এই সন্ত্রাসের আবহাওয়া ১৯৭০-এর দশককেও ছাড়িয়ে গেছে। ব্যাপ্তি ও গভীরতাতে এটাই সঠিক। এই সন্ত্রাসের প্রধান লক্ষ্য বামপন্থীরা। বামপন্থীদের সীমানা অতিক্রম করে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়বে সাধারণ মানুষের ওপর এবং তা পড়েছেও। বামপন্থীরা শুধুমাত্র সাম্প্রতিক এই কটা বছর আক্রান্ত হচ্ছেন না, গত

শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে শুরু হওয়া এই আক্রমণ দীর্ঘ তিন দশকের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের সময়েও থেমে থাকেনি। সরকার পরিচালনার সময়েও এ রাজ্যে শ্রেণিশত্রুর হাতে শহিদ হয়েছেন প্রায় সাড়ে তিন হাজার বামপন্থী সংগঠক কর্মী সমর্থক। সত্তরের দশকে গণতন্ত্রের সংগ্রামে, বিগত ৩৪ বছরে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে, কিংবা আজ আবার গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, দিচ্ছেন বামপন্থীরা। কেউ কেউ অবশ্য আনাচে কানাচে গণতন্ত্রের সংগ্রাম থেকে রাজনৈতিক দল ও উপাদানকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। যা আদতে গণতন্ত্রকে দুর্বল করতে বাধ্য। গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক প্রত্যয়, সমাজ বিকাশের ধারায় পুঁজিবাদের সৃষ্টি, বিকাশ ও সংকটের সঙ্গে সম্পর্কিত। পৃথিবীর দেশে দেশে পুঁজিবাদের সংকট যত বেড়েছে, সংকটের বোঝা তত চাপানো হয়েছে জনগণের কাঁধে, আর জনগণের লড়াইয়ের প্রকৃত মুখ ও শক্তি বামপন্থীরা হয়েছে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। পুঁজিসঞ্চয়ন প্রক্রিয়া কিংবা পুঁজির সংকটের চরিত্রের বিভিন্নতার কারণে বামপন্থীদের ওপর আক্রমণের মাত্রার তারতম্য ঘটে। যেমন এখন সারা বিশ্বে লগ্নিপুঁজি উৎপাদন ক্ষেত্র অপেক্ষা ফাটকামুখী, পুঁজি সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া লুঠ ও জোরজবরদস্তি মূলক। স্বাভাবিকভাবে গণতন্ত্রের ন্যূনতম কণ্ঠস্বর আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও দেশে দেশে শাসকশ্রেণির না-পসন্দ। আমাদের এ বাংলা, আমাদের চারপাশের দিন-প্রতিদিনের চেনা পরিবেশ ও মানুষজন এই বৈশিষ্ট্যের বাইরে নয়, বরং অনেক বেশি অঙ্গীভূত। সত্তরের দশকে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশ তখনও জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্রতত্ত্বে পরিচালিত হতো। ওই প্রেক্ষাপটে শাসকশ্রেণির স্বৈরাচার অভিমুখীনতার থেকে আজকে বিশ্বব্যাপী ফাটকা পুঁজির বিষময় আবহে আঞ্চলিক ফাটকা পুঁজির মদতদাতা সরকারের স্বৈরাচার অনেক বেশি তীব্র, গভীর ও সুদূরপ্রসারী।

আমরা একটু নজর করলে দেখতে পাবো, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের ভূমিস্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত কোন্ মুখগুলো রাজনীতির কেন্দ্রে চলে আসছে। যারা আজ শাসক দলের রাজনীতির কুশীলব তাদের অনেকেরই কোনো রাজনৈতিক উজ্জ্বল অতীত নেই, বরং চিন্তাচেতনা কিংবা কর্মপদ্ধতিতে লুম্পেন্সিকে প্রকট করে দেয়, তা সে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা সংস্কৃতি—সব ক্ষেত্রেই। এটা এমন ভাবনা থেকে বলা হল না যে, আমাদের মধ্যবিত্ত ভদ্র রাজনীতি ভীষণভাবে ধাক্কা খাচ্ছে বলে। কিংবা রাজনীতিতে এলিটবাদের নস্টালজিয়ায় বুঁদ হয়ে নেই নিবন্ধকার। নিবন্ধকার স্পষ্ট ও ঋজুতার সাথে শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে শ্রেণি-রাজনীতির প্রত্যয়টি নির্দেশ করতে চায়, এবং শ্রমিকশ্রেণির মতবাদ ও তার অনুশীলনের প্রতি সমর্থন ও ভূমিকা ব্যক্ত করতে চায়। আজকের নয়া উদারনীতির দিনে ফাটকামুখী লগ্নিপুঁজি প্রথমত চায় শ্রমিকশ্রেণির অস্তিত্বকে অবলুপ্ত করতে, তা পুরোপুরি সম্ভব নয় পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে। ফলে তার বিকল্প চাওয়া শ্রমিকশ্রেণিকে শ্রেণি হিসাবে সংগঠিত হতে না দেওয়া, তার জীবনকে অনিশ্চিত করা, অস্তিত্বকে বিপন্ন করা। ফলে একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান দুটি প্রবণতা হল স্থায়ী কাজ কমিয়ে ঠিকা কাজ বাড়িয়ে তোলা আর চিন্তাভাবনার স্তর ও দিনপ্রতিদিনের জীবনে লুম্পেন্সির চাপ বাড়িয়ে তোলা। আমাদের রাজ্য বিশ্বব্যাপী এই প্রবণতা ও বিপদের বলয়ের মধ্যেই রয়েছে। বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ফাটকা পুঁজির স্বার্থে দরকার অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের প্রসার, প্রয়োজনে যুদ্ধ, প্রয়োজনে পুতুল সরকার। আর একই আন্তর্জাতিক স্বার্থের বলয়ের মধ্যে থাকা ছোটো ছোটো আঞ্চলিক ফাটকা পুঁজির স্বার্থের প্রয়োজনে যুক্তিবাদ, গণতন্ত্র, প্রতিমত বা বিরোধী মতকে অবদমিত করতে দরকার সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা ও প্রসারতাকে বৃদ্ধি করা। এই কাজ করতেই মতবাদিকভাবে দায়বদ্ধ এ রাজ্যে দেশীয় শাসকশ্রেণির প্রধান রাজনৈতিক শক্তি তৃণমূল কংগ্রেস ও তার পৃষ্ঠপোষকেরা। ফলে এ সন্ত্রাস দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। সন্ত্রাসের চরিত্র ও মাত্রার পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু জনগণকে সন্ত্রস্ত করতে ভীতির পরিবেশ দীর্ঘস্থায়ী হবে। এ রাজ্যে শাসকশ্রেণির অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির শক্তি, জাতীয় রাজনীতির বাধ্যতা কিংবা সব মিলিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যতটুকু নৈতিক আবরণ থাকে তার কারণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবস্থানের পরিবর্তন ঘটছে, ঘটবে। কিন্তু আমাদের এদের অতীত কর্মকাণ্ড মনে রাখা দরকার, স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার যে বামপন্থী বিশেষত কমিউনিস্টদের বিপন্ন করা এদের সকলেরই সাধারণ শ্রেণিস্বার্থ।

বামপন্থী, বিশেষত কমিউনিস্টদের মূল লক্ষ্যের সাথে বর্তমান কাজের সম্পর্কটা কোথায়? বহুচর্চিত প্রসঙ্গটির পুনঃচর্চা প্রয়োজন। এখানে এ-পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যতম আধুনিক রচনা 'ইস্তাহার'কে ফিরে দেখা যথাযথ হবে বলেই ধারণা।

> কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য অন্যান্য সব সর্বহারা পার্টির মতোই। সর্বহারাদের একটা শ্রেণিতে গঠন করা, বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ করা, সর্বহারা কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা জয়।—
> আশু লক্ষ্য অর্জনের জন্য, শ্রমিকশ্রেণির ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ আদায়ের জন্য কমিউনিস্টরা সংগ্রাম করে থাকে। কিন্তু বর্তমানের আন্দোলনের মধ্যে তারা সেই আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই ভবিষ্যৎ আন্দোলনেরও যত্ন নেয়।

এই আলোতেই নির্বাচনী সংগ্রাম, সরকার পরিচালনা, নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে ভূমিকা পালন করেন বামপন্থীরা, কমিউনিস্টরা। এদেশে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বামপন্থীদের ধারাবাহিক উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। খোলা চোখে কেউ কেউ দেখতে না পেলেও যাদের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের লড়াই তারা কিন্তু ঠিক চিনেছে তাদের প্রকৃত শত্রুকে। সে কারণেই নির্বাচনের আগে বা পরে বামপন্থীদের প্রতি এত কুৎসা, এত আক্রমণ। আদর্শগত ও বস্তুগত সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতিতে সরকার চালিয়ে এ রাজ্যে বামপন্থীরা তার মূল কাজের থেকে পুরোপুরি বিচ্যুতই যদি হয়ে যাবে, তবে সরকার চলে যাবার পরেও সেই সরকার কিংবা সরকারের মূল শক্তি সম্পর্কে এত আক্রমণ কেন হবে? আসলে ওরা জানে ত্রুটি বিচ্যুতি বিতর্ক এ-সব কিছুকে পাশ কাটিয়ে রাজ্যের শ্রমজীবী জনগণের স্বপক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য ঐতিহাসিক এবং বামপন্থীরাও তাদের এই সময়ের মূল লক্ষ্য থেকে সরে যায়নি। আর যায়নি বলেই নির্বাচনী বিপর্যয়ের পরেও লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী জনগণ নিজ শ্রেণিস্বার্থের কারণেই বামপন্থীদের সঙ্গে আছেন, জান কবুল করে লড়াই করছেন। এ কারণেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনগণের মতামতকে লুঠ করা কিংবা সন্ত্রাস অব্যাহত রাখা শ্রীমতী ও তাঁর বাহিনীর বাধ্যতা।

আমাদের সংস্কৃতি এখন ফাটকা পুঁজির দাপটের সামনে পড়েছে। এ বাংলায় প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ও স্বাধীনতা-উত্তর কয়েক দশকে মধ্যবিত্ত বাঙালির সাংস্কৃতিক আঙিনা ছিল বামপন্থী চিন্তার আঁতুড়ঘর। পুঁজির দাপটে সেই সংস্কৃতি যেমন বিপন্ন তেমনই মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন-জীবিকার বৈশিষ্ট্যের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। গড়ে উঠছে নতুন নৈতিকতা, যার পলেস্তারায় মার্কিনি রঙের ছোঁয়া স্পষ্ট। পাশাপাশি সমাজ অর্থনীতি রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান লুম্পেন্সি।

ফলে লুঠ, দান, অনুগ্রহলাভ কিংবা সুবিধাবাদের ভ্রান্ত চেতনা ক্রমবর্ধমান। সে কারণেই দেখা যায় নির্বাচনে জনমত নির্মাণে এ বাংলায় অর্থ কিংবা উৎকোচ এবং আরো অনেক প্রাপ্তি ও তাৎক্ষণিক সুখ এখন বিপজ্জনকভাবে সামনে এগিয়ে আসছে। বৈশিষ্ট্যটি সম্মিলিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় শক্তিশালী বাধা তৈরি করে সন্ত্রাসের বাতাবরণকেই মদত করে ফেলতে পারে।

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকেই তুলে ধরতে চেয়েছে বামপন্থীরা। এখন প্রশ্ন হল আমরা কি সবাই এটা বুঝতে পারছি, আমাদের অনুসারী জনগণকে বোঝাতে পারছি, বৃহত্তর জনগণের কাছে আবেদন নির্মাণ করতে পারছি? আমাদের সকলের ভেবে দেখা দরকার।

সম্প্রতি জাতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তি আবার শক্তিশালী হতে চাইছে। দেশীয় কর্পোরেটদের প্রায় নিঃশর্ত সমর্থন হাজির হতে পারে এই সাম্প্রদায়িক শক্তির পাশে। তা যদি সত্য হয় তবে ফাটকা পুঁজির আক্রমণ ও আক্রান্ত জনগণের মধ্যে আরো বিপজ্জনক প্রবণতা ও মাত্রার জন্ম নিতে পারে।

সামনে এখন বিপদ। ধারাবাহিক দীর্ঘস্থায়ী লড়াই ছাড়া বামপন্থীদের সামনে কোনো বিকল্প নেই। এই লড়াইয়ের সম্ভাব্য দীর্ঘ যাত্রাপথে নিজের শ্রেণি ও অনুসারী জনগণকে সংগঠিত সংহত সচেতন করে নতুন নতুন বন্ধু খোঁজা জরুরি।

সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

আসানসোল থেকে প্রকাশিত একমাত্র ত্রৈমাসিক মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

সাকো

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন। বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা : ১০০ টাকা (সডাক)।
আপনার লেখা গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠান
যোগাযোগ : সম্পাদক, 'সাকো'
এস.পি. মুখার্জি রোড, মুর্গাসোল, আসানসোল-৩, বর্ধমান
মোবাইল : ৯৪৩৪১৭৭৯৯৪, ৯৪৩৪৬৬৪৩০০, ৯৪৩৪১৫৬৯০০, ৯৯০৩৭৪৯৪২৫

With best compliments of

M/s. DEEP ASSOCIATES

CONTRACTORS, ENGINEERS & SUPPLIERS

REGD. OFFICE :
Shankar Plaza, 2nd floor, S.P. Mukherjee Road, Murgasol More, Ushagram, Asansol-713303
Phone : (0341-2275107, M : 9434182054

LOCAL OFFICE
Manik Chand Thakur Sarani, Hirapur, Burnpur-713325, Burdwan, Ph : (0341) 2232254

Sl. No. 8

Happy Puja Greetings
from

A Well Wisher

BURDWAN-1 BLOCK

Sl. No. 81

দায়বদ্ধতা

সুশান্ত ব্যানার্জি

কমরেড পানুদা—পান্নালাল মুখার্জি। বয়স ৭৫। হাওড়া স্টেশনে মেইন 'কারসেড'-এর অবসরপ্রাপ্ত ফোরম্যান। দেশের বাড়ি হাওড়া জেলার ডোমজুড় বাজারে। অবসর না নেওয়া পর্যন্ত ডোমজুড় থেকেই কর্মস্থলে প্রতিদিন (রবিবার ছাড়া) যাতায়াত করতেন। জোমজুড়ের বাড়িতে থাকতেন এক বিধবা দিদি। পানুদা সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। এছাড়া আই.টি.আই-তে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

পানুদার স্ত্রী মাধবীদি ছিলেন এম.এ. বি.টি. দুর্গাপুর ইস্পাতের একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। দুই ছেলে—অপূর্বকান্তি ও সৌম্যকান্তিকে নিয়ে ইস্পাতের একটি বাংলোতে থাকতেন। দুই ছেলে মায়ের কাছে থেকেই পড়াশোনা করতো। পানুদা প্রতি শনিবার ব্ল্যাকডায়মন্ড এক্সপ্রেস ধরে দুর্গাপুরে আসতেন। সোমবার আবার সাতসকালে কর্মস্থলে ফিরে যেতেন। পরে বড় ছেলে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে চাকরি পাওয়ার কিছুদিন পর বিয়ে হয় আসানসোলে। বৌমার নাম মেঘমালা। অপূর্ব সুন্দরী। অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ। 'মালা' নামেই পানুদা, বৌদি তাকে ডাকতো। মালা নানা স্কুলে চাকরির সুযোগ পেয়েও করেনি। বাড়ির মত ছিল। কিন্তু মালা চায় নিষ্ঠার সাথে সংসারটা করতে। যেমন রূপ তেমনই গুণ। ভদ্র-নম্র, প্রত্যেককে নিয়ে অসাধারণ চলার ক্ষমতা। পরে যমজ সন্তান হয়। বিট্টু ও ছোট্টু। দুটিই অত্যাধুনিক মানের যন্ত্র। সৌম্য হল বাবা-মায়ের কার্বনকপি। সৌম্য একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বাড়ির পরিচারিকা-কাম-রান্নার কাজে 'অঞ্জনা' মালাকে সমস্ত রকম সাহায্য করতো। অঞ্জনার বয়স ৩২ বছর। স্বামীপরিত্যক্তা। উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ছিল মাধবীদির ছাত্রী। বিয়ে করার ২ বছর পর স্বামী অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে চলে যায়। অঞ্জু মাধবীদির খুব প্রিয় ছিল। অসহায় অবস্থায় যখন ছন্নছাড়া হয়ে এর তার কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন অঞ্জুর নিরাপত্তা, রুটি-রুজির ব্যাপার এবং ওর অন্ধকারময় ভবিষ্যতের আশঙ্কায় মাধবীদি বাড়িতে সকলের সাথে আলোচনা করে তাকে নিজের বাড়িতে এনে রাখেন। কাজের হিসেবে নয়—ঘরের মেয়ে হিসেবে। পরে অঞ্জুই জোর করে নিজের ইচ্ছেয় ধীরে ধীরে মালাবৌদির প্রধান সহায়িকা-সখী এবং ছায়াসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। বিট্টু-ছট্টুর পড়াশোনা করানোর মূল দায়িত্বটাও একটা সময় পর্যন্ত অঞ্জুই পালন করেছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা মাথার। কোনো অর্থ অঞ্জুকে বেতন হিসেবে কেউ কোনোদিন নেওয়াতে পারেনি। অঞ্জুর সম্মানের কথা ভেবে টাকাকড়ি বেতন ইত্যাদি রুচির বাইরে হবে ভেবে আর্থিক কথাবার্তার মধ্যে আর কেউ যায়নি। সে তো ঘরেরই মেয়ে। কিন্তু ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ওর নামে জোর করে একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে জমা দিতেন মাধবীদি। এছাড়া এল.আই.সি. এবং পরিবারের অন্য সকলের মতো স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা ছিল। থাকা-খাওয়া-পরা-ওষুধ-ব্যবহার্য যাবতীয় জিনিসপত্র সবই তার 'বন্ধু-দিদি' মালাই দেখভাল করতো। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা দায়। বরং সব্বাই জানতো অঞ্জু ওদের আত্মীয়।

এছাড়া বাড়ির ঝাঁটপাট-কাচাকাচি-ধোয়ামাজার জন্য আছে এক মধ্যবয়সী শ্রীমতী বেহুলা বাউরি। ভালো করিৎকর্মা মেয়ে, তবে মুখার্জি পরিবারে বেহুলা রানির থাকাকালীন কেউ গেলে বুঝতেই পারবে না ঐ বাড়ির আসল কর্ত্রী কে। দু-হাতে কাজও চলছে, তার সাথে হরেক রকম গানও চলছে। তার সঙ্গে মাতব্বরি তো আছেই। পুরুষরা কেউ যদি বাড়িতে না থাকে বেহুলার তো পোয়াবারো। গান, অর্কেস্ট্রা (বাসনকোসনের কিছু একটা-দুটো নিয়ে) তার সাথে বলিউড, হলিউড জিৎ-দেব থেকে শুরু করে ভাদু, টুসু, বাউলগান আর তার সঙ্গে নৃত্যকলা। পুরো পরিবারের 'কন্ট্রোলিং অথরিটি' তখন বেহুলা। সংসারে কেউ বাধা দেয় না। একেবারে দাপিয়ে বেড়াবে। এসব দেখেশুনে মালা একবার শাশুড়িকে বলেছিল—''বেহুলা কী সব যা-তা কাণ্ড করে চলেছে বলো তো মা? তুমি কি ওকে কোনোদিন কিছু বলবে না?'' মাধুরী বলতেন, ''কেন রে? খারাপটা কী করছে শুনি! বেশ তো মাতিয়ে রাখে। নিজেও অবাধে মনের ডানা মেলে দিয়ে এসব করে আনন্দ পায়। সারা জীবনটাই তো দুঃখে কষ্টে অস্থির। দুবেলা এখানে যদি একটু আধটু আনন্দ করে শিশুর মতো, খারাপ তো কিছু করে না, করলে তখন তুইই সাবধান করে দিস।'' তবে ওর রিয়ালিটি শো প্রদর্শনের জন্য বাহবা হাততালি ইত্যাদি দিয়ে সমানে প্রশংসা না করে গেলে—দু-চারটে অনুরোধ না গেলে ওর মূর্তি-মেজাজ তখন আলাদা। আগামী পুজোর জন্য যথারীতি দুই মাসের বেতনের সমতুল্য 'বোনাস' ছাড়া বিরাট ফর্দের মধ্যে প্রধানটা হল—'বোমকাই শাড়ি'। যেন বেশ দামি হয়—দেড় হাজারের কমে যেন না হয়। ও বৌদির সাথে কাপড়ের দোকানে গিয়ে যে 'বোমকাই'টা চয়েস করবে সেটাই দিতে হবে। মহালয়ার আগেই এসব কেনা-কাটার হ্যাপা সেরে নেওয়া চাই। পুজোর আগে প্রত্যেক কাজের বাড়িতে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র দেখাতে হবে তো! মালা বলে—বেহুলাদি তুমি আমাদের এই সর্বনাশটা করো না দয়া করে। মহালয়ার আগেই তুমি পাবে সব। সঙ্গে সঙ্গে বেহুলারানির গলা থেকে নেচে নেচে বেরিয়ে এল—'হৃদমাঝারে রাখবো, তোমায় ছেড়ে দেবো না।'

পানুদা এখন অবসরপ্রাপ্ত। আটান্ন বছরে অবসর নিয়েছেন। তার আড়াই বছর আগে ডোমজুড়ের দিদি মারা যান। অবসর নেওয়ার সাথে সাথে পানুদা দুর্গাপুরে নিজের পরিবারে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। দেশের বাড়িটা এবং কিছু জমিজমা আছে। বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ সেরিব্রাল অ্যাটাকে অবসরপ্রাপ্তা মাধুরীদি (বৌদি) নিজের জীবন থেকেও অবসর নিলেন। বাড়ির ছন্দটাই গেল পাল্টে। মুখার্জি পরিবারের সেই ঐতিহ্য সদা আনন্দ-জমজমাট একটা ব্যতিক্রমী

পরিবেশের উপর যেন গভীর অন্ধকার নেমে এল। পানুদার মতো মহীরূহও প্রায়শই বলতেন—"কী জানো ভাই! এই বয়সে স্ত্রী বিয়োগের যে কী দুর্বিষহ যন্ত্রণা কাউকে বোঝাবার নয়।" তবু শোকের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাল ধরতে হল পানুদাকেই।

সমগ্র পরিবারের মধ্যে পানুদাকে দেখা গেল যেন প্রপিতামহ ভীষ্ম। আসাধারণ মনের জোর। দেখলে মনে হয় বহু কঠিন যুদ্ধের পোড়খাওয়া পাকা সৈনিক। প্রকৃত অর্থে পানুদা একজন অতি ভদ্রজন। অতি শান্ত-সহজ-সরল-অনাবিল। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন স্বাধীনতাকামী মানুষ। এত বয়সেও শক্ত-সুঠাম নীরোগ শরীর। সোজা শিরদাঁড়া। চির উন্নত শির। গুরুগম্ভীর গলা। কিন্তু যেমন মধুরভাষী তেমনি বিনয়ী। সেই যে 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্'—তারই উজ্জ্বল প্রতীক পানুদা। কালো চুলের পানুদাকে দেখলে কেউই আন্দাজ করতে পারে না সঠিক কত বয়স পানুদার। এবং শুধু পানুদা নন, বৌদি, দুই ছেলে এবং বৌমা 'মালা' যেন একই ছাঁচে গড়া। বৌদিও ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। দুই ছেলে, দুই নাতির সৌন্দর্য যেন পানুদা-বৌদির কাছ থেকেই পাওয়া। বৌমা তো আছেই। বৌমা হল পানুদা-বৌদির নয়নের মণি। 'মালা' সত্যিই ওঁদের গলার মালা। অত বড় পরিবারটাকে হাসি মুখে মাথায় করে রেখেছে। কারুর পান থেকে চুন খসতে দেবে না। দেবর সৌম্য প্রায়ই বলে—"বৌদির সঙ্গে দেবর হিসেবে একটু-আধটু ঝগড়া-খুনসুটি করবো তারও উপায় নেই। দেবী যেন, চির প্রসন্না মাতৃমূর্তি। আমার দুঃখ তো কেউ বুঝবে না! আরে দেবর মানে তো দ্বি-বর। সেটাও মনে রাখে না! শুধু ছোটদা-ছোটদা করেই অস্থির। যত্ত সব।"

পানুদা খুব নস্যি নেন—এন.সি. নস্যি। আর কোনো নেশা নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বার দুয়েক দুধ আর চিনি ছাড়া লিকার চা। আমি পানুদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি নস্যির মতো এই বদ নেশাটা ধরলেন কী করে? বলেছিলেন, আগে দিনে ৩-৪ প্যাকেট করে চারমিনার খেতাম। '৭৩ সালে 'মিসা'য় অ্যারেস্ট করে যখন জেলে ঢোকালো তখন জেলভর্তি কয়েদিরা প্রায় সবাই তো আমার মতো ধূমপানের খদ্দের। বাইরে থেকে কমরেড এবং পরিজনেরা সবার জন্য যে-সব বিড়ি-সিগারেট দিতে যেতো—শুকনো খাবার-দাবার সমেত সব কিছু জেলে আমাদের 'স্টোর ইন-চার্জ'-এর কাছে জমা দিতে হতো। তিনি এবার কয়েদিদের মধ্যে একবারে নিখুঁতভাবে সমান-সমান ভাগ করে দিতেন। তার মধ্যে দু-চারটে ভাগে যা পেতাম সে তো নিমেষেই খতম। কী কষ্ট যে হতো বলার নয়। সবাই খুব ছটফট করতো। আমার এই অসহায় ভাব দেখে সহযোগী কমরেড নিখিলদা আমাকে সিগারেট বিড়ি ছেড়ে 'নস্যি' ধরার পরামর্শ দিলেন। নেশার চোটে ছটফট করার ঠেলায় ভালো করে ভেবে দেখলাম—প্রস্তাবটা মন্দ নয়। প্রথমত, জেলের মধ্যে নস্যি নেওয়ার লোক মাত্র একজনই—নিখিলবাবু। কেউই ভাগীদার নেই। দ্বিতীয়ত, এন.সি. নস্যির একবার একটা বড় কৌটো দিয়ে গেলে অনেক দিন চলবে। নস্যি নেওয়ার অনভ্যাসের দরুন প্রথম প্রথম বেজায় হাঁচি হতো। আর আমার হাঁচি তো! রীতিমতো গর্জন। নেতৃস্থানীয় কমরেডরা বলতেন—অ্যাই! এবার ষাঁড়ের ডাক শুরু হলো। নিখিলদা বলতেন, একদম ঘাবড়াবেন না, দু-চারদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই থেকে নস্যি চলছে। বাড়ির সকলের বকুনি, বিদ্রুপ-খোঁটা খেয়েও ভাই এটা আর ছাড়া গেল না। নাতি দুটোকেও আমার পিছনে কম লাগানো হয়েছে! নস্যির ডিবেটা যখন তখন লুকিয়ে রেখে কত দিক থেকে যে আমাকে জব্দ করে কী আর বলবো?

একবার কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আচ্ছা! সৌম্যর বিয়ের বয়স তো পেরিয়ে যাচ্ছে। তা কী ব্যাপার, বিয়ে করছে না কেন?

—এ নিয়ে আমার পরিবার এক কঠিন সমস্যার মধ্যে আছে ভাই। প্রকৃত কারণ আমাদের কী মনে হচ্ছে জানো? আসলে ওর মা মারা যাওয়ার পর মনের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে—এর ফলে বাবার কষ্ট হবে এবং পরিবারের নিজস্ব ঘরানার মধ্যে মা-বাবা যেভাবে এক তালে এক অপূর্ব সুর বেঁধে দিয়ে গেছেন কোনো না কোনোভাবে তা ব্যাহত হবে। ব্যাপার দেখো—এখন সৌম্য মায়ের মৃত্যুর পর থেকে প্রতি রাতে আমার পাশেই শোয়। এত সজাগ ঘুম। আমার তো বয়স হয়েছে। রাত্রে দু-তিন বার বাথরুম যেতে হয়। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি বিছানা থেকে নামা-ওঠার সময় সৌম্য যেন কোনোরকম টের না পায়। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ও ঠিক জেগে যাবে এবং হাজার নিষেধ সত্ত্বেও আমার গায়ে গা লাগিয়ে বাথরুম পর্যন্ত যাবে, আবার একইভাবে বিছানায় আমার সাথে ফিরে আসবে। কোনো একটা দিনের জন্য ওর কোনোরকম ব্যতিক্রম ঘটেনি। তোমার বৌদিকে কি এমনি এমনি রত্নগর্ভা বলতাম! কিন্তু ওর তো ভবিষ্যৎ জীবন আছে। রূপ আছে। গুণ আছে। ভালো চাকরি করে। প্রেমট্রেম যে করে রেখেছে সেটাও নয়। সে ছেলে সংসারী হয়েছে যদি দেখে যেতে না পারি মনে কী পরিমাণ অশান্তি ভোগ করতে হয় বলতো? অপু-বৌমা আমাকে বারবার বলেছে 'ছোটো'র জন্য তুমি একদম ভেবো না। আমাদের সব ভাবা হয়ে আছে। আমরা ওর বিয়েও দেবো। সারা জীবন একই সাথে সবাই যেমন আছি তেমনই থাকবো। কী ভেবে রেখেছে সব ওরাই জানে। এখনই বেঁচে থাকতে থাকতে বিয়েটা দিয়ে দিলে তো ল্যাঠা চুকে যেত। কী বল?

বড় অদ্ভুত একটি নিখুঁত প্রগতিশীল সুশৃঙ্খল পরিপাটি ব্যতিক্রমী পরিবার। কী অপূর্ব খোলামেলা মন কেড়ে নেওয়া পরিবেশ। একবার ঢুকলে আর বেরোতে ইচ্ছে করে না। পাড়ার প্রত্যেকের কাছে এই পরিবারটি অতি আপন—যেন নিজেদেরই বাড়ি। বিরাট ঐতিহ্য এবং সম্মানের অধিকারী এই পরিবারটি। সবার জন্য দুয়ার উন্মুক্ত। দক্ষিণ দিকে ঘরে প্রবেশের দরজা। অনেকেই বলে—চির 'দখিন দুয়ার খোলা'। দিন-রাত বাড়ি সরগরম। প্রতিবেশীরা প্রত্যেকেই মুখার্জি পরিবারের গুণমুগ্ধ।

পানুদার একদল শিশু-কিশোর সংসারী আছে। যার পরিচয় না দিলে একটা বড় দিক ফাঁক থেকে যায়। পানুদার বাড়ির ভিতর বড় বারান্দার প্রায় অধিকাংশটাই অধিকার করে আছে তারা—মানে অনেকগুলি কচি-কাঁচাদের মধ্যে এক-একটি (৫-৭ জন) দলের আলাদা আলাদা সংসার পাতা। সব মিলিয়ে দশ-বারোটি সারি সারি পরিবার পানুদার বাড়িতে। পানুদা এদের নাম দিয়েছে 'শালিক পাখি'দের বাসা। ওঃ সারা দিন-রাত্রি নব্য সংসারীদের কিচিরমিচির শব্দে সারা বাড়ি উত্তাল। কেউ ঝগড়া করে সংসার ত্যাগ করে পালাচ্ছে, কেউ দু-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছে, কেউ কেউ পরিবারের মধ্যে ঝগড়াঝাটি দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচছে, কখনও বা বলিউড মার্কা ঢঙে, কখনও আবার 'খোকাবাবু যায়'—এইসব বিচিত্র চিড়িয়াখানার বিচিত্র কাণ্ডকারখানা। সব কিছু সামলানো দেখভাল করার জন্য আছে পানুদা, মালা আর অঞ্জুদি। গৃহত্যাগী পলাতক স্বামীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আদর-টাদর করে তিন জনের কেউ না কেউ তার স্ত্রীর কাছে ফেরৎ এনে দেয়। স্ত্রী ততক্ষণে কেঁদে কেঁদে আস্ত শাড়িটাই ভিজিয়ে ফেলে।

শালিক পাখিদের বাসায় প্রতি মাসের শেষ রবিবারে অভিভাবকদের চাঁদার টাকায় জব্বর ভোজ দুপুরবেলায়। সবগুলি শালিক পরিবারের পরিজনদের একত্র করে ভোজের আসর বসে। আর বারো মাসে তেরো পার্বণ তো আছেই। ছেলেমেয়েদের বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন সবই তো গেরস্থের মঙ্গলের জন্য করতে হবে।

প্রধান পুরোহিত পাড়ার অন্নদা চাটুজ্যে। তাঁর আবার সাকরেদ আছে ডজন খানেক। একা সামলাবে কী করে? সে সব এলাহি ব্যাপার। এছাড়াও পানুদার পরিবারের পক্ষ থেকে বছরে দুবার পাড়া ভোজ। বাংলা নববর্ষের দিন এবং স্বাধীনতা দিবসের দিন। ওই দুদিন প্রতি বাড়িতে অরন্ধন। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত দুটি বাড়ির পাশের বড় খোলা মাঠটায় করা হয় প্যান্ডেল—রান্না, ভাঁড়ার ঘর এবং খাবার জন্য লম্বালম্বি চেয়ার টেবিল পাতা। সকলের বসে আড্ডা দেওয়ার জায়গা। দুটি ব্যাচেই যাতে খাবার-দাবারের কাজ শেষ হয়ে যায় সেরকম ব্যবস্থা। আর অন্যদিকে মঞ্চ বেঁধে হবে 'বিচিত্রানুষ্ঠান'-এর মঞ্চ। সমগ্র বিষয়ের বুদ্ধির ভাণ্ডার 'শ্রীযুক্ত পানুবাবু অ্যান্ড কোম্পানি'। এ যেন একটা আলাদা রাজ্য—'আমরা সবাই রাজ্য আমাদেরই রাজার রাজত্বে'। কেউ এল আর পেট পুরে খেয়ে চলে গেল—সে হবে না। প্রত্যেকে যথাসময়ে প্যান্ডেলে এসে উপস্থিত হবে। সেখানেই পুরো সময় কাটাবে। চায়ের আসরের জন্য সকালেই ঘণ্টা বাজবে। টিফিনের সময় সকাল ৮.৩০-এ ঘণ্টা বাজবে। ঠিক বেলা ১২টার সময় মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা বাজবে। বিকাল ৫টায় হাল্কা চা-টিফিন এবং রাত্রি ৯টার সময় ডিনার, দু-বারই ঘণ্টা বাজবে। রীতিমতো স্কুলের ঘণ্টা। রীতিমতো মহোৎসব। সারা পাড়া জুড়ে যেন সাত-সকাল থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত আনন্দধারা বয়ে যায়। শালিকদের তো বেশি আনন্দ। ঐদিন পড়াশোনার কোনো ব্যাপার নেই। কী আনন্দ—কী আনন্দ। নিজেরাই বড় ছোটো মিলে যে যার গান করে, আবৃত্তি করে, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য-ক্যুইজ-অন্ত্যাক্ষরী-হাস্যকৌতুক—কী না হয়? সবাই প্রস্তুতি শুরু করে এক মাস আগে থেকে। নিজেদের কাচ্চাবাচ্চাদের সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে হাজির থাকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। কী নেই?

একই অনুকরণে অন্যান্য স্ট্রিটগুলি করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। পানুদা তাদেরও মদত দিতে চেয়েছে। সেই পরিবেশ-মানসিকতা-সদিচ্ছা-আন্তরিকতাই নেই। পানুদারা কিন্তু বছরের পর বছর চরম সাফল্যের সাথে চালিয়ে যাচ্ছেন। বছরে বছরে অনুষ্ঠানগুলি নবকলেবর ধারণ করছে। গভীর বস্তুনিষ্ঠ যেমন সমাজবোধ, সেই রকম বুদ্ধিমত্তা সৃজনশীলতা যৌথ উদ্যোগ অংশগ্রহণে যৌথ পরিবারের নিগূঢ় তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি না থাকলে এসব প্রয়াস বাস্তবায়িত হয় না। পানুদা পরিবারটিকে এমন এক যোগে গড়ে তুলেছেন এবং নিঃস্বার্থভাবে বৃহত্তর চিন্তাধারার সঙ্গে গোটা পাড়াটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছেন প্রত্যেকে নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায়, অকুণ্ঠ মনে নিজেদের মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন। সমাজবিজ্ঞানের গভীর সমুদ্রে ডুব না দিলে এই রকমভাবে আজকের সমাজ-বিচ্ছিন্নতার দর্শনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নতুন বিকল্প দিশা দেখানো কখনও সম্ভব হয়? সমাজ-সামাজিকতা-ঐক্য, বৃহত্তর মননশীলতা গঠনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে পানুদা এক সুদক্ষ কারিগর।

আপন ব্রতে ব্রতী কী রকম হতে হয়, ত্রুটিহীন-আন্তরিক-চৌকশ হতে হয় একবার দেখুন-বুঝুন। পাড়ার এতগুলি কাচ্চা-বাচ্চা যারা ব্যবসায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাঙরের থাবার মধ্যে বইয়ের বোঝা নিয়ে রীতিমতো হাঁসফাঁস করছে, জীবনটাই রোবট হয়ে গেছে। তার ছাঁচে মা-বাবা অভিভাবকরাও। বিশ্বায়নী শিক্ষা-সংস্কৃতি অজগর সাপের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছে। সেই রক্তচোষা হাড়গোড় চিবিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জকে এই কৌশলেই পর্যুদস্ত করতে হয়। তোমরা ধ্বংস কর, আমরা সৃষ্টি করব। একটা বড় মহৎ উদ্দেশ্য—এ সবের পিছনে পানুদার বস্তুবাদী মগজ এবং দায়বদ্ধতা না থাকলে এরকম সমাজ গড়ার চৌকশ কারিগর হওয়া যায় না। কী রকম দেখুন। একদিন যদি পানুদার একটি শালিক তার বাসায় না আসে অমনি শুরু হয়ে যায় পানুদার ছটফটানি, দৌড়ঝাঁপ, খোঁজ-খোঁজ, দ্যাখ অসুস্থ হয়ে পড়ল নাকি? তাহলে তো পানুদার গোটা পরিবার অসুস্থ শালিক নিয়েই ব্যস্ত। একইভাবে শালিকদের অভিভাবকদের ক্ষেত্রেও।

পানুদার বাড়ির উঠোনে অপূর্ব বাগান। গোলাপ, মাধবীলতা,

শিউলি, জুঁই, বেলি, চাঁপা, রজনীগন্ধা, রক্তকরবী—কত জাতের রঙ বাহারের ফুল। টবে টবে ভর্তি সব বৈচিত্র্যময় হাজার রকমের পাতাবাহার, ফলের গাছ। অপূর্ব সাজানো সেই সুন্দর বাগানে কচি কাঁচা পরীর দলের উৎপাত উপদ্রবহীন বিচরণ কী যে মনোরম শোভাবর্ধন করে বলার নয়। অভিভূত আপ্লুত পানুদা 'মালা'কে বলতো গাও তো সেই গানটা—'একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে, আনন্দবসন্তসমাগমে।' মালার সুমধুর সুললিত কণ্ঠ থেকে অমনি বেরিয়ে আসতো। এ এক অনির্বচনীয় দৃশ্যপট, অবিস্মরণীয় পরিবেশ পরিস্থিতি।

পানুদার শালিক পাখির বাসাগুলি থেকে কালের নিয়মে জেন্টলম্যান, জেন্টল লেডি হয়ে যে যার পথে পা দিয়েছে। কিন্তু কেউই নিজেদের বাসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি কখনও। তাদের শৈশবের কত সব কীর্তিকলাপের গল্প শোনে আর হেসে লুটোপুটি খায়। ছেলেদের ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু সবচেয়ে করুণ ঘটনা ঘটে যখন মেয়ে শালিকগুলি বয়সের বিধানে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের পিতৃগৃহ ত্যাগ করে শ্বশুরবাড়ি যায়। সে এক গভীর অব্যক্ত যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য। ঠিক হুবহু 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা'-র মতো। পানুদার বাড়িতে সেদিন তো রান্নাই হয় না, উপরন্তু বিদায়বেলায় বেহালায় কখনও 'শিবরঞ্জনী' কখনও 'বাগেশ্রী' রাগের সুর যেন গোটা সপ্তাহটা ধরে সারাক্ষণ অনুরণিত হয়ে চলে। সাধে কি আর গোটা পাড়ার সমস্ত মানুষের অকৃত্রিম আপনজন-পরমাত্মীয়-অভিভাবক পানুদাদের সম্মানের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে। সকলের কাছে পানুদার কথাই বেদবাক্য। পানুদার পরিবারই সমাজ-সামাজিকতা স্বজনালয় হিসাবে সর্বজনবিদিত। 'জীবনে জীবন যোগ করা, নাহলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা'—পানুদা বিশ্বকবির এই আত্মশিক্ষাটাকেই সমাজজীবনের বেদমন্ত্র করে নিয়েছেন।

শুধুমাত্র এটাই নয়, এখন এই বৈচিত্র্যময় রঙ-বেরঙের জীবনের বাইরে আর একটি বৃহত্তর মহৎ জীবন আছে।

পানুদা ছেলেদের অবাধ্য হয়ে এই বয়সেও নিজের হাতে রেশন তোলেন, হাট-বাজার করেন নিয়মিতভাবে ঘড়ি ধরে। প্রতিদিন সকাল ৫টায় ৩৫ মিনিট রীতিমতো ঘামঝরানো হাঁটার পর পাড়ার প্রতিটি বাড়িতে ঢুকে বাড়ির খোঁজ খবর নেওয়া—শুধু ওনার স্ট্রিটে নয়, ব্লকের মধ্যে যতগুলি বাড়ি আছে প্রত্যেকটি বাড়িতে। কারুর কোনো বিশেষ প্রয়োজন থাকলে বা দরকারি কথাবার্তা থাকলে গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর ডাকে ঘরের ভিতর ঢুকে শুনে নেওয়া বা পরামর্শ দেওয়া, সাহায্য করার দরকার থাকলে সেটাও করে দেওয়া। তারপর সব বাড়ি ঘোরা হয়ে গেলে নিজের বাড়িতে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এক মুঠো মুড়ি সহযোগে এক কাপ লিকার চা। এবার ক্ষুধার্ত শিশুর মতো সকালের টাটকা 'গণশক্তি'টির উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। সেটার কোনো একটি অংশ বাদ যাবে না। গণশক্তি শেষ করে 'আনন্দবাজার'-এ ঢাকা। খবরের কাগজ পড়া শেষ হলে বাড়ির সকলকে চায়ের টেবিলে ডেকে প্রাতঃকালীন গল্পগুজব করে ঐদিন দুপুরে এবং রাত্রে কী রান্না হবে তা সবার মধ্যে আলোচনা করে স্থির করে নেওয়া। ঠিক সাড়ে-আটটায় বৌমার কাছ থেকে ফর্দ এবং টাকাকড়ি সেই সাথে ব্যাগ নিয়ে বাজার যাওয়া। একটা সাইকেল আছে। সাইকেলটা নেন চড়বার জন্য নয়—ঠেলে ঠেলে নিয়ে যান এবং সেইভাবেই ফিরে আসেন। বাজারের ব্যাগগুলো সাইকেলে ঝুলিয়ে আনতে সুবিধা হবে তার জন্য। বাজার করতে পানুদার অনেক সময় লাগে। জিনিস কিনতে যত না সময় তার থেকে অনেক বেশি সময় সবজি-মাছওয়ালা, অন্যান্য দোকানদারদের সাথে কিছু সুখ-দুঃখের কথা বলা, সেই সাথে আরও যারা বাজার করতে গেছেন তাঁদের প্রত্যেকের সাথে কথাবার্তা। সকলের নানা প্রশ্ন—জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য, টিভিতে দেখা নানা বিষয়ে যে যেমন পারেন তার মধ্যে রাজনীতি তো রেগুলার ইস্যু থাকবেই। এইসব করতে করতে প্রায় বেলা ১০টা তো হয়ই।

ফিরে এসে সামান্য বিশ্রাম নিতে নিতে 'মালা'কে বাজারের হিসাব, টাকা ফেরতের কাজটাও করে নেওয়া হয়। তারপর মুখ হাত ধুয়ে ভালো করে স্নান করে সামান্য টিফিন-চা। তারপর চলে বাইরে ঘোরা, জনসংযোগ। পার্টি অফিসে একবার যেতেই হবে। বড়ছেলে বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলতো, 'বাবু হলেন বাণিজ্যমন্ত্রী, জনসংযোগ মন্ত্রী এবং জনকল্যাণ মন্ত্রী'। দুপুর সাড়ে বারোটায় ঘরে ফিরে একটু জিরিয়ে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া, আবার একটু বিশ্রাম। রোদ পড়লেই প্রথম কাজ শালিক পাখিদের বাসাগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা দেখা। যদি রাত্রে বিড়ালে বা ইঁদুরে কিছু জিনিসপত্র ওলোট-পালোট করে দেয় সব ঠিক করে দেওয়া। এবার তো শালিকগুলো সব বাসায় আসবে। যেন ঘর-দোর সংসারপাতি সব ঠিকঠাক থাকে, নাহলেই চিৎকার-বকাবকি-রাগ-কান্না। ওদের জন্য দেখার কেউ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও মালা-অঞ্জু প্রতিদিন সব দেখে শুনে ঠিকঠাক রাখে, তবুও শালিকদের সংসারে যাতে অশান্তি-ঝঞ্ঝাট কিচ্ছু না বাধে সেজন্য ফাইনাল চেক্-আপ পানুদাকে একবার করতেই হবে। এসব দেখাশোনার পর এবার পানুদার বাগানের কাজ। শালিকরা আসার পর এক ফাঁকে দাদুর কাছে গিয়ে প্লাস্টিকের ফুলের ঝাঁপি নিয়ে সবাই বাগানে সন্তর্পণে ঢুকে দাদুর কাছে ফুল চাওয়া—আজ বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো, শুক্রবারে সন্তোষী মা। এখন আবার মঙ্গলবারে হনুমান পুজো। এসব ব্যাপারস্যাপার। মোটের কথা নিজের নিজের বাড়িতে মায়েরা সাপ্তাহিক যে যে বারে যাদের পুজো করে শালিকদেরও তাই করতে হবে। নাহলে সংসারের ছেলেমেয়েদের অমঙ্গল হবে না! সন্ধ্যা নেমে আসার আগে সবাই 'মালা'-র নির্দিষ্ট করা সময়ে প্রত্যেকটি শালিককে নেমে আসতে হয় উঠোনে—চুপচাপ নিঃশব্দভাবে গোল হয়ে দাঁড়াবে। মাঝে পানুদা, মালা, অঞ্জু, বিট্টু, ছোট্টু, বাবা, কাকা অন্য কেউ যদি থাকেন, শুরু হবে সমবেত কণ্ঠে সন্ধ্যাসঙ্গীত— 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে...'। প্রতিদিনই সংগীত শেষে 'মালা' গানের মর্মার্থটি শালিকদের কাছে বলে দেয়। অঙ্গীকারও করিয়ে নেয়। আর শেষে দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ আর্য আকৃতির উন্নত শিরে পানুদা আবৃত্তি করে প্রতিদিন শুনিয়ে দেয় বিশ্বকবির—

'জীর্ণ যা কিছু যাহা-কিছু ক্ষীণ
নবীনের মাঝে হোক তা বিলীন—
ধুয়ে যাক যত পুরানো মলিন
নব-আলোকের স্নানে।'

মর্মার্থটাও পানুদা গভীর প্রত্যয় মিশ্রিত মৃদু স্বরে শালিকদের বুঝিয়ে দেন। সব সময়ই বাড়ির দক্ষিণ দিকের দুয়ার খোলা থাকে। রাস্তা দিয়ে যেতে যিনি-ই ওই অনুষ্ঠান হচ্ছে দেখতে পান, তাঁরাও নীরবে এসে অংশ নেন। অনুষ্ঠান দেখে প্রতিদিনের মতো শালিকদের জন্য পরিবার পিছু প্লাস্টিক প্যাকেটে লাল ছোটো ভিজে ছোলা, ছোট্ট ২-৩ টুকরো কাঁদা আদা এবং সোনা রঙের আখের গুড়। অঞ্জুর হাত থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে সেগুলি নিয়ে সেখানেই খেয়ে জল খেয়ে সব নিজ নিজ বাড়ির পথে পা বাড়ায়। দাদু-কাকীমা-দিদিদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে কেউ কিন্তু ভোলে না। অস্তগামী জবাকুসুমসঙ্কাশং সূর্য নয়ন মেলে সেই অবর্ণনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। প্রতিদিনই সমগ্র অনুষ্ঠানটির প্রত্যক্ষদর্শী এবং যেন অংশীদার থাকেন 'দিনমনি-দিবাকর'।

পানুদার রাজনৈতিক হাতেখড়ি হয়েছিল হাওড়া জেলার স্বনামধন্য কমিউনিস্ট নেতা জয়কেশ মুখার্জির কাছে। জয়কেশদা স্থায়ীভাবে ডোমজুড় পার্টি অফিসের কমিউনেই থাকতেন। অকৃতদার।

স্বাধীনতা সংগ্রামী, জেলার অনেক ঐতিহাসিক কৃষক ও শ্রমজীবীদের সংগ্রামে বীরত্বের সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বহুদিন যাবৎ হাওড়া পার্টির জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কয়েকবার পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছিলেন। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জয়কেশদার প্রভাব ও জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। প্রকৃত কমিউনিস্টের জীবন-যাপন করতেন। পানুদার বাড়ি ডোমজুড় পার্টি অফিসের কাছেই। যে পানুদা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের নাড়া বেঁধেছিলেন ওই রকম স্বনামধন্য কমিউনিস্ট নেতার কাছে, তাঁর মধ্যে ব্যতিক্রমী প্রতিভা তো থাকবেই। জয়কেশ মুখার্জির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য যাঁরাই পেয়েছেন তাঁরাই চেষ্টা করেছেন নিজেদের তাঁর ছাঁচেই গড়ে তুলতে। পানুদার মধ্যে এই যে অনন্য জীবনযাত্রা. একজন পূর্ণাঙ্গ কমিউনিস্টসুলভ অনুকরণীয় ব্যক্তি তার মূল কারণ। তিনি শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামের জন্য যে বৈজ্ঞানিক মতাদর্শকে বেছে নিয়েছিলেন মানুষই যাঁর শ্রেষ্ঠ শক্তি, সেই মানুষদের বহুমুখী কর্মকাণ্ড বিশেষ করে সামাজিক থেকে শুরু সমাজতান্ত্রিকে রূপান্তর ঘটানো তার মূল সূত্রগুলিকেই রপ্ত করেছিলেন তাঁর শ্রদ্ধেয় নেতার কাছে। সমাজ বদল যদি করতে চাও আগে নিজেকে আমূল বদলাও—নিজের পরিবারকে আমূল বদলাও, মানুষের আকর্ষণ বাড়াও, সমাজের মধ্যে এই চিন্তাধারার প্রভাব যত পারো বাড়াও, শিশু-কিশোর নবীর থেকে শুরু করে প্রবীণ পর্যন্ত। মাছের মতো জলের সাথে সর্বক্ষণ মিশে থাকো। মাছের ও জলের সম্পর্কের মতো কমিউনিস্টদের সঙ্গেও সেইরকম মানুষের নিরবচ্ছিন্ন গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলো। হও সমাজের গভীর জলের মাছ।

নিজের পরিবারটিকে কী বিরল ঘরানায় গড়ে তুলেছেন তার পরিচয় তো পূর্বেই মিলেছে। নিজে একজন খুবই প্রবীণ পার্টিসভ্য। দুই ছেলে ও বৌমা স্ব স্ব ক্ষেত্রে পার্টিসভ্য। মাধুরীদির চাকরির ক্ষেত্রে বাধা থাকার দরুন অবসরের পর পার্টি সভ্যপদ পেয়েছিলেন। সমগ্র পরিবার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টি-কর্মসূচিতে যোগ দেন। 'গণশক্তি', 'দেশহিতৈষী', 'পি.ডি.', 'মার্কসবাদী পথ', 'একসাথে' পত্রিকার স্থায়ী গ্রাহক এবং প্রত্যেকেই নিয়মিত পাঠক। রাজনৈতিক জ্ঞান অসাধারণ। প্রচুর মার্কসবাদী রচনাসম্ভার রয়েছে বাড়িতে। প্রগতিশীল সাহিত্যজাতীয় পত্রিকাও অনেক আছে এবং সেগুলির সদ্ব্যবহার যে প্রশ্নাতীত, পানুদার সঙ্গে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

পানুদা যেভাবে নিজের পাড়ায় আছেন, একেবারে প্রত্যেকটি প্রতিবেশীকে আষ্টেপৃষ্ঠে প্রাণের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছেন, সমাজের একজন সর্বজনগ্রাহ্য শ্রদ্ধাভাজন হয়ে আছেন, এসব তো বিরল। কী সৃজনশীলতা, সংবেদনশীলতা, সাহসিকতা! যে-কোনো কাজে সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা। সর্বজনগ্রাহ্য এমন নমনীয় ব্যক্তিত্ব পার্টির অমূল্য সম্পদ। একসুরে-একতালে-একলয়ে পরিবারটি যেভাবে বেঁধে রেখেছেন সে তো অনন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। শুনলে অবাক হতে হয়—রেলের পদস্থ অফিসার হওয়ায় সমগ্র ভারতে পর্যটনের প্রথম শ্রেণির রেল পাশ থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন কোথাও যেতে পারেননি এই পাড়ায় এত সব নিবিড় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের অবিচ্ছেদ্য টানে। শালিক পাখিরা বাসায় যদি যেতে না পারে, তাদের অনুপস্থিতিতে যদি কারুর কোনো দুর্ঘটনা বা বড় রকম অসুখ-বিসুখ হয়, তাহলে নিজেরা নিজেদের কাছে কী জবাব দেবে? প্রতিবেশীদের কাছে কী করে মুখ দেখাবে? এইসব দুশ্চিন্তায় বাড়ি ছেড়ে জীবনে কোথাও এক চুল নড়া-চড়া করেনি। অবিশ্বাস্য নয় কি? এমন গভীর মানুষপ্রেমী, সমাজপ্রেমী কখনও কেউ দেখেছেন? পানুদা আছে। সত্যিই আছে।

পানুদা একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিবারসহ। উনি যে বুথে বাস করেন প্রত্যেকবার ভালো ভোটে জেতেন। সমাজের অনেক মেয়েকে ছেলেকে মনের মতো করে মানুষ করেছেন। এক একজন স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল তারকা। প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার ধারক ও বাহক। নির্বাচনী বুথ স্কোয়াডে মিছিলে পানুদা থাকলেই মানুষ বুঝে নেবে ভোট কাদের দিতে হবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ফল প্রকাশের পর পানুদা একদিন পার্টি অফিসে এলেন। পার্টি, পার্টির লাইন, পার্টির ভূমিকা ও গঠন সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরে মন খুলে আলোচনা করলেন। শুনলাম। ওঁর মতো দুর্লভ প্রবীণ কমরেডের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনতে বড় ইচ্ছা করে ছাত্রের মতো। পারস্পরিক মত বিনিময় করে মনের মধ্যে গভীর তৃপ্তি-আনন্দ-শিক্ষা পাওয়া যায়। কী বিশাল অভিজ্ঞতা। পার্টির প্রতি কী গভীর অনুরাগ-ভালোবাসা।

পানুদা বললেন, দ্যাখো আমার মূল কথা তিনটি। এই তিনটি কারণের জন্য আজ আমাদের পার্টির এই পরিস্থিতি। ১. যতই বলে থাকি বামফ্রন্ট সরকারের জনসমর্থনের ভিত খুবই গভীরে—এটা ভুল অনুমান। ২. প্রকৃতপক্ষে মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যতটা যান্ত্রিক ততটাই দুর্বল। ৩. আমাদের আপাদমস্তক স্তরের পার্টি কমরেডদের মধ্যে আসল বৈপ্লবিক লক্ষ্য চাপা পড়ে গিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শ্রেয় বলে মনে করা অর্থাৎ সংসদ-সর্বস্বতা ভীষণভাবে দানা বাঁধছে। দেখছো না সবাই কেমন হরদম মালা জপে যাচ্ছে কবে আমরা আবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকারে আসব? বিপ্লব-টিপ্লব নয়, ওসব সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা। তার চেয়ে সরকারে থাকাই ভালো। মারধোর নেই, খুন-খারাবি-সন্ত্রাস এসব কিছুই নেই, পুলিশের অত্যাচার নেই, মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা জেল হাজত কিছুই নেই, উপরন্তু কিছু পাওয়া-টাওয়ার রাস্তা আছে। নেতাগিরি করে মানুষর ভয়, কৃত্রিম সমীহ সম্মান লাভের যথেষ্ট সুযোগ আছে। অতএব একটা বিপ্লবী পার্টির কর্মীদের দরকার—নিরাপদ, ব্যক্তিস্বার্থরক্ষাকারী, কর্তৃত্ববাদী, খবরদারি করার ব্যবস্থা। 'এই বেশ আছি।' শ্রেণিসংগ্রাম, গণআন্দোলন, অত মিছিল-মিটিং-জনসংযোগের কোনো রকম হ্যাপা চাই না। চাই কোনো-না-কোনো দিকে এক একটা তালেবর হতে। মানুষের কাছে অত যাবার কী দরকার, মানুষই আমাদের কাছে নিজের গরজে আসবে। এ তো ভাই সর্বনাশা সংশোধনবাদী চিন্তাধারা। তারই প্রাধান্য। সবাই তো দেখছি ছুটছে মরীচিকার টানে।

তারপর দ্যাখো—যে মানুষই হল কমিউনিস্ট পার্টির প্রাণভোমরা-হৃৎপিণ্ড-শ্বাসযন্ত্র, সেই তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কের ফলাফলটা? বামফ্রন্টের শিকড় যদি জনগণের গভীরে যেতো, যত জোটবদ্ধ শক্তিই হোক, যত মারাত্মক ধাক্কাই হোক, সে কি অমনি করে পড়ে যেতো? সমর্থন এত পরিমাণ হ্রাস পেতো? আসলে দেখেছো তো—এক একটা ঝড়ে টাউনশিপের বিশাল বিশাল বহুদিনের পুরনো মহিরুহের মতো মোটা মোটা গুঁড়ির গাছগুলো সব কেমন পাট পাড়া হয়ে পড়ে যাচ্ছে। দূর থেকে আমরা বলি, কত কালের গাছ, সব পোকায় খেয়ে দিয়ে অপোক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু ঝড়ে পড়া গাছগুলির যদি গোড়াটার কাছে গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করে দ্যাখো তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাবে এবং আশ্চর্য হয়ে গালে হাত দিতে বাধ্য হবে—এ মা! এই বিশাল গাছের শিকড় এত ভাসা ভাসা, আদৌ শিকড়গুলো মাটির গভীরে যায়ই নি। সেই-রকমই টানা চৌত্রিশ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকারে থাকলেও যতই বলে থাকি আসলে তার শিকড় আদৌ আদৌ গভীরে যায়নি। ঝড়কে প্রতিরোধ করার শক্তি সে হারিয়েছে। সব ফাঁপা-ফোঁপা। দলে দলে সুবিধাভোগী, স্বার্থপরগুলো—ঝড়ের কুটোর মতো পার্টির মধ্যে যারা উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল—যেই দেখেছে বিপদ, সব গুছিয়ে বাগিয়ে নিয়ে চম্পট দিয়ে তৃণমূলের ঝাণ্ডা ধরেছে। পেটাচ্ছেও আমাদের।

তাই ভাই, মানুষের সাথে যোগাযোগ ছিল আমাদের ওপর ওপর, হাল্কা-পলকা। তাদের মনের মধ্যে আমরা ঢুকতে পারিনি, আপন করেও নিতে পারিনি। যান্ত্রিক-আন্তরিকতাশূন্য-লোকদেখানো সম্পর্ক। কত বড় আত্মপ্রবঞ্চনা বলো তো ভাই?

মানুষ—মানুষ—মানুষ। মানুষ ছাড়া তো আমাদের পার্টির গতি নেই। মানুষের সঙ্গে এমন গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে যা হবে অবিচ্ছেদ্য। পার্টিটাই তার সব। গর্বের সাথে বলবে আমার পার্টি—আমাদের পার্টি। বুক দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখব—তাকে বাড়াবো। তাকে ধরেই শ্রেণিশত্রুদের সমূলে উচ্ছেদ করে নিজেদের রাজ কায়েম করব। গরিব খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য এমন মহোত্তম আদর্শের রাজনৈতিক পার্টি দেশে দ্বিতীয়টি নেই। মানুষকে যেন বোঝানো যায় পার্টিই আমার পরম বন্ধু, নিকট আত্মীয়, অতি আপনজন। তাকে রক্ষা করা এবং বড় করে তোলা, জনপ্রিয় করে তোলা আমাদের একমাত্র দায়িত্ব। পার্টিই আমার নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অগ্রণী নেতা, হোতা। তুমি তো জানো বিশ্বখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, ''পিপাসায় ছাতি ফেটে গেলে মানুষ যেমন ঝর্নার কাছে ছুটে যায় আমিও সেইরকম পিপাসার্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির কাছে।'' এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর কী থাকতে পারে?

তৃতীয়ত, আমাদের পার্টিতে তিন লাখের কিছু বেশি পার্টিসভ্য আছে। এর ৯৬ শতাংশ এসেছে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের রাজত্বকালে। বসন্তের হাওয়ায়, অনাবিল স্রোতে। নেই আদর্শ ও নীতিগত শিক্ষা, কমিউনিস্ট কালচার-শিষ্টাচার-মূল্যবোধ। তাদের প্রাথমিক ক্লাসেই পড়াইনি। প্রাথমিক এবং অতি আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাটাই না দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল পাঠক্রম নিয়ে ক্লাস করছি। আরে, বড় মাপের বিল্ডিং বানাচ্ছো, তার ভিতটাই নড়বড়ে দুর্বল রেখে পাঁচতলা বাড়ি তুলছো। তলা ফাঁকা, ভারি মাথা। পড়ছে গিয়ে হুড়মুড় করে। কমিউনিস্টসুলভ জীবনযাপন, কমিউনিস্ট রীতি-নীতি, কমিউনিস্টসুলভ আচার আচরণ অভ্যাস, কমিউনিস্ট সংস্কৃতি, মূল্যবোধ—এইসব কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হওয়ার অতি আবশ্যিক বিষয়গুলি ব্যতিরেকে অ-আ-ক-খ না শিখিয়ে তত্ত্বজ্ঞান দিচ্ছি। ফলে স্তালিনের কথায় 'কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হচ্ছেন সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তান—বহু বিরল গুণাবলী সম্পন্ন সম্পদ'—মিলছে কি কোনো দিকে দিয়ে? তাই যদি হতো তাহলে মানুষ কেন আমাদের দিকে আঙুল তুলে বলবার সুযোগ পান—''আপনাদের সাথে কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি-র মতো বুর্জোয়া পার্টিগুলির নেতা ও কর্মীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই। তারাও যা আপনারাও তাই।'' আমাদের গোড়ায় চরম গলদের বিষয়ে এর বেশি কিছু বলার আছে বলে বিশ্বাস করি না। এই সীমাহীন বিরাট মাপের ত্রুটির জন্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ আনপড় পার্টিসভ্যদের সাথে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, আচার ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে অধিকাংশ মানুষের পার্টির প্রতি ক্ষোভ-বিক্ষোভ বীতশ্রদ্ধা। তারা তো অধিকাংশ জানেই না—তার কাছে কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত! এ দোষ-ত্রুটির জন্য কমরেডরা তো দায়ী নয়। দায়ী সংগঠকরাই। এই অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংগঠকরা আদৌ আন্তরিক নন। এটাকে ধর্তব্যের মধ্যে ধরেনই না। মনে করেন না মানুষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চিনে জেনে বুঝে কেউ পার্টিতে আসে না। আসে পার্টির সংগঠক-নেতাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। তারপর তাদের চেনানো জানানো বোঝানোর দায়িত্ব পড়ে মতাদর্শ শিক্ষা ও চর্চার। টপকে সিঁড়ি উঠতে গিয়ে হাত পা ভাঙছি।

শেষে যে কথাটায় পানুদা পুনরায় আলোকপাত করলেন—মানুষ আছে, আমরা নেই। মানুষ মনের মানুষ খুঁজছে। দুঃখ কষ্ট দুর্দশা অন্যায় অবিচার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সঠিক-বিশ্বাসযোগ্য-সৎ-মহৎ অবলম্বন খুঁজছে। তাদের কাছে টেনে বুকে টেনে তাদের দুঃখ-যন্ত্রণায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়ে মনের মানুষ করে তুলতে পারাটাই বড় কথা। যাতে করে সব সময় সর্বত্র মনের মধ্যে প্রাণের মানুষের আঘ্রাণই যেন পাই এবং পাবোও। এবারও সেই সর্বত্রগামী মানবপ্রেমী রবীন্দ্রনাথকেই টেনে এনে ভরাট গলায় শোনালেন—

'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে।।
আছে সে নয়ন তারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়—
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে দিক-পানে।।...'

এটাই আমাদের দায়বদ্ধতা। এই কমিউনিস্ট দায়বদ্ধতার শিক্ষা-প্রেরণায় শিক্ষিত-অনুপ্রাণিত হয়েই কমরেড পানুদা নিজে কমিউনিস্ট হয়েছেন, সমগ্র পরিবারটিকে কমিউনিস্ট করে গড়ে তুলেছেন। কমিউনিস্ট নৈতিকতা-নৈতিক দায়বদ্ধতা পালনের উনি এক সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগর। তাঁর কাছ থেকে একটা মহামূল্য শিক্ষাই পাই—

'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।'

পানুদা যে বিশ্বকবির কাছে নৈতিক দায়বদ্ধতার দায়ে অন্তর দিয়ে এই মহামূল্য কথাগুলো শিখেছেন, আমরাও শিখি না কেন?

With Best Compliments of

Mukherjee Construction Co.

মুখার্জী কনস্ট্রাকশন্ কোং

GOVT. CIVIL, STRUCTURAL, MECHANICAL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIERS

Kalajharia Road, Satyajit Nagar, Asansol-713301, Phone : (0341) 2283396, Mobile : 9434237165, 9734777842
Fax : +91341-2283396, E-mail : mcc.asansol@gmail.com

Sl. No. 6

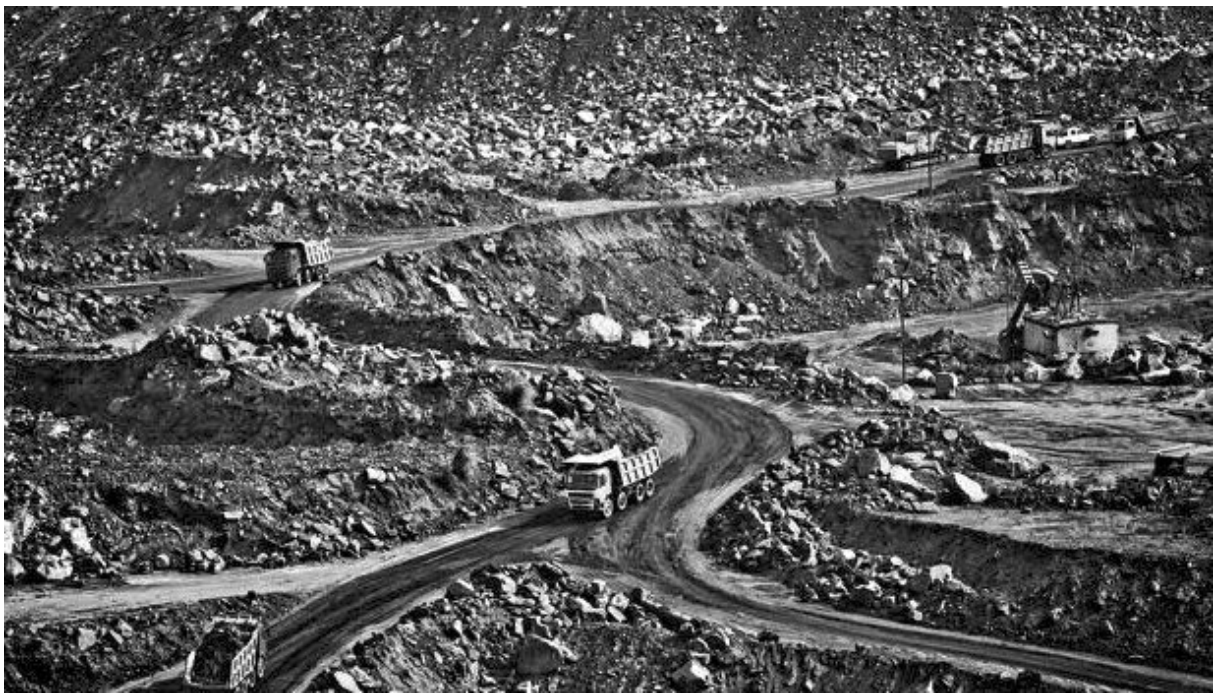

কয়লা শিল্পে পরিকল্পনাহীনতা

বংশগোপাল চৌধুরী

২০১২-১৩ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটে কয়লা দপ্তরের বরাদ্দ ৪৯৮.৩৫ কোটি টাকা। লক্ষণীয়ভাবে কয়লা মন্ত্রক ২০১১-১২ আর্থিক বছরে মাত্র ৩২৭.৫৭ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছে, যদিও বরাদ্দ ছিল ৪২০.০০ কোটি টাকা। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে কয়লা শিল্পে শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকটিও অবহেলিত হয়েছে। বরাদ্দ টাকা কয়লা দপ্তর খরচ করতে পারেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অভাবে কয়লা মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ পরিকল্পনা খাতে কাজে লাগছে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্রথম থেকেই অবহেলিত থাকার ফলে পরবর্তীতে বাজেট বরাদ্দ কম হচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩৭,১০০.৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও ৩২,০৩৩ কোটি টাকার মতো খরচ করতে পেরেছে কয়লামন্ত্রক। একাদশ পরিকল্পনার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ এবং ধস নিয়ন্ত্রণের মতো মানুষের জীবনের সাথে যুক্ত কর্মসূচিগুলিও ব্যাহত হয়েছে এবং সংশোধিত ক্ষেত্রে টাকার বরাদ্দ কমে গেছে। একইভাবে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতেও কয়লাশিল্পের বরাদ্দ ছাঁটাই হয়ে গেছে।

ঝরিয়া এবং রানিগঞ্জে কয়লাখনি অঞ্চলের আগুন ও ধসের সমস্যা গুরুতর আকার নিলেও কয়লা দপ্তর বরাদ্দ টাকা খরচ করে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। একইভাবে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পশ্চিমবাংলার সরকার ১৫৪ কোটি টাকা ২ বছর ধরে গচ্ছিত করে রেখেছে অথচ খরচ করতে পারছে না। ধস মোকাবিলায় এই টাকা তারা খরচ করতে পারল না। কয়লামন্ত্রকের থেকে এ বছর পশ্চিমবাংলাকে জানানো হচ্ছে টাকা খরচ করতে না পারার জন্য কোনো বরাদ্দ কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর করছে না। মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার সাথে যুক্ত পশ্চিমবঙ্গের কয়লা শিল্পাঞ্চলের পুনর্বাসন প্রকল্প নিয়ে কোনো অগ্রগতি ঘটাতে পারছে না তৃণমূল সরকার। মানুষের মৃত্যু হচ্ছে ধসজনিত কারণে, আর বর্তমান রাজ্য সরকার শুধু প্রচারমাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে।

ঝরিয়া শহরের মাঝখানে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। যে-কোনো সময় বিপদ নেমে আসবে। অথচ কয়লা মন্ত্রক ও ঝাড়খণ্ড সরকার টাকা খরচ করছে না। সরকারের অমানবিক এই আচরণ নজিরবিহীন। শুধুমাত্র খোলামুখ কয়লাখনি তৈরি করে বেসরকারিভাবে চটজলদি কয়লা তোলা হচ্ছে। ঝরিয়া শিল্পাঞ্চলের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। অথচ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নীরব দর্শক।

একইভাবে অনগ্রসর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ২৬.৬০ কোটি টাকা ২০১১-১২ সালে বরাদ্দ করা হলেও প্রকৃত খরচ শূন্য। কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্প সেখানে কয়লা মন্ত্রক তৈরি করতে পারেনি। ২০১২-১৩ সালে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। ঠিকা প্রথায় খোলামুখ কয়লাখনি করে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, আর সরকারি অর্থ খরচ করতে পারছে না কেন্দ্রীয় সরকার। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ কয়লার চাহিদা অনস্বীকার্য। বিদ্যুৎক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্র অচল হয়ে যাবে যদি কয়লার যোগান ঠিকমতো না

করা হয়। এজন্য গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি অনেক যত্ন নিয়ে করা দরকার। ১৫টি প্রজেক্ট একাদশ পরিকল্পনা থেকে দ্বাদশ পরিকল্পনায় স্থান দেওয়া হয়েছে এবং আরও নতুন ৬টি স্কিম গবেষণার কাজে অনুমোদন পেয়েছে। বিভিন্ন চালু স্কিম এবং নতুন স্কিমের অগ্রগতি খুবই জরুরি। কারণ কয়লার চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে একটা ফারাক স্পষ্ট। সেজন্য এ ক্ষেত্রে খরচ সঠিকভাবে না করতে পারলে অর্থনীতিতে ভয়ঙ্কর চাপ সৃষ্টি হবে। মাইন প্ল্যানিং এবং ডিজাইন ইনস্টিটিউট-কে আরও অনেক উন্নত করা দরকার। তার জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও বরাদ্দ অর্থ খরচ করতে হবে। নতুন এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি কয়লাশিল্পে অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এ কাজে অবহেলা দেখা দিয়েছে। সরকারি বরাদ্দ অর্থ যেখানে বাড়ানো দরকার সেখানে তারা বরাদ্দ টাকা খরচ করতে পারছে না।

কয়লাখনির বেসরকারি মালিকরা খনিতে কোনো ভরাটের ব্যবস্থা না করায় কয়লাখনি অঞ্চলে আজ চরম বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৯ সালের অগস্ট মাসে ৯৭৭৩.৮৪ কোটি টাকা ভারত সরকার বরাদ্দ করেছে ধসকবলিত এলাকার মানুষের পুনর্বাসন প্রকল্প চালু করার জন্য। অথচ টাকা খরচ হচ্ছে না। পশ্চিমবাংলায় ২০১১ সাল থেকে ২ বছর তৃণমূল সরকার কোনো জমি নির্দিষ্ট করতে পারেনি। প্রথমধাপে যে কয়টি গ্রামে পুনর্বাসনের জন্য ২০১০ সালে বামফ্রন্ট সরকার কাজ শুরু করেছিল সেই কাজের অগ্রগতি হয়নি সেভাবে। মানুষ হতাশ হচ্ছেন। শ্রীপুর, সাঁকতোড়িয়ায় গরিব মানুষ গৃহহারা হয়েছে। ইস্টার্ন কোলফিল্ডের সদর দপ্তর সাঁকতোড়িয়ায় মারা গেছে হেনা পারভীন নামে এক তরুণী। ত্রিশটি পরিবার নিরাশ্রয় হয়েছে। রাজ্য সরকার পুনর্বাসনের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় বেপরোয়া, বেআইনি কয়লার কারবার চলছে শাসক-দলের মদতে। মানুষের নিরাপত্তা চরম অবহেলিত। তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তর টাকা খরচ না হওয়ার জন্য পশ্চিমবাংলা ও ঝরিয়ায় পুনর্বাসন প্রকল্পে এই বছরের বাজেটে কোনো বরাদ্দ রাখেনি। রাজ্য সরকারের এই ব্যর্থতার জন্য এ বছর কোনো টাকা পেল না ধস কবলিত এলাকার পুনর্বাসন প্রকল্প। রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের মানুষ জানতে চাইছে ১৫৪ কোটি টাকা এ.ডি.ডি.এ. তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন খরচ করতে পারলো না? শুরু হয়েছে মানুষের মধ্যে প্রতিবাদ। রাজ্য সরকারের কাছে এর কোনো সদুত্তর নেই। বর্থতার দায় বর্তমান রাজ্য সরকার কোনো ভাবেই এড়াতে পারে না।

কোল ইন্ডিয়াকে কয়লামন্ত্রক তার অংশের ৩৫০ কোটি টাকা খরচ করার জন্য কেন বলতে পারল না, এটাও রহস্যের বিষয়। আজ যখন ভারত সরকার শুধু চেষ্টা করছে কয়লা শিল্পকে বেসরকারীকরণ করার, তখন এই প্রশ্ন গভীরভাবে নাড়া দেয় যে ভারত সরকার তার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে কিনা। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি হল সরকারি ক্ষেত্রগুলিকে উদারীকরণের পথে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া এবং সরকারি ক্ষেত্রকে দুর্বল করা। আজ ধস-কবলিত এলাকার পুনর্বাসন প্রকল্প এক উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিআইটিইউ এই প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। সময়সূচি বেঁধে দিয়ে এই প্রকল্পকে চালু করার দাবিতে মানুষের আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধছে।

এর মধ্যে মারাত্মক প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে কয়লাশিল্প এলাকার জমি অধিগ্রহণের বিষয়টিও। নির্বিচারে খোলামুখ কয়লাখনি বিপন্ন করে তুলছে অঞ্চলকে। মাইনস ক্লোজার প্ল্যানে খোলামুখ খনিতে জমি সমতল করার বিষয়টিও রাখা আছে। কিন্তু সকলের চোখের সামনে ঠিকাদারদের দিয়ে খোলামুখ খনি খোলানো হচ্ছে। ই.সি.এল-এর দোসর হয়েছে তৃণমূলের নেতারা। ঠিকাদারদের সাথে যোগসাজস করে জোর করে সামাজিক বন-সৃজন প্রকল্পের গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। বে-আইনি টাকা তুলছে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা। নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে তারা রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত। বেসরকারীকরণের পূর্বেই এক ধরনের বেসরকারীকরণ করে ফেলছে তৃণমূল কংগ্রেস। জিন্দাল গোষ্ঠীর হয়ে জমির দালালি করছে তৃণমূল সরকারের মাতব্বররা। গভীর প্রশ্নচিহ্নের মুখে কয়লা-শিল্পাঞ্চলের ভবিষ্যৎ।

আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন ব্যাপক মানুষের মঞ্চ তৈরি করে। জমিহারা মানুষের চাকরি এ-অঞ্চলে অন্যতম প্রধান বিষয়। মা-মাটি-মানুষের সরকারের আমলে জমিহারা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

ঝাড়খণ্ড অঞ্চলেও রানিগঞ্জের মতো আদিবাসী মানুষের জমিতে হাত বাড়িয়েছে বেসরকারি মালিকরা। কয়েকটি কয়লাব্লকের ছাড়পত্রের জন্য ভূমি ও পরিবেশ বিষয়কে এড়িয়ে, স্থানীয় জমিহারা বেকার যুবকদের চাকরির প্রশ্ন বাদ দিয়ে, চুক্তি করার চেষ্টা হচ্ছে।

কার্যত বেসরকারি ঠিকাদাররা ভারত কোকিং কোল লিমিটেড ও ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বনাঞ্চলে কেন CMPIL (Central Mine Plan Institute) রিপোর্টগুলি বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে—এ প্রশ্ন আজ সকলের।

৪,২২০ কোটি টাকার মধ্যে কোল ইন্ডিয়া তার বাজেটের (২০১১-১২) ২৭৫৯ কোটি টাকা মাত্র খরচ করেছে। অন্যদিকে ECL, MECL, NLC ও WCL-এর মতো সরকারি সংস্থার যারা কয়লাশিল্পের স্থপতি, সেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা হচ্ছে না। কোল ইন্ডিয়াকে দুর্বল করার এই প্রচেষ্টা রুখতে হবে। প্রয়োজনে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন যুক্তভাবে ধর্মঘটে যাবে। সারা দেশ বাঁচানোর স্বার্থে কোল ইন্ডিয়া বাঁচানোর লড়াই শুরু করতে হবে।

Happy pooja greetings from

CLW CO-OPERATIE CREDIT SOCIETY LTD.

Chittaranjan, Burdwan

Sl. No. 147

কয়লার সমস্যা : সমস্যায় কয়লা

পার্থ মুখার্জি

খনি শব্দটির আভিধানিক অর্থ আকর, যেখানে ধাতব দ্রব্য কয়লা, রত্ন ইত্যাদি স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য—চলন্তিকা, রাজশেখর বসু)। কিন্তু কতকগুলি শব্দের বিবিধ অর্থ থাকা সত্ত্বেও সেগুলি একই বস্তুকে বারংবার চিহ্নিত করার কারণে একটি বিশেষ অর্থ পরিগ্রহ করছে। খনি শব্দটি এমনই একটি শব্দ, যা প্রথমত এবং প্রধানত কয়লাখনিকেই সূচিত করে। যদিও দেশে স্বর্ণখনি, অভ্রখনি বা তাম্রখনির অভাব নেই। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে খনি শব্দটি কয়লাখনি অর্থে ব্যবহৃত।

সাগরের ঢেউয়ের মতো বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দুই শতাব্দী জুড়ে দামোদর উপত্যকায় গড়ে উঠেছে কয়লা শিল্প। বহু প্রাচীন স্মৃতিকে বুকে নিয়ে, অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী দামোদর নদ তার বিস্তীর্ণ উপত্যকা দিয়ে বয়ে চলেছে। দামোদর-বরাকর ও অজয় নদীর অববাহিকায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমানের ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ কয়লা অঞ্চল জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে দেশের এক অমূল্য সম্পদ।

দামোদর নদের সঙ্গে কয়লা শিল্পের সখ্য চিরকালীন। দামোদরের জলধারা তার উৎসমুখের রহস্যকে বুকে নিয়ে, প্রথম উন্মেষকে স্মরণে রেখে অবিচল মহাকালের মত বয়ে যাবে। ঠিক তেমনি কয়লা শিল্পের অস্ফুট গুঞ্জন এই শিল্পে নিয়োজিত মানুষের আশা নিরাশা, সাফল্য ও ব্যর্থতার সালতামামি চলবে বছরের পর বছর। তাই মানবসভ্যতার উন্নয়নের পাশাপাশি তার সংশিষ্ট বিষয়সমূহ আলোচনায় চলে আসবে বারেবারে।

মানবসভ্যতার উন্নয়নের রেখাচিত্র ঊর্ধ্বমুখী হয় যখন আমরা দেখতে পাই প্রযুক্তি, শিল্পায়ন, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মেলবন্ধন ঘটেছে, ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতবাসীর শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাধীনোত্তর দিনগুলিতে এই মেলবন্ধনের একটা চেষ্টা লক্ষ করা গেছে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে। কিন্তু সবার পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে এনার্জি বা শক্তির উৎপাদন আর ব্যবহার। বিভিন্ন থ্রাস্ট এরিয়া বা অগ্রাধিকার প্রকল্পে শক্তির বন্টন বা ব্যবহার সাফল্য সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি। এই শক্তি উৎপাদনের মূল উপাদান বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

শক্তির উৎসের বিভিন্ন ভাণ্ডারকে বাণিজ্যিক চাহিদার ভিত্তিতে সাজালে দেশের সামগ্রিক যে ছবি ফুটে ওঠে তাতে দেখা যায় তার অর্ধেকের বেশিটাই আসবে কয়লা থেকে। কয়লার ২২০.৯০ বিলিয়ন টন মজুত ভাণ্ডার এক্ষেত্রে পিছনে ফেলে দিয়েছে লিগনাইট, প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাস, পারমাণবিক শক্তি, জলবিদ্যুৎ এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য অপ্রচলিত শক্তি-র সম্ভাবনাকে। যদিও বর্তমানে এনার্জি ব্যবহারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আমরা প্রায় ২৪ শতাংশই আমদানি করতে বাধ্য হই, তার মূল কারণ প্রাকৃতিক তেলের আমদানি। ভারতে ৭৬৫ মিলিয়ন টনের মোট সম্ভাবনাময় তেলের ভাণ্ডার খুব দীর্ঘমেয়াদি আশ্বাস যোগায় না। ফলে বর্তমানে ব্যবহৃত পেট্রোলিয়াম পণ্যের দুই-তৃতীয়াংশই বিদেশের বাজার থেকে কিনে আনতে হয়।

কয়লার বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে সবচেয়ে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ

তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে জ্বালানি হিসেবে এর প্রয়োগ। ২০১১-১২ সালের একটা খতিয়ান দেখলে বোঝা যায় যে ভারতীয় কয়লার ৭২.০১%-ই ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ শিল্পে, অথবা ভারতবর্ষের উৎপাদিত বিদ্যুতের ৬০%-ই কয়লার অবদান।

ভারতবর্ষের কয়লার বাণিজ্যিক উত্তোলনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়, মাত্র ২৩০ বছরের বিচ্ছিন্ন কিছু প্রচেষ্টার ফসল। ভারতের ৭৭ শতাংশ কয়লাই প্রকৃতি বিছিয়ে রেখেছে দক্ষিণ-পূর্বে দেশের এক-চতুর্থাংশের মধ্যে, ৭৮°E লংগিটুড থেকে ২৪°N ল্যাটিটুড—এই সীমারেখার ভিতর। আর এই সঞ্চয়ের আনুমানিক বয়স ২২৫ থেকে ২৭০ মিলিয়ন বছর। হিমালয়ের পাদদেশের কিছু কয়লাখনি অঞ্চল বাদ দিলে অধিকাংশ কয়লাখনি অঞ্চলই ছড়িয়ে আছে নদীর অববাহিকা অঞ্চলে। দামোদর, কোয়েল, সোন, মহনদী, পেঞ্চকানহান, প্রাণহিটা, গোদাবরী প্রায় সমস্ত নদীর অববাহিকাই কয়লার স্তরে সম্পৃক্ত। দেশের মোট কয়লার ১৪ শতাংশই গুরুত্বপূর্ণ কোকিং কয়লা আর বাকি ৮৬ শতাংশ নন-কোকিং কয়লা, আর এই নন-কোকিং কয়লার ৭০ শতাংশই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহারযোগ্য।

১৭৫৭-তে পলাশির যুদ্ধজয়ের সূত্র ধরেই ইংরেজ বণিকদের বাংলায় অভিযান। ১৭৬৫-তে নবাব মিরকাশিম-এর কাছ থেকে দেওয়ানি লাভ করে। এক দিকে শুল্ক আদায় আর-এক দিকে শোষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের শুরু। বলা যায় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের হাত ধরেই এ দেশে কয়লার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু এবং তা প্রথম শুরু হয় এই রাজ্যেরই আসানসোলে। দলিল দস্তাবেজ ঘাটলে দেখা যায় ১১ আগস্ট ১৭৭৪, সুমের আর হিটলি সাহেব কয়লাখনি চালানো আর কয়লা বিক্রির অনুমতির জন্য আবেদন জানাচ্ছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রেসিডেন্ট ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কাছে। সাহেব যদিও প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করেছিলেন পাঞ্চেত আর বীরভূম, কিন্তু প্রথম কয়লাখনি চালু হয় আসানসোলের এথোরা অঞ্চলে—যা কিনা নিয়ামতপুর থেকে মাইল চারেক দূরে অবস্থিত। আবেদনপত্রের এক জায়গায় সুমের সাহেব লিখেছিলেন, স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সমস্ত বিবাদ এড়িয়ে চলা হবে।

স্থানীয় অধিবাসীরা কয়লার ব্যবহার জানত, যদিও বাণিজ্যিক কলাকৌশল তাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। মাইলের পর মাইল কয়লা স্তর ছুটে গেছে উদ্দাম খেয়ালে। কখনো প্রত্যন্ত অন্দরে আবার কখনো মাটির ওপরের স্তর ছুঁয়ে গেছে। স্থানীয় অধিবাসীরা যে কয়লার ব্যবহার জানত, ওয়াকিবহাল ছিল এর দাহিকা শক্তি সম্পর্কে, তার ইঙ্গিত রয়েছে স্থানীয় জায়গার নামের মধ্যে। বরাকর, দামোদর, অঙ্গারপাত্র, কালিপাহাড়ি, কঙ্কনী এই সমস্ত নামই দেবত্ব আরোপিত অগ্নির সমার্থক। খ্রিস্টের জন্মের ১০০০ থেকে ১১০০ বছর আগে, যজুর্বেদের সূত্রতে সূত্রতে রয়েছে 'হে অগ্নি, তুমি পৃথিবীর গর্ভরূপে এখন জাত হয়েছ।' কিংবা পৃথিবী খনন করে কয়লা ওঠানোর ফলে ক্ষত নিরাময়ের জন্য প্রাচীন অনুভূতিপ্রবণ ভারতীয়দের বিধান, 'মৃত্তিকা খননের ব্যথা অপনোদনের জন্য শীতল জলের দ্বারা সিক্ত করতে হবে, তা হলে পৃথিবীর খননজনিত শোক দূর হবে।' কিন্তু কয়লার ব্যবহার কয়লা অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—তার বাণিজ্যিক উত্তোলনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত, যখন প্রায় ১০০ টন কয়লা প্রথম পাঠানো হয় কোলকাতায় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য।

কিন্তু কয়লা পরীক্ষার ফলাফল খুব অনুকূল ছিল না, ফলে আরও ৪০ বছরের প্রতীক্ষা। পরিবহনের পরিকাঠামোর অভাব, পরিপূরক শিল্প গড়ে না ওঠার জন্য কয়লা খুঁজে পাওয়া যচ্ছিল না। ১৮১৪ সালে মারকুইস অব্ হেস্টিংসের আদেশে ভারতবর্ষে কয়লার ভাণ্ডার সম্পর্কে সমীক্ষা শুরু হল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা এই শিল্পে ১৮৪২ সালে মোট উৎপাদন ছিল ৫০,০০০ টন, কারণ কলকাতার বাজার ছিল প্রায় ২০০ কি.মি. দূরে—যা ধরার জন্য গরুর গাড়ি আর নৌকা ছিল একমাত্র অবলম্বন। কয়লা শিল্পের উল্লেখযোগ্য দিক্ পরিবর্তন লক্ষ করা যায় ১৮৫৫ সালের পর থেকে, যখন কলকাতা থেকে ১২০ মাইল রেলের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়। এর থেকে, এরকম একটা সিদ্ধান্তে আমরা আসতেই পারি যে সম্ভাবনা থাকলেই কোনো শিল্প বেঁচে থাকতে পারে না; অনুসারী শিল্প, বাজার আর পরিকাঠামোর মধ্যে থাকে সে শিল্পের প্রাণ-ভোমরা।

এই কয়লা শিল্পে সর্বপ্রথম ভারতীয় ব্যবসায়ী হিসেবে আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে। ১৮৩৫ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর কিনে নিলেন সাহেবদের কোম্পানি, 'আলেকজান্ডার অ্যান্ড কোম্পানি'-কে, শুরু করলেন 'কার ট্যাগোর অ্যান্ড কোম্পানি'-র নতুন উদ্যোগ চিনাকুড়িকে কেন্দ্র করে। ১৮৪৩ সালে 'কার ট্যাগোর অ্যান্ড কোম্পানি' জুড়ে নিল 'গিলমোড়-হমফ্রে অ্যান্ড কোম্পানি'-কে আর নতুন নাম নিল 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি লিমিটেড', যা কয়লা শিল্পের ইতিহাসে কোনো ভারতীয় ব্যক্তিত্বের পদচারণা হিসেবে গণ্য হয়—পরাধীন রাষ্ট্রে যে-কোনো জাতির পক্ষে যা অত্যন্ত গৌরবময় ঘটনা।

কয়লা শিল্প দুর্ঘটনাপ্রবণ শিল্প—সামান্য ভুল, অসর্তকতা টেনে আনে বিপর্যয়, প্রাণহানি। এই ২৩০ বছরের দীর্ঘ পথে প্রথম বিপর্যয়ের লিখিত ইতিহাস পাই ২৪ ডিসেম্বর ১৮৬৪, যখন রানিগঞ্জ কয়লাখনি অসর্তক অসংহতভাবে কয়লা তোলার প্রথম মূল্য দিল। এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে রানিগঞ্জ কয়লা অঞ্চলের বিশাল অংশ বসে গেল—ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা ভাবিয়ে তুললো ব্রিটিশ প্রভুদেরও। বিশেষজ্ঞ ড. ওল্ডহ্যাম নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আবশ্যকীয় করে নিতে মতামত দিলেন। খনির ভিতরের প্ল্যান, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কয়লা কাটা আর নিরাপত্তা ধীরে ধীরে অনুসরণ করা হতে লাগলো ১৮৬৫ সালের পর থেকে।

শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের শরিক হিসেবে ভাবতে ইচ্ছা করে সেই সময়কার শ্রমিকদের অসহনীয় অবস্থার কথা। কয়লাখনির শ্রমিকরা ছিল সাধারণত ভূমিহীন কৃষক, বাঁচার তাগিদে অমানবিক অবস্থায় কাজ করতে বাধ্য হতো। ১৯৩৭ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল স্পিচ থেকে জানা যায় পরিবারকে বহুদূরে রেখে এসে অধিকাংশ শ্রমিকই অস্বাস্থ্যকর গরুবাছুরের জীবনযাপন করত রুটির জন্য। বাইরের পৃথিবীর মুক্ত বাতাস ফেলে মাটির নিচে বদ্ধ দম আটকানো পরিবেশে রোজ ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় কাটাতো। মনে রাখতে হবে কয়লা কাটা থেকে তোলা সবটাই সেই যুগে ছিল দৈহিক। কখনো কখনো সপরিবারে খাবার বিছানা ইত্যাদি সব নিয়ে শ্রমিকের দল খনির নিচে নেমে যেত বাড়তি রোজগারের আশায়। এরকমও দেখা গেছে খাদের নিচে ভূমিষ্ঠ সন্তান বড় হয়ে, কয়লাখনিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম কয়লা উঠিয়ে চলেছে।

খনি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার অবিচার নিগ্রহ মিথে পরিণত হয়েছে। একদিকে হাতে মারা, অন্যদিকে ভাতে। মাস্‌লম্যানদের দিয়ে মস্তানি চাবুকের ঘায়ে সোজা করা, শারীরিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মেরে চানকে ফেলে দেওয়া ছিল সাধারণ ঘটনা। ভাতে মারার কর্মসূচির রকমফের ছিল।

মাইনের কারচুপি, এর মধ্যে কোনো গোপনীয়তা ছিল না। মাইনের অর্ধেক দেওয়া হতো হাতে। অথচ মাস্টাররোলে পুরো মাইনে সই করিয়ে নেওয়া হতো। তার উপর চাকরির অনিশ্চয়তা। নিয়ম অনুযায়ী এক নির্দিষ্ট সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ থাকলে তাকে স্থায়ী কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়া হয়। সেটি ফাঁকি দেওয়ার জন্য একটি

নির্দিষ্ট সময় পর বসিয়ে দেওয়া হতো। কিছু সময় পর আবার চাকরিতে বহাল করা হতো।

বিধিবদ্ধ শর্তগুলিতে তঞ্চকতা। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা মাইনে থেকে কাটা হলেও তা কমিশনের অফিসে জমা পড়ত না। মালিকপক্ষের প্রদেয় টাকাও স্বভাবতই আত্মসাৎ করা হতো। গ্র্যাচুইটির নাম করে সামান্য অর্থ অবসৃত কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হতো। সরকারি বরাদ্দ তছরূপ, শ্রমিকদের উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণের জন্য ভর্তুকির টাকা, স্কুলগৃহ নির্মাণ, ক্রীড়া ও বিনোদন সংক্রান্ত বরাদ্দ অর্থ আত্মসাৎ করা হতো। এছাড়াও অপ্রত্যক্ষ কিছু শোষণও আমাদের নজরে আসে।

চটজলদি মজুর সংগ্রহের জন্য উত্তরপ্রদেশের প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছিল। সি.আর.ও. বা Coal field Recruiting Organisation-এর মারফৎ উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল থেকে মজুর সংগ্রহ করে কোলিয়ারিতে পাঠানো হতো। এই মজুরদের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো ক্রীতদাসের মতো। রেলের ওয়াগনে গরু-মোষের মতো তাদেরকে নিয়ে আসা হতো। রাখা হতো বন্দিশিবিরের মতো অস্থায়ী ক্যাম্পে। কাজ করানো হতো শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। ১৯৪৫-এ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এই প্রথা চালু ছিল।

কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে ভয়ঙ্কর অসন্তোষ দেখা দিতে শুরু করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। শোষক এবং শাসকের নিষ্ঠুর সংহতি যখন মানুষকে ভুলিয়ে দেয় যে সে মানুষ তখনই আন্দোলন দানা বাঁধে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন চেহারা নেয় ১৯২০ সালে যখন ইন্ডিয়ান কোলিয়ারি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় ধানবাদকে কেন্দ্র করে। শ্রমিকদের এই আন্দোলন আর সংগঠন গড়ে তোলার কাজ মোটেই মসৃণ ছিল না। ১৯২১ সালের বার্ষিক সভার আগে শোষকের নির্দেশে নিরাপত্তারক্ষীরা ছুটে গিয়েছিল কয়লাখনির আনাচে কানাচে। চাকুরিচ্ছেদ থেকে আরম্ভ করে শুরু হয় সমস্তরকম দমননীতি, কিন্তু শ্রমিকদের ঐক্যের কাছে পরাস্ত হয় কয়লাখনির মালিকের দল—একের পর এক কয়লাখনি আন্দোলনে স্তব্ধ হতে থাকে। শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধি করতে বাধ্য হয় মালিকেরা।

আন্দোলনের গভীরতা অনুধাবন করে সরকার তদানীন্তন লেবার সেক্রেটারি বিষ্ণু সহায়কে তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব অর্পণ করে। বিষ্ণু সহায় ১৯৫৪ সালে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন এবং সুপারিশ করেন যে—

১. শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে বাঁচবার সুযোগ দিতে হবে।

২. এদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না।

৩. অপরের সঙ্গে মেলামেশা করার অথবা ইচ্ছামত ঘুরে ফিরে বেড়ানোর ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না।

৪. চাকুরির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

৫. মজুরদের ন্যূনতম সুবিধা দিতে হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে আলাদা আলাদা মঞ্চে সংগঠিত হতে থাকে। কিন্তু সব ইউনিয়নই শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার তাগিদে কিছুটা হলেও অনুভব করে—মানুষ যেন মানুষ হিসেবেই কাজ করে, দাস হিসেবে নয়। এরই পরিণামে ১৯৫৪ সালে দেখতে পাই স্বাধীন ভারতে শিল্প ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে জে.এন. মজুমদারের নেতৃত্বে—খনি শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়নের চেষ্টায়। কয়লাখনি শ্রমিকদের জন্য ভারত সরকার সর্বপ্রথম সেন্ট্রাল ওয়েজ বোর্ড গঠন করলেন ১৯৬২ সালের অগস্ট মাসে আর সেন্ট্রাল ওয়েজ বোর্ডের নির্দেশিকা পুরোপুরি কাজে পরিণত হয়ে গেল ১৯৬৭ সালের ১৫ অগস্ট। ভারতে কয়লাশিল্পের শ্রমিকরা ধীরে ধীরে তাদের মানবিক সত্তা ফিরে পেতে লাগল। কয়লা যে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ, ভারতবর্ষের বিশ্ববাজারে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রাণভোমরা, সেটা ১৯২০-র পর থেকে বিভিন্ন কমিটি রিপোর্টেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। পরাধীন ভারতবর্ষে রিজ সাহেব তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছিলেন ব্যবসায়ীদের তাৎক্ষণিক মুনাফা লাভের আশায় দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কয়লার ভাঁড়ার অনন্ত নয়, রাষ্ট্রের অধিকার আছে হস্তক্ষেপ করার। কোল মাইনিং কমিটি ১৯৩৭ সালেও কয়লা মালিকদের ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি কটাক্ষ করেছিল। চেয়ারম্যান বারো সাহেব কয়লাখনিতে বিস্ফোরণ, প্লাবন, ধ্বস, আগুন ইত্যাদির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে জনস্বার্থে কয়লার সংরক্ষণের ওপর জোর দিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালে মহিন্দ্রা কমিটিও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিল ভাল কয়লার ব্যবহার শুধুমাত্র ইস্পাত শিল্পেই সীমাবদ্ধ হোক। বাংলা ও বিহারের কয়লার উদ্যোগগুলি ক্ষতিকারক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে, তাই খনিজ সম্পদের অধিকার রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করুক।

স্বাধীন ভারতেও সরকার সিদ্ধান্ত নিতে নিতে কাটিয়ে দিল প্রায় ২৫ বছর। লোকসভাতেও ১৯৫৪-৫৫ সালে এস্টিমেট কমিটি সমস্ত এজেন্সি রিপোর্ট এককাট্টা করেছিল কয়লাখনির বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়নে। এর মধ্যে কোল কমিশনারের সাক্ষ্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। কমিশনার লিখিত বিবৃতিতে বলেছিলেন, জাতীয়করণ ২৫ বছর পিছিয়ে দিলে খুব অল্পই কয়লা অবশিষ্ট থাকবে উত্তোলনের জন্য। সেদিন বেশ কিছু কয়লাখনি হয়ত অবশিষ্ট থাকবে যেখানে খাদে তখনো আগুন অথবা বিপর্যয় ঘটেনি, কিন্তু সেইসব খাদে কয়লা উত্তোলন লাভজনক করা কঠিন হবে।

জাতীয়করণের পুরোধা ছিলেন তৎকালীন খনি ও ইস্পাত মন্ত্রী এস. মোহন কুমারমঙ্গলম। 'কোল ইন্ড্রাস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া' বইতে তিনি রানিগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা অঞ্চলের এক বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র এঁকেছিলেন। তীব্র ভাষায় কোনো রাখঢাক না করে লিখেছিলেন, শ্রমিকদের প্রাপ্য পাওনা থেকে ঠকানো হচ্ছে। অবৈজ্ঞানিকভাবে যেভাবে খুশি কয়লা উত্তোলন, সংরক্ষণকে গ্রাহ্য না করা, বর্তমান কয়লাশিল্পের চরিত্র, লেঠেল আর মস্তান দিয়ে মালিকদের স্বার্থরক্ষা করা, দুর্নীতি, জাল তথ্য, উৎপাদনকে কম করে দেখানো, পুরো মাইনে না দেওয়া, শ্রমিকদের দীর্ঘ শিফ্‌টে বেআইনি কাজ করানো, নিরাপত্তা ব্যবস্থার তোয়াক্কা না করা—এসবকেই তিনি প্রাইভেট কোলিয়ারিগুলির বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।

এরই অনিবার্য ফল ও পরিণতি হল কয়লাশিল্পের জাতীয়করণ। জাতীয়করণও হল মোট দুভাগে। ১৯৭১ সালের ১৬ অক্টোবর ইস্পাত শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য সমস্ত কোকিং কোল সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হল। আর এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ হল ১ মে ১৯৭২ সালে ভারত কোকিং কোল কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু ভারত কোকিং কোল কোম্পানি ভারত-এ তখন একমাত্র রাষ্ট্রয়ত্ত কয়লা কোম্পানি নয়। এর বহু আগেই সরকার কয়লাশিল্পে প্রত্যক্ষভাবে পা রেখেছে দুটি কয়লা কোম্পানির মাধ্যমে—ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন আর সিঙ্গরোলি কোলিয়ারিস কোম্পানি লিমিটেড তখন পুরোদস্তুর কাজ করে চলেছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে হায়দ্রাবাদের নিজামের অভিভাবকত্বে নিজামের রেল কোম্পনির চাহিদা মেটাতে ১৯২১ সালে নিজাম সরকার সিঙ্গরোলি কোলিয়ারিস কোম্পানি লিমিটেড গঠন করেন। ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর রেলের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে তৈরি ১১টা কয়লাখনি নিয়ে। ১৯৫৬-৫৭ আর ৫৭-৫৮-র পরিসংখ্যান দেখলে বুঝতে পারা যায় এই দুটি কোম্পানির কয়লা উৎপাদনে মোটামুটি ধারাবাহিকতা

ছিল। দেশের মোট উৎপাদনের ১১.১০% আর ১১.৭৮% যথাক্রমে এই দুটি কোম্পানির এই দুই বছরের অবদান। ফলে ভারত সরকার বেশ আস্থার সঙ্গেই কোকিং কয়লাকে জাতীয়করণ করেছিল।

কিন্তু কয়লাশিল্পের বাকি অংশ অর্থাৎ নন-কোকিং কয়লা ক্ষেত্র মাইনের ক্ষেত্রে সুবিচারের দাবিতে অশান্ত হয়ে উঠল। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয়করণের দাবিতে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন যৌথভাবে ধর্মঘটের মাধ্যমে আন্দোলন আরম্ভ করল। অবশেষে ১৯৭৩ সালের ৩০ জানুয়ারি রাষ্ট্র নন-কোকিং কয়লাকেও অধিগ্রহণ করল। ১ মে ১৯৭৩ গঠিত হল কোল মাইন্স অথরিটি লিমিটেড। সারা ভারতের কয়লাশিল্পকে ক্রিয়াশীল করতে ১ নভেম্বর ১৯৭৫-এ তৈরি হল কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, আর তার সহযোগী কোম্পানিগুলো হল—

১. ইস্টার্ন কোল ফিল্ড্স্ লিমিটেড (E.C.L)
২. ভারত কোকিং কোল লিমিটেড (B.C.C.L)
৩. সেন্ট্রাল কোল ফিল্ড্স্ লিমিটেড (C.C.L)
৪. ওয়েস্টার্ন কোল ফিল্ড্স্ লিমিটেড (W.C.L)
৫. সেন্ট্রাল মাইন প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন ইন্সাটিটিউট লিমিটেড (C.M.P.D.I.L)

পরবর্তীকালে কয়লাক্ষেত্রকে সংগঠিত রূপ দেবার জন্য আরও চারটি কোম্পানি তৈরি হয়। সেগুলি হল—

৬. নর্দান কোল ফিল্ড্স্ লিমিটেড (N.C.L)
৭. মহানদী কোল ফিল্ড্স্ লিমিটেড (M.C.L)
৮. নর্থ-ইস্টার্ন কোল ফিল্ড্স্ লিমিটেড (N.E.C.L)
৯. সাউথ-ইস্টার্ন কোল ফিল্ড্স্ লিমিটেড (S.E.C.L)

হিসেবের খাতায় চোখ রাখলে দেখতে পাব ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮.৩ বিলিয়ন টন কয়লার ভাণ্ডার শেষ—এই ৮.৩ বিলিয়ন টনের মধ্যে যেমন আছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উত্তোলিত কয়লা তেমনি আছে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে উত্তোলিত কয়লাও।

কয়লার মজুত, তার উত্তোলন সবই আছে রাষ্ট্রের হাতে—কয়লা নির্ভর সমস্ত শিল্পেরই স্বাস্থ্য আজ অনেকটাই নিশ্চিত। প্রথমেই এক নজরে দেখা যেতে পারে কারা কারা কয়লার আগামী দিনেও ক্রেতা থাকবে।

(হিসাব মিলিয়ন টনে)

	২০০৬-০৭	২০১১-১২
ইস্পাত শিল্প	৩৯.৬৬	৪০.১২
বিদ্যুৎ (সাধারণ)	৩৩৮.৬১	৩১২.০৭
বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ)		৩২.০০
সিমেন্ট	২১.৬৮	২৬.৬৯
অন্যান্য	৪৮.১০	১০৭.২৮
মোট	**৪৪৮.০৫**	**৫১৮.১৬**

আর একই সময়ে কয়লা উৎপাদনের সম্ভাবনার তথ্য সাজালে ছবিটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে—

(হিসাব মিলিয়ন টনে)

	২০০৬-০৭	২০১১-১২
কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড	৩৫০.০০	৪৫২.০০
সিঙ্গরোলি কোল কোং লি.	৩৬.১৩	৩৫.০০
টিসকো/ইসকো/ডি.ভি.সি.	১৮.৮৭	৩৫.০০
মোট	**৪০৫.০০**	**৫২২.০০**

উৎপাদন ও চাহিদার তুলনামূলক তথ্যকে এক নজরে দেখলেই চাহিদা এবং যোগনের অসামঞ্জস্য নজরে পড়বে।

(হিসাব মিলিয়ন টনে)

	২০০৬-০৭	২০১১-১২
মোট চাহিদা	৪৪৮.০৫	৬২০.০০
মোট যোগানের সম্ভাবনা	৪০৫.০০	৫১৫.০০
চাহিদা যোগানের ফারাক	৪৩.০৫	১০৫.০০

অতএব ভরতের অন্যান্য শিল্পের বৃদ্ধির হার সুনিশ্চিত করতে দেশের বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। এই ফারাককে সময়ের সাথে সাথে কমিয়ে আনতেই হবে।

বিকল্প ভাবনার মধ্যে একসময় চিন্তা করা হয়েছিল যদি চাহিদার পরিমাণ কমিয়ে এনে কিছুটা ভারসাম্য রক্ষা করা যায় আগামী দিনে। কিন্তু আগের তথ্য থেকে পরিষ্কার কয়লার বেশির ভাগটাই যাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। বিদ্যুতের চাহিদা অনিবার্য, ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামে আলো জ্বালাতে কিংবা শিল্পের গতি বাড়াতে যে শর্তের কথা প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে সেটি হল বিদ্যুতের যোগান। এক নজরে দেখি অষ্টম পরিকল্পনার শেষ বছর ৯৬-৯৭ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজিত হয়েছিল ১০,৩৮০ মেগাওয়াট, কিন্তু নবম পরিকল্পনার শেষে ২০০১-০২ সালে মোট সংযোজনের পরিমাণ ৭,১৭০ মেগাওয়াট। দশম, একাদশ আর দ্বাদশ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা দেখতে পাই যথাক্রমে ১৬,০০০ মেগাওয়াট, ১২,০০০ মেগাওয়াট আর ১৫,০০০ মেগাওয়াট। কয়লা উৎপাদনের উৎকর্ষ ও বিকল্প পদ্ধতি, চাহিদামত যোগানের ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করতে পারে আগামীদিনে।

কয়লার মোট ভাণ্ডার, আগেই বলেছি, পরিসংখ্যান অনুসারে ২২০.৯৮ বিলিয়ন টন ধরা হয়েছে। কয়লাস্তরের গভীরতা অনুসারে সাজালে দেখা যাবে মাটি থেকে ৩০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে ১৩৯.১০ বিলিয়ন টন, ৩০০ থেকে ৬০০ মিটারের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে ৫২.৭০ বিলিয়ন টন, আর ৬০০ থেকে ১২০০ মিটারের মধ্যে আছে ১৪.৯৭ বিলিয়ন টন। ঝরিয়া কোলফিল্ডে ৬০০ মিটার নাগালের মধ্যেই আছে ১৪.২১ বিলিয়ন টন। মাটির তলায় ৩০০ মিটারের মধ্যে সঞ্চিত ভারতীয় কয়লা আগামীদিনে বিশেষজ্ঞদের অনেকটাই আশ্বাস দেবে।

বর্তমান কয়লা উৎপাদন পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মোট উৎপাদিত কয়লার সিংহভাগটাই আসে খোলামুখ (Open cast) কয়লাখনিগুলো থেকে। ৯০-৯১ সালে যেখানে খোলামুখ খনির অবদান ছিল ৭০.৪২%, ২০১১-১২ সালে সেটা এসে দাঁড়ায় ৮১.১১%। খোলামুখ খনির উৎপাদনের মোট পরিমাণ ৩৯৭.৪৫ মেট্রিক টন, যেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড খনির উৎপাদনের মোট পরিমাণ ৩৮.৩৯ মেট্রিক টন। তাই অল্প গভীরতার খোলামুখের খনিগুলো সাফল্যের চাবিকাঠি হতে পারে।

কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের একটি কোম্পানি ইস্টার্ন কোল ফিল্ড্স্ লিমিটেডও ২০০২-০৩ সালে নিজেদের লক্ষ্যমাত্রা ২৯ মিলিয়ন টন উৎপাদন করতে পারেনি। এরা ওই সময় করেছে ২৭.১৮ মিলিয়ন টন, লক্ষ্য থেকে ১.৮২ মিলিয়ন টন কম। আরও দুঃখের জিনিস ওভারঅল প্রোডাক্টিভিটি-র ঘাটতি। ২০০২-০৩ সালে যেখানে খোলামুখ আর আন্ডারগ্রাউন্ড খনির ওভারঅল প্রোডাক্টিভিটি-র লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১.০৯ মিলিয়ন টন, সেখানে ই.সি.এল. ছুঁতে পেরেছে ১,০৩ মিলিয়ন টন। ঠিক অনুরূপভাবে ২০০২-০৩ সালে আগের সাল থেকে ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে গেছে ৬১.১৪ কোটি টাকা। রাষ্ট্র কড়া দাওয়াই প্রয়োগ করে লাভের মুখ দেখেছে। কড়া দাওয়াইয়ের মূল বিষয়বস্তুটিই হল প্যাচ ও কয়লার ব্লক বন্টন। এর ফলেই লাভের অঙ্কের মুখ দেখছে। ২০১০-১১-এ লাভ হয়েছিল ৭,১৩৯ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে লভ্যাংশ

বৃদ্ধি হয়েছে। মূল অংশে ই.সি.এল. লাভ করলেও ঠিকা শ্রমিক বা সংশ্লিষ্ট অংশের শ্রমিকদের মজুরি মানের অনুন্নয়ন একটি স্থায়ী প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। একই ধরনের শ্রমদানের ফলে স্থায়ী কর্মচারীর মজুরির মানের সঙ্গে উক্ত ঠিকা শ্রমিকদের মজুরির তারতম্য একটি বিশেষ প্রশ্নের উদ্রেক করে।

কোলিয়ারিশিল্পের প্রাথমিক পর্বে শ্রমিকদের শোষণের মাত্রা যে পর্যায়ে ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে সেই পুরনো ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এই মুহূর্তে স্থায়ী কর্মচারীদের পক্ষ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন উক্ত শ্রমিকদের প্রশ্নে গুরুতর আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ না করলে ভবিষ্যতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের আমদানি ঘটবে না এক্ষেত্রে জোর দিয়ে বলা যায় না। যাদের পরিশ্রম ও যে নীতির ফলশ্রুতিতে আজ ই.সি.এল. কর্তৃপক্ষ লাভের মুখ দেখছে, সেই সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের মজুরির প্রশ্নে, স্বাস্থ্যবিধির প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। বর্তমান বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় একাজ করবে মনে করার কোনো কারণ নেই। এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলির যুক্ত আন্দোলনের ধারায় আন্দোলনের রূপে যান্ত্রিকতা অপেক্ষা কিছু আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রচেষ্টা নেওয়া জরুরি ছিল।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ১৯৯০-৯১ সালে মোট উৎপাদনে খোলামুখ খনির অবদান ছিল ৭০.৪২%। ২০০১ সালে সেটা দাঁড়ায় ৮১.১১%। বর্তমান হিসেব অনুসারে খোলামুখ খনির মোট উৎপাদন ৩৯৭.৪৫ এম.টি., যেখানে আন্ডারগ্রাউন্ডের উৎপাদন ৩৮.৮৯ এম.টি। এখানেই লুকিয়ে আছে ই.সি.এল.-এর মূল উৎপাদন বৃদ্ধি ও তাকে লাভজনক করার চাবিকাঠি।

খোলামুখ কয়লাখনিগুলিতে, বর্তমানে, রাষ্ট্রের খবরদারিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১১-১২ সালের একটা পরিসংখ্যানে দেখতে পাই কোল ইন্ডিয়া বিভিন্ন খোলামুখ খনিতে ব্যবহারের জন্য কাজে লাগিয়েছে রিয়ার ডাম্পার ৩২৩২ টা, ড্রোজার ১০৮০ টা, ড্রিল ৯৪১ টা, ফ্রস্ট অ্যান্ড লোডার ২০৪ টা, হাইড্রলিক সভেল ৪৬২ টা, রোপ সভেল ৩৬২ টা আর ড্র্যাগলাইন্স্ ৪১ টা। কিন্তু ২০১১-১২ সালের পরিসংখ্যানে ১৫১ টা খোলামুখখনির মোট উৎপাদন ৩৯৮ মিলিয়ন টন সান্ত্বনা দিলেও, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আমাদের চমকে দেয়। মোট উৎপাদনের ৪৬%-ই দিয়েছে মাত্র ১২ টা খোলামুখ কোলিয়ারি, ৩৪% এসেছে ৩৪ টা খনি থেকে আর মাত্র ২০% দিয়েছে বাকি ১০৫ টা কয়লাখনি। এই তথ্য থেকে পরিষ্কার আত্মতুষ্টির সুযোগে দেশের ১২ টা খনিকে বহন করতে হয়েছে ১০৫ টা কয়লাখনিকে, যেখানে এখনই নজর দেওয়া দরকার বিশেষজ্ঞ মহলের।

শিল্পের কর্ণধারদের একমাত্র সত্য বুঝিয়ে দিতে হবে—আমজনতার টাকায় যে-কোনো শৌখিন উদ্যোগের ব্যর্থতার দায় তাদেরই, একমাত্র তাদেরই, কোনো অজুহাতই রাষ্ট্র আর বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

মাটি খুঁড়ে কয়লা তুলতে গেলে টাকা লাগে, বিশাল উৎপাদনে বিশাল অর্থভাণ্ডার। কোল ইন্ডিয়ার একটি মাত্র কোম্পানি ই.সি.এল. ২০০২-০৩ সালে ২৭.১৮ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করেছে ৮,০৫৯ কোটি টাকার অ্যাসেটকে কাজে লাগিয়ে। ২০০৩ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত মূলধন বাড়তি লাগবে খালি ই.সি.এল-এরই ২,৯৫৬.৮৩ কোটি টাকা। রাষ্ট্রের পক্ষে করদাতাদের পকেটে বোঝা চাপিয়ে আগামী দিনে এর সংস্থান করা অসম্ভব ও অমানবিক। অন্যদিকে আগামীদিনে কয়লার চাহিদা আর যোগানের ভারসাম্যহীনতা ২০১১-১২ সালে দাঁড়াবে মোটামুটিভাবে ১০৫ মিলিয়ন টন।

এই দুইয়ের টানাপোড়েনে আগামী দিনে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সামিল করার কথা ভাবা হচ্ছে, যাতে কয়লার যোগান আর নতুন মূলধন আগামী দিনে দুটোরই সুরাহা করা যায়। সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখতে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার বলয়ে বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তাভাবনা শুরু হয়। প্রথমেই আসে ড্রাই ওয়েট লিজিং-এর বিকল্প। যেখানে খোলামুখ খনির মাধ্যমে ছোটো ছোটো কয়লা সঞ্চয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগকে কোল ইন্ডিয়ার নিয়ন্ত্রণে অনুমতি দেওয়া হবে। এতে মূলধন-এর যোগান ব্যক্তিগত উদ্যোগের কাছ থেকে আসবে। রাষ্ট্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ অক্ষুন্ন থাকবে অথচ উৎপাদন ও চাহিদার গ্যাপ কমানো যাবে।

দ্বিতীয় আর একটি সম্ভাবনার কথাও ভাবা হয়েছে—বিল্ড অপারেট অ্যান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতি (বি.ও.টি.)—যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নতুন কয়লাখনি তৈরি করবে, নিজস্ব মূলধন না লাগিয়েও কোল ইন্ডিয়া নতুন কয়লাস্তরে নিজেকে সম্প্রসারিত করতে পারবে।

তৃতীয় যে আর একটি সম্ভাবনা সেটি হল জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি, যেখানে ভারতের অন্যান্য কয়লা ব্যবহারকারী কোম্পানিগুলো যেমন এন.টি.পি.সি. ইত্যাদি অংশগ্রহণ করবে যৌথ উদ্যোগে। সেন্ট্রাল কোলফিল্ডসের আম্রপালি আর কয়লাখনিকে ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এইরকম যৌথ উদ্যোগের জন্য।

কয়লাশিল্প দুর্ঘটনাপ্রবণ শিল্প। সমস্ত কয়লাশিল্পে ৯৬ সাল থেকে ২০০০—এই পাঁচ বছরে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা যথাক্রমে ১০৮, ১১১, ১০৪, ১০৩ ও ৯৯ জন। অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় শতাধিক অমূল্য প্রাণ ঝরে গেছে কয়লা উত্তোলনের সাথে সাথে। গুরুতর আহতের সংখ্যা এই একই বছরগুলিতে যথাক্রমে ৪৬৯, ৫১৯, ৪৩৩, ৪৪৭, ৪৭১ জন। আর ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭২ সাল অর্থাৎ অধিগ্রহণের সময় পর্যন্ত প্রতি বছর ছিল ২০০ থেকে ৩০০ জন। অর্থাৎ নিহতের সংখ্যা এই যে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া এটি নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের একটি বিশেষ সাফল্য। অন্যান্য পরিসংখ্যানেও সেটা প্রকট হয়ে উঠেছে। ২০১১ সালের পরিসংখ্যানে লক্ষ করা যায়—

	দুর্ঘটনা	মৃত	গুরুতর দুর্ঘটনা	গুরুতর আহত
ই.সি.এল	৭	৭	৩৫	৩৮
বি.সি.সি.এল.	৭	৮	৩৩	৩৮
সি.সি.এল.	৬	৬	১৪	১৪
এন.সি.এল.	৪	৪	০৫	০৬
ডাবলু.সি.এল.	১০	১০	৪০	৪৪
এস.ই.সি.এল.	১৪	১৪	৩৮	৩৯
এম.সি.এল.	০৫	০৫	০৮	০৮
এন.ই.সি.	০২	০২	০০	০০
সি.আই.এল.	৫৫	৫৬	১৭৩	১৮৭
এস.সি.সি.এল.	০৮	০৮	৩১৮	৩১৯
এন.এল.সি.	০২	০৩	০৪	০৫

পাঁচ লাখের ওপর শ্রমিক কর্মচারীর কল্যাণে জাতীয়করণের আগে আর পরে পাওয়া পরিসংখ্যান সাজালে দেখতে পাবো মূলত স্বাস্থ্য, পানীয় জল আবাস খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। মানুষ পেয়েছে মানুষের মূল্য। ১৯৭২-৭৩ সালে যেখানে মোট মাথা গোঁজার জায়গা ছিল ১,১৮,৩৬৬, ২০০১ সালে সেটা হয়েছে ৪,০৬,৮১২—প্রায় ৪ গুণ মানুষ এতে উপকৃত। প্রায় ২৩,১৬,৬৭৩ জন মানুষের জলের বন্দোবস্ত আর ১৮১৮ জন চিকিৎসক, সেই সাথে হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি কয়লা শিল্পের মুখ অনেক মানবিক করে তুলেছে। এখন আবার নূতন করে অমানবিক ব্যবস্থার পত্তন শুরু

হয়েছে। কোলিয়ারির অধিকাংশ ডিস্পেনসারি এবং হাসপাতাল থাকলেও অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এখানে কার্যত রোগী এবং রোগীর পরিবাররা যান না বললেই চলে, কারণ পরিষেবা নেই। ন্যূনতম বেতন যেখানে ছিল ১৯৭৪ সালে ৩২৫ টাকা প্রতি মাসে, ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৬৮৯ টাকা প্রতি মাসে। প্রায় ১,২৫৬ টা শিক্ষাকেন্দ্র আজ কয়লাশিল্পের অনুদানে উপকৃত। শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতিনিধি হিসেবে পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়ন যেমন সিটু, আই.এন.টি.ইউ.সি., এ.আই.টি.ইউ.সি., বি.এম.এস., এইচ.এম.এস. প্রত্যক্ষভাবে কয়লাশিল্পের পরিচালন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করছে অ্যাপেক্স জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিটির মাধ্যমে। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পালাবদলের দিনে কয়লাশিল্পের ভবিষ্যত যেমন নীতিনির্ধারণ, শ্রমিক কল্যাণ ইত্যাদি আজ কয়লা বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ আর জনপ্রতিনিধিদের সম্মিলিত ভাবনায় স্থির হয়, কোনো বেনিয়ার চটজলদি মুনাফার দর্পণে নয়।

কয়লা শিল্পের একটি অন্ধকার দিকের সূচনা হয়েছে বে-আইনি খননের মাধ্যমে, যার পরিণতিতে চোখে পড়ে সাইকেল কয়লা। খোলামুখ কোলিয়ারির মাটি ছোটো ছোটো পাহাড়ের চেহারা নিয়েছে। গ্যাস, ধূলো আর কয়লার দূষণে আকাশও এখানে ধূসর, মাটিতে সবুজের চিহ্ন নেই। এর উপর দিয়েই ওরা চলেছে, কয়লা ভর্তি বস্তা নিয়ে ওরা সাইকেল টানতে টানতে এগিয়ে চলে। কয়লার ভারে শরীর নুইয়ে পড়েছে। তবুও যেতে হবে। ঝরিয়া-রানিগঞ্জ কোলিয়ারি অঞ্চলে সাইকেলে কয়লা নিয়ে যাবার দৃশ্য স্থানীয় মানুষদের গা সওয়া হয়ে গেছে।

খনি থেকে প্রতিদিন অবৈধভাবে যে কয়লা বাইরে পাচার হয় তারই একটি অংশ হলো এইভাবে সাইকেলে কয়লা পরিবহণ। কয়লা চুরির মোট হিসেবে এই পরিমাণ ক্ষুদ্র হলেও সব মিলিয়ে কম নয়। শুধু ই.সি.এল. এলাকায় আনুমানিক ৩৩,০০০ সাইকেল প্রতিদিন কয়লা আনতে কাজে লাগানো হয়। এক একটি সাইকেল প্রায় ২০০ কে.জি. কাঁচা কয়লা বহন করে। এই হিসেবে প্রতিদিন প্রায় ২.৫ এম.টি. কয়লা অবৈধভাবে পাচার হচ্ছে। অর্থাৎ সারা দেশে প্রতিদিন যত কয়লা উত্তোলন করা হয় শতকরা হিসেবে তার ১ শতাংশ। শতাংশের হিসেবে কম হলেও মোট পরিমাণটা ছোটোখাটো একটা খনিতে প্রতিদিন যে উৎপাদন হয় প্রায় তার সমান।

এই কয়লা আসে কোথা থেকে?

১. গ্রামবাসীদের খোঁড়া অগভীর খনি—

(ক) মাফিয়ারা সরাসরি মেশিন দ্বারা কয়লা উত্তোলন করে ট্রাকে করে পাচার করছে।

(খ) খাদান থেকে কয়লা ঠিকাদারেরা ট্রাকে করে ই.সি.এল.-এর সাইডিং-এ না পাঠিয়ে মাফিয়ার সাইডিং-এ পাঠাচ্ছে।

২. পরিত্যক্ত গ্যাস ও জলে ভরা সরকারি খাদান।

৩. সরকারি খনি থেকে অবৈধভাবে বার করা কয়লা।

৪. ইচ্ছাকৃত ভাবে ট্রাক থেকে ফেলা কয়লা।

১. সাধারণভাবে বেসরকারি জমিতেই এই খননকার্য চালানো হয়। ই.সি.এল.-এর জমিতেও অর্থাৎ লিজ হোল্ড (Lease Hold) এরিয়াতেও খননকার্য হয়। মূলত সালানপুর, জামুড়িয়া এবং বারাবণী এলাকাতেও ব্যাপকভাবে হয়। ই.সি.এল.-এর জমিতেও মাফিয়ারা নিজস্ব যন্ত্রপাতি ও মেশিনারির মাধ্যমে পরিত্যক্ত বন্ধ খনিগুলি থেকেও প্রশাসনের সামনে দিনের পর দিন কয়লা উত্তোলন করে তা সরবরাহ করছে। কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা দেখিয়েছে। মাটিতে ছোটো ছোটো গর্ত করে ১০-১৫ মিটার গভীরতায় ২০০ মিটার এলাকা জুড়ে কয়লা তোলার কাজ চলে। ছোটো গাঁইতি কোদাল দিয়ে কয়লা কেটে ঝুড়ি করে উপরে তোলা হয়, প্রতিবার মোটামুটি ২৫ কেজি। বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছরই এই খনিগুলিতে কাজ হয়। সামান্যতম নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। ছোটোখাটো তো নিত্যসঙ্গী। এ সবে তাদের মাথাব্যথা নেই। বড় কিছু হলে প্রচারমাধ্যম আসে। কিছুদিন হৈচৈ হয়, তারপর আবার যে কে সেই। কেউ মুখ খোলে না, বেঁচে থাকতে হবে তো। স্থানীয়রা মাফিয়ারা ঠিকাদারদের দিয়ে কয়লা তোলায়। ৭০-৭৫ টাকায় ১৫০-২০০ কেজি এই কয়লা সাইকেলওয়ালাদের কাছে বিক্রি করা হয়। কাছাকাছি শহরাঞ্চলে এই কয়লা ভালো লাভে বিক্রি করা হয়। কয়লা বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায় তার পরিমাণ কৃষিকাজ করে পাওয়া টাকার তুলনায় অনেকটাই বেশি।

২. ই.সি.এল.-এর আওতাভুক্ত এলাকায় অসংখ্য খনি রয়েছে যেখানে কয়লা আছে অথচ বিভিন্ন কারণে কয়লা উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে কিছু আছে যা জাতীয়করণের পর সরকারি নিয়ন্ত্রণে আসেনি, আর কিছু আছে যেখানে এখন আর সরকারিভাবে কয়লা তোলা হয় না। বিশাল সংখ্যক মানুষ এই খনিগুলিতে অবৈধ কয়লা উত্তোলনের কাজে যুক্ত আছে। শুধুমাত্র হাজারিবাগ এলাকায় খুব কম করে ২৫,০০০ মানুষ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত।

৩. সরকারি খনির অপ্রতুল নিরাপত্তা, পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি, এক শ্রেণির পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে তৈরি হয়েছে কয়লা মাফিয়া চক্র। খনি থেকে কয়লা বোঝাই ডাম্পার চলে যায় নিরিবিলি জায়গায়, যেখান থেকে মূলত সাইকেল-এর মাধ্যমে স্থানীয় কারখানাগুলিতে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ব্যাপারটা পরিচালনা করে মাফিয়ারা, পুলিশের একাংশ অর্থের বিনিময়ে নীরব থাকে। পাশাপাশি যুক্ত থাকে রাজনৈতিক দলগুলি। ফলত পুলিশ, মাফিয়া ও রাজনৈতিক দলগুলির সংযুক্ত ত্রিভুজ সৃষ্টি করে এক সামাজিক অবক্ষয়। এমনকি কোলিয়ারিগুলির কয়লা বোঝাই ট্রাক থেকেও চুরি করা হয় কয়লা। আর সমস্তটাই ঘটে এই ত্রিভুজ চক্রের আঁতাতে। মাফিয়াদের যে অংশটিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তারাই মেঘের আড়াল থেকে এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। চোরাই কয়লার একটি অংশ আসানসোল-দুর্গাপুর-বর্ধমান-হুগলি হয়ে কলকাতা পৌঁছাচ্ছে, পাশাপাশি বেনারসের দিকে এই একই প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। এতে শুধু কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়, সৃষ্টি হচ্ছে এক সামাজিক অবক্ষয়। সাইকেলে যারা কয়লা টানে তাদের আর্থিক দুর্গতির কথা কল্পনা করা যায়, কিন্তু কল্পনারও অতীত মাফিয়াদের বিলাসবহুল জীবন ও বৈভব—যার একটি অংশ পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

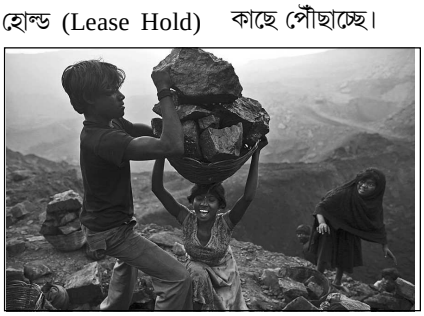
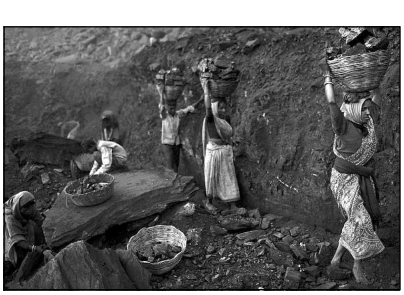

প্রধানত আধপোড়া কয়লা সাইকেলে চাপিয়ে কাছাকাছি শহরাঞ্চলে বিক্রি করা হয়। রাতের মধ্যেই কয়লা পুড়িয়ে সকালে বেরিয়ে পড়ে ক্রেতার সন্ধানে। এই কয়লা পোড়ানোর ফলে এলাকায় এত দূষণ বাড়ে যে সকালে ঘন ধোঁয়ার আবরণে সব ঢেকে যায়। কাছাকাছি জিনিসও চোখে পড়ে না।

ঝরিয়া-রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে প্রতিদিন চোখে পড়ে পিঁপড়ের সারির মত সাইকেলের মিছিল, মাত্রাতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছে সাইকেলওয়ালা। সাধারণভাবে আলাপী হলেও পেশা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলেই এরা চুপ করে যায়। কয়লার উৎস ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে এদের কাছে কোনো জবাব মেলে না। এরা প্রায় ১৫-২৫ কিমি চড়াই পাহাড়ের ওপর দিয়ে সাইকেলে চলাচল করে। যেতে আসতে সময় লেগে যায় ৮-৯ ঘণ্টা। সাধারণত ৪ থেকে ৮ জনের দল একসঙ্গে চলাফেরা করে, বিপদে যাতে পরস্পরের সাহায্য পাওয়া যায়। হাজারিবাগ এলাকায় সাইকেলের যাত্রা শুরু হয় সকাল ৪টের মধ্যে যাতে ৭টার মধ্যে শহরে পৌঁছোনো যায়। কাজ হয় গেলে খুলে নেওয়া চেন আবার সাইকেলে লাগিয়ে চেপে এরা বাড়ি ফেরে। সাইকেলগুলিতে শক্তপোক্ত চাকা লাগানো হয়, সাধারণ সাইকেলের চেয়ে প্রায় দু-গুণ শক্তিশালী স্পোক দেওয়া হয়। এক একটা টায়ারের দাম প্রায় ৩০০ টাকা। সাধারণভাবে মাফিয়ারা এই সাইকেলগুলি সরবরাহ করে। ৮-১০ কেজি থেকে ২০-২৫ কেজি কয়লা এক-একটি বস্তায় নিয়ে যাওয়া হয়। কখনও কখনও ১৫০-২০০ কেজি কয়লা একসঙ্গে সাইকেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

৪. অবৈধ কয়লা ব্যবসায় গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনো ভাবে জড়িত থাকে। কয়লার প্রাচুর্যের ফলে সহজেই মাটি খুঁড়ে কয়লা তুলে বিক্রি করা হয়। কয়লা কাটা থেকে বিক্রি পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে অসংখ্য মানুষ জড়িত থাকে, মাথায় থাকে মাফিয়ারা। কিন্তু আসল কাজটা করে সামান্য অর্থের বিনিময়ে সাধারণ গ্রামবাসীরা। কয়েক লক্ষ মানুষ এই কাজে যুক্ত থাকার ফলে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় এর প্রভাব কম নয়। রানিগঞ্জ-ঝরিয়া কয়লাঞ্চলে কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা নগণ্য। একদিকে যেমন খোলামুখ জমির উর্বরতা নষ্ট করে তাকে পতিত জমিতে পরিণত করছে, অন্যদিকে সহজলভ্য নগদ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নতুন প্রজন্ম আর কৃষিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এর ফলে কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি ও পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনি গজিয়ে উঠছে চোলাই মদের ঠেক ও অন্যান্য নেশার আস্তানা, স্কুল-কলেজে যাওয়ার সংখ্যা কমেছে, বেড়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চরম বিশৃঙ্খলা।

সাইকেলওয়ালাদের এই বাড়বাড়ন্তের মূলে আছে ত্রুটিপূর্ণ সরবরাহ ব্যবস্থা। সরকারি কয়লা মূলত সরবরাহ করা হয় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বড় শিল্পগুলিতে। স্থানীয় ভাবে কয়লা সরবরাহের কোনো কেন্দ্র থাকে না। সাইকেলে কয়লা এই অভাবটা পূর্ণ করে। এদের বাজার হল—গৃহস্থালী, দোকান—বিশেষ করে খাবার দোকান, স্থানীয় ইটভাটি ও গুল তৈরির কারখানা। জাতীয়করণের পর থেকে কয়লার দাম বাড়তে থাকায় অবৈধ কয়লার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠছে। অদক্ষ, অশিক্ষিত কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি, বে-হিসেবি নগরীকরণ, অন্য প্রদেশ থেকে আগত জনগোষ্ঠীর চাপ এই ব্যবসাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। সাইকেলে কয়লা পরিবহণ কয়লাখনি এলাকায় এক বিকল্প অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব সুদূর- প্রসারী। এক বিশাল এলাকায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এই দূষণ বাতাস ছাড়াও জলের উৎসগুলিকে বিষাক্ত করছে। রানিগঞ্জ-ঝরিয়া কয়লাখনি একালার প্রায় সমস্ত কুয়ো ও পুকুরের জল পানের অযোগ্য। সকালবেলায় যাদের সর্বশক্তি দিয়ে সাইকেল টানতে দেখা যায় তাদের দিকে এক নজরে তাকালেই বোঝা যাবে দূষণের ছাপ তাদের সর্বাঙ্গে। কুয়ো, পুকুরে ভাসছে কয়লাগুঁড়োর আস্তরণ।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া যেতে পারে :

১. কয়লা লাইসেন্স/ পারমিট ব্যবস্থার পরিবর্তন।
২. পারমিট দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নয়, সমবায়গুলিকে প্রাধান্য।
৩. কয়লাভিত্তিক শিল্প তৈরি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
৪. খোলামুখ খনির সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা।
৫. পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে নিরন্তর প্রচার।
৬. পরিত্যক্ত কয়লাখনির মুখ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা।
৭. শিক্ষার বিস্তার।
৮. অবৈধ কয়লা ব্যবসা শুধু আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন নয়—এটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ফসল।

পরিবেশ দূষণের দায় থেকেও আজ কয়লা পুরোপুরি মুক্ত নয়। অন্যান্য শক্তি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করলেও দূষণ হয়, তবে প্রতিটি দূষণ প্রকৃতিগতভাবে পৃথক। বিশ্বে আধুনিককালে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলিতে বোধ হয় যে বিষয়ে সবচেয়ে বিশেষ চর্চা চলছে সেটি হল পরিবেশ দূষণ আর তার রোধ। কয়লার আর এক নাম 'ফসিল ফুয়েল' অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি, কারণ জীবাশ্ম থেকে এর উৎপত্তি। দহনে শক্তি আর শক্তিতে বিকাশ। ব্রিটিশদের ১৭৭৫ সালের বিশ্লেষণই বলে দিয়েছিল ভারতীয় কয়লায় অ্যাশ বা ছাই-এর পরিমাণ যথেষ্টই বেশি, প্রায় ২০ থেকে ৩৫ শতাংশ। ছাইয়ের মধ্যে আছে বিভিন্ন খনিজ অবশেষ। তবে ভারতীয় কয়লায় সালফার বা গন্ধকের বা ফসফরাসের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম, যথাক্রমে ০.৭ শতাংশ আর ০.০১ শতাংশ মাত্র। তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্পে কয়লা ব্যবহার করার ফলে গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎপত্তি হয়—যা পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। কিয়াটো প্রোটোকলের মাধ্যমে বিশ্বের উন্নত দেশগুলি অনিয়ন্ত্রিত ক্রমবর্ধমান কয়লার ব্যবহারে লাগাম পরাতে চাইছে বিকল্প শক্তির ব্যবহার করে। কয়লাকে পিছনের সারিতে পাঠানো তাদের পক্ষে সহজ, কিন্তু ভারতের পক্ষে আগামী দিনেও কঠিন। কোল ইন্ডিয়ার সহযোগী সংস্থা সি.এম.পি.ডি.আই.এল. রাঁচিতে একটা কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন তার অধীনে পাঁচটা ক্ষেত্রীয় গবেষণাগার চালু করে ৩৭০ টা কয়লা উদ্যোগের চুলচেরা বিশ্লেষণ আরম্ভ করেছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক কয়লাখনিগুলোর জন্য আলাদা আলাদা এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরির কাজ চলছে। কয়লা তোলার শেষে জমিকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ।

আগামী দিনে কয়লার উত্তোলন বাড়বে—এটুকু ভবিষ্যদ্বাণী আজ নির্দ্বিধায় করা যায়। কিয়াটো প্রোটোকলের আন্তর্জাতিক ভ্রুকুটির মধ্যেই আমাদের কাজ করতে হবে। পরিবেশ বাঁচানোর জন্য আমাদের বিজ্ঞানীরা নিত্য গবেষণারত—ফলে বিকল্প প্রযুক্তি, নতুন নতুন কলাকৌশল-এর উদ্ভাবন হচ্ছে। বিশিষ্ট এক বিজ্ঞানীর কথাকে একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে—কয়লার জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করা যেতে পারে, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য কয়লাকে ত্যাগ করা যেতে পারে না—কারণ যার যাহা বল তাই তার অস্ত্র পিতৃঃ যুদ্ধের সম্বল (রবীন্দ্রনাথ)। সেই বলের উৎকর্ষ সাধনই আজ আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

তথ্যসূত্র

১. *Indian Coal Workers to Strike against Privatization,* Arun Kumar
২. *The Coal Cycle : Small Scale Illegal Coal Supply in Eastern India,* Kuntala Lahiri and David. J. Williams
৩. কয়লা খনির সমাজচিত্র : হিতেন ঘোষ

Long live Co-operative Movement

Madhaipur Colliery Employees' Co-operative Credit Society Ltd.

Sukumar Ruidas
Secretary

Sisir Kr. Ghosh
Chairman

Sl. No. 87

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সমুদ্রগড় সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.

পোঃ সমুদ্রগড়, জেলা : বর্ধমান, ফোন : (০৩৪৫৪) ২৬৬২৫৬, ২৬৬৫২২

শাখা : সিংহজুলী

আমাদের পরিষেবা

● ন্যায্য দরে ভেজালহীন সারের ব্যবস্থা। ● ব্যাঙ্কে সকলপ্রকার আমানতের ব্যবস্থা।
● কম সুদে চাষিদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা। ● অভাবি চাষিদের পাট ক্রয়।
● মিনি ডিপটিউবওয়েলের সাহায্য সেচের ব্যবস্থা।
● কৃষি ও কৃষকের স্বার্থবাহী প্রকল্প রূপায়ণে এই সমবায় সর্বদা সজাগ।

সমবায়ী অভিনন্দন সহ—

প্রমোদকুমার মুখার্জি
সম্পাদক

নজরুল সেখ
সভাপতি

হামিদ সেখ
ম্যানেজার

Sl. No. 71

পথের ভাষা

কৃষ্ণ ধর

ঠাঁই হয়েছে পথের ধারে
শুনছি কত মুখের ভাষা
ধুলো মাটির সঙ্গে মিশে
ভাষার ঝিলিক দেয় সহসা।

হাটবাজারে সওদা করে
চলছে ভাষা, যেমন নদী
এপাড় ভাঙছে গড়ছে ওপাড়
সাগরে যায় শেষ অবধি।

পথের ভাষার শ্রুতলিপি
শুনছে কানে লিখছে কলম
মানুষজনের মুখের বোলে
কখনও তেজি কখনও নরম।

পথই ভাষার বিশ্বকর্মা
কে বা আছে তাহার তুল্য
প্রাজ্ঞ এবং ব্রাত্যজনও
জানে ভাষার কত মূল্য।

মুখের ভাষাই মনের ভাষা
আকাশ মাটি বাতাস দাপায়
কথ্যচালে ডানার ঝাপট
চমক লাগায়, হৃদয় জাগায়।

স্বপ্নের ভিতরে থাকে

জিয়াদ আলী

ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন জেগে থাকে
ভাঙচুর করে কারাগার
মানুষ ক্ষুব্ধ হলে ক্রোধের আগুন
কায়েমি স্তম্ভগুলো করে ছারখার।

স্বপ্নের ভিতরে থাকে মানুষের গূঢ় উচ্চারণ
ভেঙে দিলে গাঢ় ঘুম বদলে যায় স্বপ্নের ধরন।
এ ভাবেই ঘটে যেতে পারে
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে অকস্মাৎ মহা বিস্ফোরণ।

স্বপ্নের ভিতরে থাকে শুদ্ধ শিশির মাখা
সুমুদ্রিত ঘাসের বাগান
রাজার প্রহরী এসে নষ্ট করে দিলে শোভনতা
ভেঙে যায় মানবিক নিজস্ব নির্মাণ।

মায়া অতি বিষম বস্তু

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

আমার কাছে যা আছে তা মূলত কবিতার বই
এই বয়সে এই সব না রাখলে কি হয় জানিনা
পরের প্রজন্ম পাতা উল্টে দেখবে না একটুও
তবু মায়া হয়, ছাড়তে পারি না।

থাক, যেখানে যেমন আছে তেমনি থাকুক
জীবন জুড়ে এদের হাওয়া-বাতাস পথ্যের মতন
মনের ভিতর কেমন একটা আলো-ছায়া খেলা করে
দৃষ্টিপটে ঘুরে ঘুরে যায় রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত।

চোখের সামনে আছে বিষ্ণু দে, বিমল চন্দ্র, সুধীন্দ্রনাথ, দিনেশ
বীরেনদা যেন বলছেন—আফ্রিকার কবিতাগুলো কি পড়লে?
'হায় ছায়াবৃতা'র বিষণ্ণ ছায়া আজো উড়ে গেল না 'মেঘ-বৃষ্টি ঝড়ে'
শুধু জ্বলছে, কান্নার জলে ভেসে যাচ্ছে বুক।

এখন পদাতিকের কবিকে দেখলে ভীষণ কষ্ট হয়
সে ছিল আমাদের চৈতন্যের আর এক উজ্জ্বল বিবেক
ফুটে থাকা পলাশ-করবী, জুঁই ও বকুল
ছুটে যাওয়া নদীর তরঙ্গ, সমুদ্রের ঢেউ।

রামদা, আর একবার হাঁক দিন, এ বড়ো দুঃখের সময়
চলুন মরা গাঙে জোয়ার আনতে আনতে বেরিয়ে পড়ি
পিঠে ঠেকে গেছে দেওয়াল, খোলা নেই কোনো পথ
এখন ঘুরে দাঁড়াতেই হবে—

ডান দিকে আমার বন্ধু-স্বজনরাও হাত ধরে আছে
তারা সব ধর্মে ও জিরাফে থেকে স্খলিত পথিক
'কাজে ও কথায় আত্মীয়তা অর্জন' করতে পারেনি
তবু আছে, কাছে থাকে, কথা হয়, চা খাই।

তোমরা যাও, শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে মায়া
সকলের হার মানে যুগে-যুগে তার কাছে
তোমরা যাও, একটু গেলেই পাবে অটো, বাস
দেখবে, সকলের ছুটছে নাম ও কাঞ্চন নগরের দিকে।

আমারই মতো ছিয়াত্তরে পা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

আমার ঘরের সমূহ দেয়াল ছাদ
খাট-পালঙ্ক-আলমারি-চেয়ার
লেখার টেবিল সবারই যেন
আমারই মতো বয়স হয়েছে...
সবাই যেন আমার মতো ছিয়াত্তরে
সবাই এবং সবাই কেমন পরিণত হয়েছে খুব;
আমার পরিণতির কথা না ভেবে
তারা সবাই পরিণত শুধু আমিই ছাড়া

যে মানুষটা আমার-শৈশব-কৈশোর
মাতিয়ে একতারায় বাউল গাইতো
সেই বয়েসের গাছ-পাথরহীন মানুষটা
দিব্যি গেয়ে চলেছে; 'গরীব আমি
দয়াল গুরু, আমার মন তো গরীব নয়'
একদিন অনেক ভেবে চিন্তে জিজ্ঞেস করি :
বয়েস কত হল? সে আমার মুখের
দিকে তাকিয়ে থাকলো...
কী জানি খবর পাইনা...
বলি : কিসের খবর?
"ওই যে কন্ বয়েসের কথা"

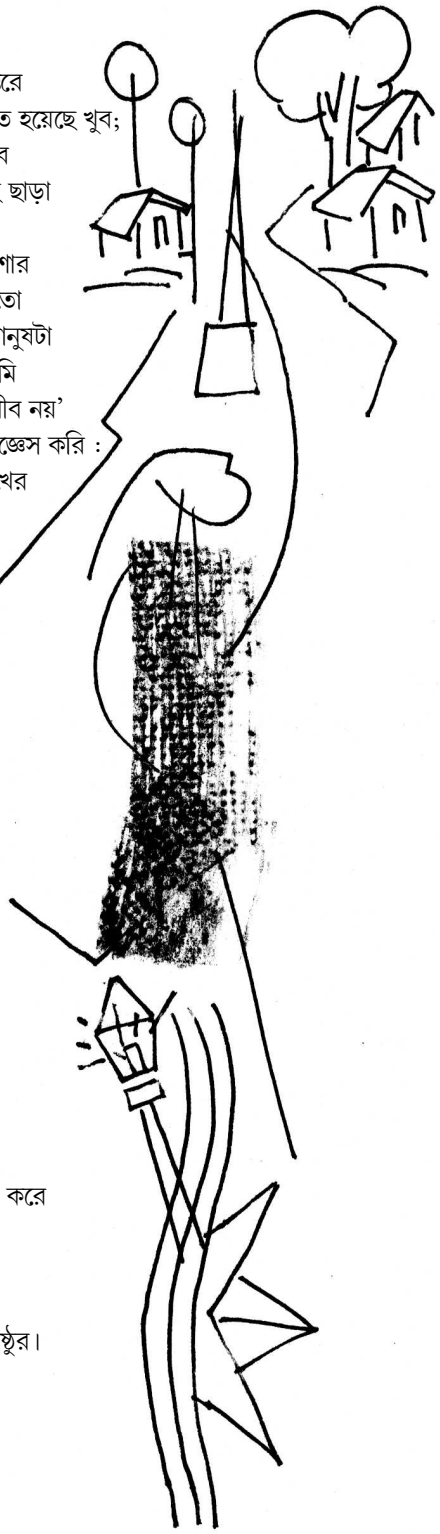

কমরেডদের

অংশুমান কর

ফোটো ফুল, সাবধানে ফোটো।
একসাথে নয়, তারা, একটি দুটি করে
জ্বলে ওঠো।
ও হাওয়া, উদাস হাওয়া
পারলে এড়িয়ে যেও
অচেনা রাস্তার বাঁক, মায়াবী, নিষ্ঠুর।
বৃক্ষ, বন্ধু চলচ্ছক্তিহীন
তোমার জন্যই জেনো
সবচেয়ে বেশি চিন্তা হয়
এ পোড়া রাজ্যে যে
কেউ আর নিরাপদ নয়!

আরামবাগের ঘরছাড়া মানুষটির আত্মকথন

পার্থ রাহা

নুন, মেঘ আর সিক্ত জলকণার
স্বাদ নিয়ে
এখন আমি আমার ঘরে ফিরবো
কালো মাথার
সারির পিছনে
আমার গ্রামকে কেমন দেখবো?
আমি ঘরে ফিরবো
কোথায় আমার গ্রাম?
কোথায় আমার ঘর?
এখনো বুকের মধ্যে যুবক আগুন
ছিটানো রক্তের মতন
লাল আগুন
ওখানেই।
আমার গ্রাম
কিভাবে আমায় কাছে ডাকবে?
ঘরছাড়া কালো মাথা
আমায় ঘিরে রাখবে
আর
মৃত্যুপ্রহরীরা পরিত্রাহী স্বরে
নারকীয় সুরে
ঘোষণা করবে
আমার ঘরে ফেরার দিন
আর আমি
টেলিগ্রাফে তারের মত সটান সোজা
তাদের মুখোমুখি হবো।

কোথায়, কোথায় আমার সেই প্রতীক্ষিত দিন?

অনু ইশারা

অরবিন্দ সরকার

আজ সকালে তুমি কিছু দিলে
মৃদু স্বরে উচ্চারণ করলে না দেখা দিনের কথা
বাসনমাজার শব্দে ভালো লাগা গোধূলি
একটু ঝুঁকে উঁকি দিয়ে জানিয়ে দিলে
আছি আমি তোমার সঙ্গে
আছি আমি নৌকা পথে
বিজন বিরল রাতে
স্বপ্ন ঘুমে অনুরাগ আতরে
আছি আমি ফিস্‌ফিসে
নক্ষত্র আলোয়
অনু ইশারায়।

গতি রাগ

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

না আমি দেখি না আর নষ্ট চাঁদ ভ্রষ্ট শুকতারা...

সূর্যমুখী চোখে অনেক না দেখা স্বপ্ন ভিড় করে
দীর্ঘ ছায়া পথে আলোর মিছিল
মহাবিশ্বে বিস্ময় ও বরাভয় ছিটকে এসে পড়ে।

উড়ন্ত পাখির নীল ডানায় ডানায় গতি রাগ
আমাকে চলার ছন্দ দেয়
ইচ্ছেমতো স্টিয়ারিং ধরে গাড়ির মতন
নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাই

না আমি দেখি না আর নষ্ট চাঁদ ভ্রষ্ট শুকতারা
নিজেকেই দেখি

নিজেকেই দেখতে দেখতে ঈশ্বরী পাটনিকে বলি
'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'
সামনে উঠেন হেসে রাঢ় বঙ্গে রায় গুণাকর
সমস্ত স্থিতি ভেঙে
রক্ষণশীলতা ধুয়ে মুছে
গতি ফিরে পাই শক্ত স্টিরায়িঙে
নিজেকে নিজের মতো নিঃশব্দে ঘুরিয়ে নিই
প্রত্যাঘাতে প্রহারে মাথা উঁচু করে দু পায়ে দাঁড়াই।

বারুদে বারুদে কথা

মিলনেন্দু জানা

বাতাসে বাতাসে ঘ্রাণ,
আকণ্ঠ উত্তাপ নিয়ে
উন্মুখ শ্রাবণ :
কখন ঝড়ের মুখ
নোতুন ঠিকানা
সুখ
এনে দেবে কাঙ্ক্ষিত আড্ডায়।

বারুদে বারুদে কথা,
বাতাসে উন্মুখ তার
স্বাগত ভাষণ :
কখন ঝড়ের চোখে
পাতা হবে রৌদ্রজলে
সূর্যের আসন।।

বাঙুরে, মায়ের কোলে

অমিত বাগল

[হাসা ভালো... হাসিরোগ... BIN-এ দেখি হাসিবয় ছেলেটিকে]

গৌরব, গৌরব...
এ ছেলে হাসে খল্‌খল্
বাঙুরে, মায়ের কোলে
হাসিরোগ ওর

হাসি যে কি স্নায়ুরোগ বাবা-মা কি জানো
মেরে ধরে হাসিটিকে কাঁদাতে পারো না

বাছা বুঝি কোল থেকে নামেনি কখনো
খেলা-নৌকোটি ওর ভাসেও নি পাল তুলে
হাল ছিঁড়েছিল কোনও দিনও তোমাদের বুকজলে

হেসে লুটিয়ে পড়েনি ছেলে?
পড়ে গেলে ডুবে যেত মাথা ফেটে ভালো হতো
যদি একবারও একটুও কান্না মিশে যেত পদ্মেশালুকে

এরকমই ভাবিচিন্তি ওপিডি লাইনে আমি
ফুটফুটে রোদজল পড়বে না ভোররাতে
ট্যাবলেট্ গলে গলে হাসিবয়টিতে

আয় বাছা
আমি তোর সারা গায়ে বেদম প্রহার করে
কালশিটে ফেলে দেখি
সারা বেলা হেসেকেঁদে কাটে যদি

আমাদের তো জলেও আছে রঙ, স্থলেও নানা-রঙবেরঙ
গৌরব, গৌরব বলে ডাকছে ডাক্তার

আমাদের টান

খেয়াঘাট

রসুল করিম

সরকারি আদেশনামায় ওপারেতে যাওয়া বারণ আমার
শুধু খেয়াঘাটে আসা যাওয়া, কথায় কথায় ডুবে যায় নদী।
শোক তাপে জেগে ওঠে বৈচিত্র্যের জীবন
কখনো কখনো আকাশ ভাসিয়ে বৃষ্টি নামে
ভিজে একাকার হয় যাবতীয় পোশাক আশাক।
পারানের মাঝি কথা বলে, আশ্বাস দেয় বার বার
এখনো হয়নি সময়, ওপারেতে নিয়ে যাবো একদিন।
মাঝিকে যথাসম্ভব বলি—
কেন তবে আটকে থাকি খেয়াঘাট পারে?
তার চোখে শূন্যতায় উথলে আসে মেঘ
তখনই ফিরে যায় জলকল্লোলে থাকা কুয়াশা মানুষ।

কামদুনি

দেবেশ ঠাকুর

মেয়েটি কলেজের ছাত্রী
মেয়েটি পথ হাঁটে রোজদিন
মেয়েটির মা-বাপ আন্‌পড়
অপুষ্টি উপবাসে সঙ্গিন।
মেয়েটি লেখা পড়া শিখবেই
অদূরে নগরের মায়াডাক
যে নগর একদিন রেনেসাঁস
এ গাঁয়ে বীণাপানি ঘুম যাক।

মেয়েটি কলেজের ছাত্রী
দু-চোখে স্বপ্নের ইমারত
আরও সে পড়বে—সে পড়বেই
পড়বে পড়াবে সে যুগপৎ
যে আলোক চিনে দেয় অক্ষর
সে আলোয় মেয়েটিকে ধর্ষণ
পিঠের নিচে ফোটে ঘাসফুল
সেদিন মেঘভাঙা বর্ষণ।

মেয়েকে চেরে জরা রাক্ষস
পশুও এর চেয়ে দয়াময়
এ কোন রাত্রির কথাভাস
সময় বোঝে কি এ সংশয়!
এবার দাম আর দস্তুর
কিশোরী নিলামের পাটাতে
'চোপ!' ওই লাশ এক অঙ্ক!
কে কাকে পথে নেবে হাঁটাতে?

ও কবি, ও গায়ক, আঁকিয়ে—
মোমবাতি জ্বালো সুতো পাকিয়ে

মেয়েটি

পম্পা দাস কান্ত

ছুটতে ছুটতে বেলা হয়ে যায়
মেয়েটি কাঁদবে কখন?
এবেলা ওবেলা রাস্তার কলে
ছোট, বড় বালতির সারি
রমরমিয়ে জিভের সুখ,
ঝিলিক-সুখ!

সাগরতীরে
নিজেকে সেঁকে নেবার বড় সাধ,
যেমন পর্দায়—
আগুন যে তার ঘরকন্নায়
আগুন যে তার প্রেমে
সইতে সইতে বেলা ঝলসায়
মেয়েটি পুড়বে কখন?

সেদিন
চাঁদ এসে তার বারোয়ারি উঠোনটাকে উদ্দাম
ভাসিয়ে নিয়ে যায়—
চকচক করে ওঠে মাতাল স্বামীর
কেচ্ছা:
ধুয়ে ফেলতেই বেলা উতরায়
মেয়েটি—গাইবে কখন?

মাঝরাতে
তেলচিটে মশারির নিচে
সপ্তরথীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস
বর্ষার আকুল-করা ঝড় নিমেষে থমকায় :
বাতাস খুঁজতেই ভোর হয়ে যায়
মেয়েটি—
স্বপ্ন দেখবে কখন?

দুঃখ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

দুঃখ নিয়েই দুঃখ ভাঙার খেলা
ভাঙতে ভাঙতে আলোর ঝর্নাধারা
বাইরে ঘরে ফোটা ফুলের মেলা
দুঃখ ভেঙেই পেলাম তোমার সাড়া

আলোর মাঝে আকাশ ওঠে হেসে
আলোয় আলো, প্রদীপ জ্বালো, দাঁড়াও
পেলাম সবই তোমায় ভালোবেসে
সময় হলো, দুহাত তোমার বাড়াও

তোমার দু-হাত হৃদয় ছুঁয়ে যায়
হাতে হাতেই মিলেছে এই পথ
পথের মাঝে ক্ষ্যাপা বাউল গায়
পথে পথেই নিয়েছি এই শপথ

দুঃখ আমার চিরকালের সাথী
দুঃখ ভেঙে, ভেঙে ভেঙেই, আসা
দুখের মাঝে জ্বেলেছো এই বাতি
দুখের স্রোতে চিরটাদিন ভাসা।

ভাষা

গৌরাঙ্গ মিত্র

ব্যক্তিগত নৈঃশব্দ্যে, ব্যক্তিগত একাকিত্বে
ডুব দিয়ে স্নিগ্ধ হচ্ছি।

পশ্চিমদিগন্তে হেলে-পড়া দিনগুলো
আমার কাছে নির্বাক নীরবতা ছেয়েছে।
তাছাড়া একান্ন টুকরোয় ছড়িয়ে পড়তে থাকা পৃথিবীতে
কোন ভাষায়ই বা কথা বলতাম?

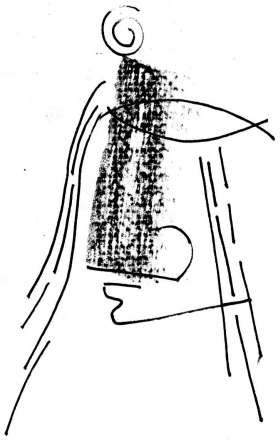

প্রশ্ন

সুধাংশুরঞ্জন সাহা

সে মেখেছে অশ্রু, দীর্ঘপথ
মানেনি বাধা, বোঝাপড়া কোনো মত।

সে মেখেছে বৃষ্টি, নির্মল জল
মানেনি কান্না, প্রাণপাতের কোনো ছল।

সে মেখেছে চন্দন, অগরুধূপ
মানেনি আগুনে কুচকাওয়াজ, সবাই চুপ।

সারা শরীরে সে মেখেছে অন্ধকার
আগুনের সহস্র প্রশ্ন : এ-শরীর কার?
আকাশে বাতাসে বাজে উত্তর এক
আমার, আমার, আমার...

নবনির্মিত বর্ণপরিচয়মালা

শ্যামলবরণ সাহা

অ— অন্নপূর্ণা, অশ্রুমোচন করিয়া জঠরাগ্নি নির্বাপিত কর মা!
আ— 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'...তথাপি আতা ফলের ন্যায় ভুবন ধূসর হইয়া আসিতেছে।
ই— ইতর জনের ইতিবৃত্তে ইহলোক মুখর হইয়া উঠিতেছে।
ঈ— ঈশ্বর কী করিতেছেন? তাঁহার ঈষৎ মূক ও বধির রূপদর্শনে মর্মে অরুন্তুদ বেদনা অনুভব করিতেছি।
উ— উৎসব চলিতেছে চতুর্দিকে। কাহারা যেন সংস্কৃতি উর্বর করিতেছে।
ঊ— ঊষাকাল হইতেই উৎসবের কোলাহল কর্ণকুহরে বর্ষিত হইতেছে।
ঋ— ঋণ করিয়া নির্বাক মানুষ চার্বাক হইবার নিমিত্তে ঘি খাইতেছে।
এ— এক্কাগাড়ির আর জোর ছুটিবার উপায় নাই। নবনির্মিত যানবাহনে পথ ফেনাইয়া উঠিতেছে।
ঐ— ঐকরাজ্যে ঐক্য নাই। কেবলি বাক্য, মাণিক্য তাহার নিজ নিজ ঐশ্বর্য হারাইতেছে।
ও— ওষ্ঠে চুম্বন রহিয়াছে। তথাপি অধরে চুম্বকত্ব নাই!
ঔ— ঔষধ নির্ণয় কর, পীড়িত পৃথিবী ঔজ্জ্বল্যহীনতায় বিবর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

হঠাৎ এখানে রামধনু

তমালিকা পণ্ডাশেঠ

দুটো ছোট্ট হলুদ প্রজাপতিকে আমি চিনি—
ওড়ে সবসময়ে—একে অন্যের সঙ্গে
গ্রথিত হয়ে—
এত ক্ষুদ্র প্রাণ—তবু কী প্রাণবন্ত—
ওদের মধ্যে একটাকে অনেকটা তোমার
মতো লাগে
আমার কঠিন আলিঙ্গনের বাঁধনে—
তোমাকে একটা ছটফটে
নরম প্রজাপতি মনে হয়।
চোখের পাতায় যখন আলপনা আঁকি
ঠোঁটের তুলিতে—
মনে হয় প্রজাপতির ফুরফুরে ডানায়
ঠোঁট রেখেছি—

তুমি চলে যাওয়ার পরও
ডানার রেণু গুঁড়োগুঁড়ো
হয়ে ছড়িয়ে থাকে
আমার সর্বাঙ্গে।
মধুবন্তী আমার—
কোনো অসুবিধা হয়নি তো ফেরার।
ঘরে ফিরে কারো চোখে
লুকোনো শানিত ছুরি
দেখেছি কি?
এইসব ভাবনায় ভয়ে ভয়ে থাকি—

মহাভারত

সঞ্চয়িতা কুণ্ডু

অনির্ভরযোগ্য সংকটকাল প্রত্যেকেই রথী,
মহারথী বলে কিছু নেই।
একে তো প্রতীচ্যের ভাষা
বলার আগেই ফুরায়,
ফুরায় সেখানে
যেখানে জঙ্গলের সামন্ত পাখিরা গায় গান...
ভেসে যায় বনাঞ্চল
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ কাঙাল! ...

টুকি

অলক বিশ্বাস

তুমি আর আমি মিলে বলো তো
আঁধার নামলে পায়ে
কত তারা সাজিয়েছি
কথায় কথায় আকাশের গায়ে!

সেও একদিন ছিলো জম্পেশ
কেবল হারানো খেলা
কতবার হারিয়ে বলেছি 'টুকি'
কতবার ভেঙেছি পথচলা!

অবগাহন

পান্নালাল মল্লিক

কিছুদিন যাবৎ মনে হচ্ছিল
আমাদের সবাইকে কোনো একজন পোষ মানিয়েছে—
তা না হলে
ভিতরের সেই বেপরোয়া বুনো স্বভাবটাকে
ভুলি কী করে!

আমাদের একটা সময়কে মনে করিয়ে দিতে
ইন্দ্র মাসে একবার আমারে বাড়িতে আসে,
হিসেব করেই তাকে বসাই, কথা বলি, খেতে দিই—
প্রতিবার চলে যাওয়ার পরই
বেদনা অনুভব করি, কষ্ট পাই—
বেহিসেবি হতে পারলাম না বলে।

এই একই তামাশা চলে মাসের পর মাস
বছরের পর বছর
প্রতি মাসে ইন্দ্র একবার আসে আমাদের বাড়িতে
হাত পাততে, পাত পেড়ে একমুঠো খেতে।

রক্তশোষক

অরুণ মৈত্র

রক্তশোষক বাদুড়েরা জানি
রক্ত শুষেই দিন গুজরান করে চিরকাল,
ব্যাটে বলে মিলে ইনিংস
তুলেছে খেলুড়ে ;
অকাজের খনি খুঁড়ে চলে
ঘুণপোকারা—
আমি কি কখনো ভেবেছি
এ সব তত্ত্ব—
খৈনির মৌ জমে শুধু অহোরাত্র;
ডলানিতে তালু জ্বলে পুড়ে ছারখার—
ঠোঁটে চুন লাগা যতোই
ঠেকিয়ে যাও না
তামাকের রসে মৌতাতে মাতে
বোকারা।
এমনি করেই সকালের থেকে দুপুরে
তা-তা-থৈ-থৈ
ঝঙ্কার ওঠে নূপুরে;
তবে, আমি এতোকাল
যা' কিছু ভেবেছি মিথ্যে—!
কালের খাতায় আঁকা হয়ে গেছে চিত্র!
এখন দেখছি শিয়ালকাঁটার নৃত্য
ঠেকাতে পারি না যতোই দিইনা হত্যে।
রক্তচোষারা রেহাই দেয় না কাউকে
শুধু লাভ খোঁজে
হাতড়ে ফেরেই কাউকে—
তবুও ক্রিকেট—
ইডেনের মাঠে শোরগোল,
অকারণে শুধু বাজনা-বাদ্যি
কলরোল।

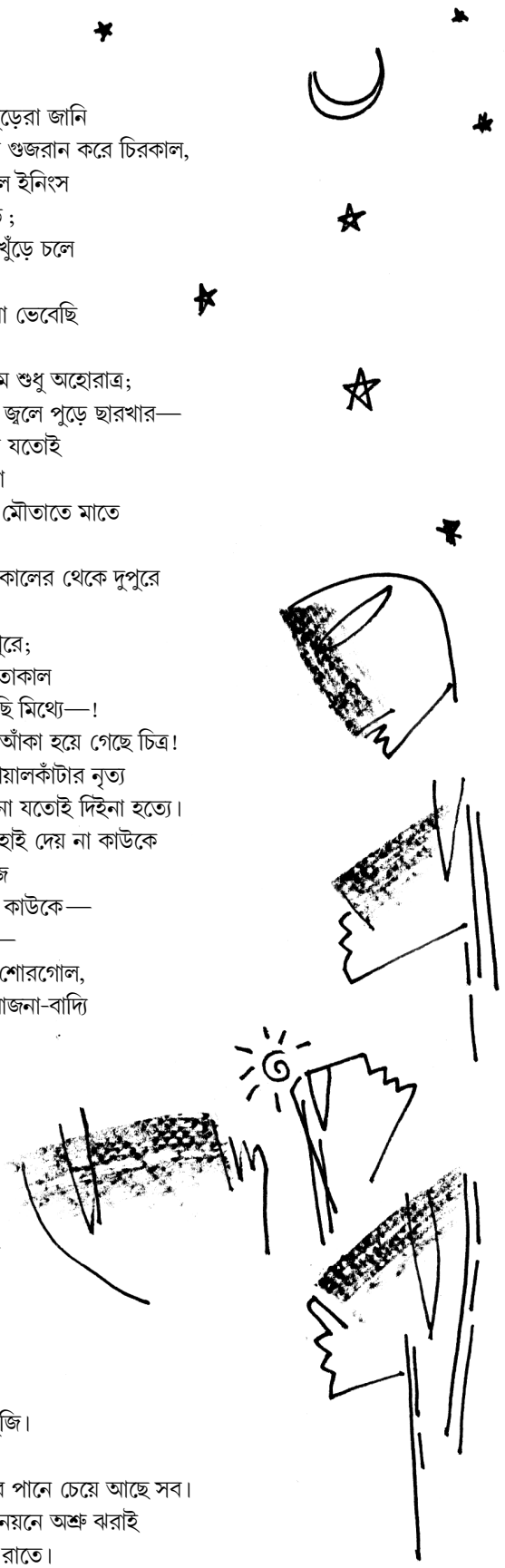

সন্ধ্যা নামলে

পার্থ চক্রবর্তী

সন্ধ্যা নামলে
তারাদের দেশে
প্রিয়জনেদের খুঁজি।
রাতের আঁধারে
তারা যেন মোর পানে চেয়ে আছে সব।
আমিও অবাক নয়নে অশ্রু ঝরাই
বেদনা বিভোর রাতে।

তৃষ্ণা

মণিশংকর রায়

বিশ্বাসের অপার মহিমা জীবন যাপনে,
রাতের পূর্ণিমার মতো তাই জেগে আছি আজও
দূরবর্তী নদীর মতো জলমগ্ন কখনও বা—
মৃত্যুভয় তবু পিছু তাড়া করে
নীরবতা আর অন্ধকারের ভেতর থেকে
উল্লাসে হেসে ওঠে প্রত্নময় ভাষা।

সন্তর্পণে নৈঃশব্দ্য ভেঙে দেয় গোপন বাতাস,
দ্রৌপদীর শাড়ির ভাঁজে অলৌকিক আগুন—
জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে
অদৃশ্য ওৎ পেতে থাকে মায়াবী রাবণ।

ছায়াপথ ধরে সংগোপনে
চাঁদের শরীর ভেঙে নেমে আসে
অনন্ত জোছনার নদী,
বোধের প্রতিমা ছুঁয়ে গেয়ে উঠি প্রার্থনার গান।

আমাদের ললাট লিখনে গোপন বিভ্রম
জিউসের অনিবার্য ক্রোধ মৃত্যু-মিথুন
বিহ্বল জীবন বোঝেনি তবু তৃষ্ণার ভাষা।

অবগুণ্ঠিত

অচিন মিত্র

এখনো হয়নি বলা
ধূ-ধূ চরে নদী বহুদূর নির্জলা
অবগুণ্ঠিত ছিল তাই

আড়াল যখন সরল পুড়ে ছাই
ফুটেও না-ফোটা স্বপ্নগুলো
ভাঙতে ভাঙতে পথের ধুলো
করল তাদের হাজার পায়ের অজস্র চলাচল
কোনখানে পাই সঞ্জীবনের মন্ত্রপূত জল!

চরে নিরুদ্ধ নদী কার্যত নির্জলা
কখনো হয়নি বলা
তোমাকে স্বপ্নগুলো তাই
অবগুণ্ঠিত পুড়ে পুড়ে হল ছাই

দ্যাখাতে নিজের মুখ

সুনির্মল কুণ্ডু

দ্যাখাতে নিজের মুখ—শোনাতে নিজের কথা সব
অনেক মানুষ আছে যারা স্বার্থে জোট চায়—নয় জোট ভাঙে,
স্বার্থ মিটে গেলে তারা স্বার্থের গৌরব
জাহির করতে সোজা নাও নিয়ে ভাসে কোনও গাঙে—
মাঝিমাল্লারের গান এমন শোনাবে লোকে তীরেই জীবনভর বসে
সময় কাটাবে ভেবে রোদবৃষ্টি নিয়ে ছড়া কাটে ;
হাঁফ ছেড়ে বাঁচা মানে কারও কারও মুখে আপশোশে
যে-কথা বেরোয় ফুটে কত হাঁড়ি ভাঙে তাতে হাটে!

প্রকৃত বাঁচার শব্দ টগবগ নয় বলে বাছাই তল্লাট
নিজের দখলে রেখে বহু লোক কোথায়-যে যায়
তা নিয়ে কথাই সার—ভয়ে লোকে খোলে না কপাট—
কে ? হম্বিতম্বি করে ডিনারের সাথে লাঞ্চ খায়,
দুপুর তাদের কাছে অনিবার্য তর্কের সময়—
দুপুর তাদের চোখে নিদ্রাহীন সেকেন্ড-মিনিট,
নেহাত ঘড়ির ঘণ্টা বেজে চলে—তারও ব্যাখ্যা হয়,
কেউ বা সঠিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হয়ে যায় ঢিট!

না-বললে জালিয়াতি... না-খুললে মুখ প্রতারণা,
আমি যে-রাজ্যের লোক আমি ট্যাক্স দেই বসবাসে,
আমার পকেট কেটে দানধ্যান প্রয়োজন কিনা
কে তার হিসেব নিচ্ছে? খ্যাতি-অখ্যাতির পোষমাসে
অঢেল শীতের মেলা—মিথ্যে আর ছলনার গান—
কে কত বশ্যতা মেনে ঊর্ধ্বে হাত তুলে আছে স্থির,
কোথায় কে নেশাগ্রস্ত কুকর্মের সতেজ জোয়ান?

সে-ছবি নিজের মুখ—মুখের কথার শব্দে ভেঙে চৌচির।

সারি সারি কাকদ্বীপ ডোঙ্গাজোড়া মালদহ

সুকমল ঘোষ

পাড়ার কুত্তাগুলো বড় ঘেউ ঘেউ করছে ইদানীং
হাতা খুনতি বালতি হাঁড়ির ঝন্‌ঝন্
উনুনের ঝিঁক থুবড়ে আছে
নিজেই পোড়াচ্ছে নিজের মুখ
রাস্তায় লাল ঝাণ্ডা খাটিয়ে প্যাচ্-ওয়ার্কে
নিমগ্ন তাবৎ পরিষদীয় দল।

ন্যূনতম মজুরির দাবিতে দূরে দাঁড়িয়ে
শ্লোগান তুলেছে বরাহের দঙ্গল—
'কারা তছ্‌নচ্ করেছে, কচুর জঙ্গল'!

সাঁ সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে রয়্যাল-ক্রুসার
সিটে হেলান দিয়ে চুটিয়ে ভিডিও দেখছে
টমি জিমি লালু মিমি কাল্লু স্যুইট
স্প্যানিয়াল ফিডো।

ব্যাপক একটা পরিবর্তনের দিকে ছুটে
চলেছে দেশ কাল এবং প্রশাসন।

ব্যাপক একটা পরিবর্তনের দিকে ছুটে
চলেছে সূর্য চাঁদ বুধ মঙ্গল এবং লুব্ধক।

পৃথা তাকিয়ে আছে
চিত্রলেখা তাকিয়ে আছে
কাকলি বৌদির দু-চোখ স্থির
পেছনে সারি সারি কাকদ্বীপ
পেছনে সারি সারি অহল্যা
পেছনে সারি সারি মালদহ, ডোঙ্গাজাড়া।

বিকেলের সূর্য গড়িয়ে পড়ছে
দূরে... দূরে... দূরে...
কালকে নামবে সকাল।

কনসার্ট

মেঘ বসু

হৃদয়ে তার চাঁদের ছায়াখানি
গলিত স্বেদে বেদনা ঘন জাগে
রাতের পাশে জখম ফেলে রেখে
নম্রমুখে রোদের ছোঁয়াছুঁয়ি
পুষ্প যেন গন্ধে দিশেহারা
দিঘির জলে মাছের কোলাহল
তেমনি তাকে দেখেছি গানে গানে
স্নানের পাশে তারার কনসার্ট।

শিকড়

গণেশ ভট্টাচার্য

সর্বনাশ কোথাও টিকে থাকে।
মাটির গভীর থেকে উঠে আসে মায়া
অতিরিক্ত ব্যস্ত হতে গিয়ে
কেউ কেউ নিজেকে হারায়।

ভালোবাসা কোথাও টিকে থাকে
এবং মাটির কথা
জীবন ভোলে না।

অন্তরীক্ষ এবং এক ঘর শোক

বিদ্যুৎ ভৌমিক

অন্তরীক্ষে বেশ কিছু কাল ওজনের কাঁটা দেখি ওঠে-নামে
কী এক ভীরু চোখ মনে-মনে অসুখ এঁকেছে বুকে
রাস্তার কাছে প্রহরী ছিল নিঃশব্দে হিম,
ওখানে গোপন করা সমস্ত প্রেমে পায়ের তলায় কান্নায় ভিজে ওঠে—
এতকাল ঘুরতে-ঘুরতে পথগুলো সোজা রাস্তায় ছিল না
কিন্তু শূন্যতার মধ্যে উপচ্ছায়ায় ভেসে গেছে কস্তুরীর ঘ্রাণ
অন্তরীক্ষে উড়ে যায় যাবতীয় পার্থিব ইতিহাস!
সেই স্মৃতি ক্ষমা চায়, সেই চোখ ডুব দেয় বোতামবিহীন বুকে
এরপর দিনরাত প্রতিটি জন্মের চিহ্ন নিয়ে ছবি আঁকি মেঘলা আকাশে!

এই নিভৃতে স্বেচ্ছায় ঘুম ভেঙে গেলে মনের পালক ছিঁড়ে
স্বাদ নেবে বহতা বাতাসের! বুকের মধ্যে জ্যোৎস্নার উৎসাহ অতল অবধি
নানান আঙুলে মাখি অন্ধকার রাতের আকাশ—
আঁধার শাখায় একা অগণ্য তারারা সতত দুঃখের অতল খুঁটে খায়!
এই কবিতার মধ্যে পোকার মতো নড়ে ওঠে সুস্থির বয়স
অথচ মৃত্যুশব্দতে বিষাদ হয়ে চেয়ে আছে ব্যক্তিগত সিঁড়ি
অনেকদিন একইভাবে বাতাস ছিল স্তব্ধ অসহায়
অথচ দিনরাত দীর্ঘদিন আমি থাকি এক ঘর শোকের ভেতর!

প্রতিভা

অর্কপ্রভ প্রধান

রাত-জাগা বীভৎস শরীরে ঝমাঝম তৎপর বৃষ্টি
আগলানো স্মৃতি আজ যেন এক স্বচ্ছ আয়না।
এলোমেলো ভূগোলের পাতা বাতাসে ওলট-পালট
হয়তো মনে পড়বে তোমারও,
পড়ে যাওয়া কালির দু-একটা ছোপ।
প্রতিভা কোথায়?
প্রতিভা তো পুড়ে ছারখার, গলে জল প্রতিভার হাজার সন্তান,
আমি-আমরা, তুমি-তোমরা আর বহুজনের
সাজানো ফুলদানির হাস্যকর সংলাপ
তার হিমালয় পর্বতের প্রশংসা, চিড়ে-দইয়ে মাখামাখি।
ঐ-টুকুই!
আমাদের আর দেওয়ার বলতে কিছুই নেই
আছে বিপন্ন খণ্ডতার সামান্য এক নুড়ি।
এতেও লেগে থাকে ঘৃণা আর বিদ্রূপের অসামান্য ছ্যাবলামি
আর আমরা মাখিয়ে করি চূড়ান্ত এক একটা ফাজলামি।

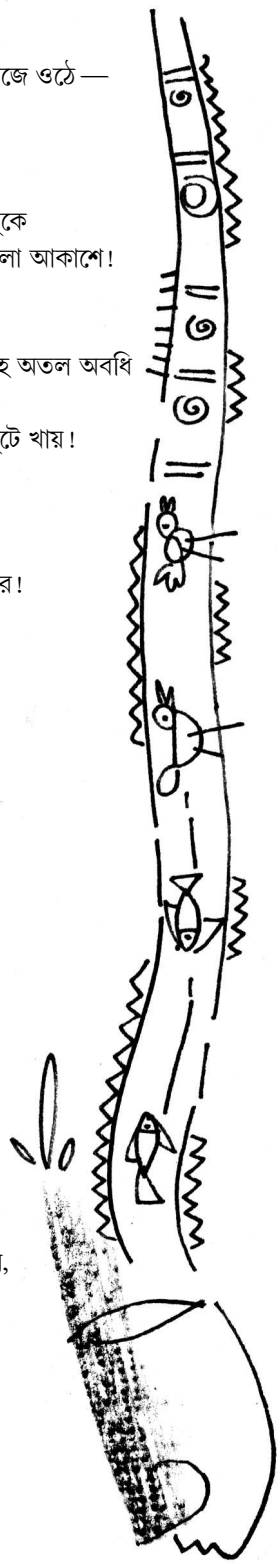

তোমার কথা

শীতল গঙ্গোপাধ্যায়

কেমন করে বলব তুমি আছো?
কেমন করে বলব তুমি নেই?
চোখে তোমায় দেখতে পাই না, তবু
তোমার ছোঁয়া সকল কথাতেই।

আমার মায়ের বাসনমাজা হাত
আমার মায়ের হলুদমোছা শাড়ি
কাঠের উনুন চোখঝরানো ধোঁয়া
নতুন চালের ভাত-টগ্‌বগ্‌ হাঁড়ি

দেখি যখন তোমায় মনে পড়ে
তুমি তখন বয়েজ স্কুলের পথে
মুখটি আলো রঙিন ছাতার আড়ে
সামলে শাড়ি হাঁটছো কোনো মতে।

আমি যখন পুকুরে ছিপ ফেলে
স্থির দৃষ্টি ফৎনা নড়ছে কিনা
ঠিক অদূরেই আমাকে চোখ ঠেরে
ঘাই মারছে দুরন্ত রুইপোনা।

ছুটির ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে
তুমি তখন খুঁজছো চেনা মুখ
জিওগ্রাফি পড়ায় যে ছেলেটি
নদী-পাহাড় দর্শনে উৎসুক।

পাখির ডানা ছাড়ায় পাহাড়চূড়ো
মাছ আনন্দে সাঁতার কাটে জলে
নদীর চড়ায় গজিয়ে ওঠা ঘাসে
কে আর বলো পা ডুবিয়ে চলে?

আছো কি নেই ভাবতে চাই না তাই
মা যখনি তোমার কথা বলে
মেঘলা আকাশ জান্‌লা দিয়ে ডাকে
বেরিয়ে পড়ি অমনি চুপিসারে।

রাস্তা দিয়ে আপন মনে হাঁটি
জনারণ্যে খুঁজি নির্জনতা
চাঁদ নেই তারা নেই দুষ্মন হাওয়া
ফিসফিসিয়ে শোনায় তোমার কথা।

কীভাবে জানাবো

বিশ্বনাথ কয়াল

কীভাবে জানাবো কেমন আছি আমি ও অমল
প্রতিদিন পথে চেনা মুখ সব অচেনা অলীক
উজ্জ্বল আলোয় এতকাল যা কিছু স্পষ্ট ছিল
দুপুরেই অজানা কুয়াশা মাখা
প্রজন্ম সব আলেয়া মিছিলে।

এতদিন জেনেছি খরায় অজন্মা হলে
গফুরেরা মহেশ মেরে গ্রাম ছাড়ে,
ভিড় করে গঞ্জের কলে; এখন দেখি
ঝুলে মরে গফুরের নাতিরা সব ফলনের মাসে।
নিত্য নতুন জমা পড়ে
গোপন দলিল সব মহাজনপদে।

এতদিন ছবি ছিল পিকাসো বা আমাদের
যামিনী ও নন্দলালের সাথে একালে সুনীল,
সোমনাথ ও গণেশের তুলি;
এখন সেই সব ব্রাত্য হলে
কোটি মূল্যে গ্যালারি সাজে
নতুন একগুচ্ছ কাশফুলে অবনমহলে।

কীভাবে জানাবো কেমন আছে অমিয় অমল,
জনবাণী শেষে দিনলিপি আঁকিবুকি মাটি ও আকাশ—
অপেক্ষায় জল, বায়ু, আলো
প্রতিদিন পায়ে পায়ে কথা শোনে তারা ও তিমির
নতুন নতুন মাঠে ও সবাক উঠোনে।

রাত্রিকথন

রামানুজ মুখোপাধ্যায়

একা রাত্রি জেগে আছি অন্ধ হিমঘরে
অন্ধকার চুঁয়ে চুঁয়ে কপালে পড়ছে

টেবিল ভিজছে আর আকাশ পরিধি
ঘিরেছে রাত্রির সেনা, যম ও যমুনা

পড়ে আছে প্রুফশিট, সস্তার কলম
কালো কালো অক্ষরের নিজস্ব পৃথিবী

নিশিডাক ডেকে যাচ্ছে একা এক নদী
মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে সেতুর ওপারে

মৃত্যু কি তোমার মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ
মৃত্যু কি তোমার মতো আমাকে নাচায়

এ-কবির অশ্রু তাই নিম্নে বয়ে যায়
আয় রাত্রি আমি তোর মুণ্ডু ছিঁড়ে খাই

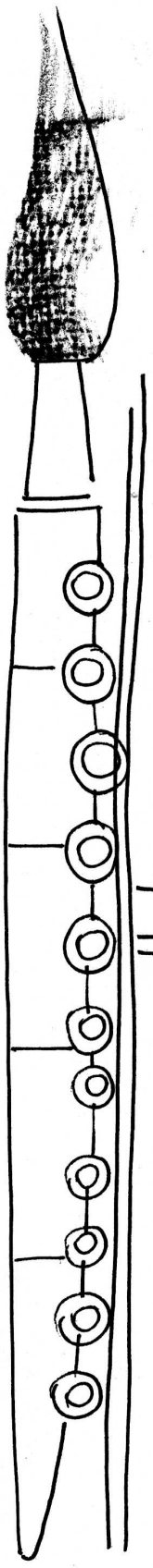

মালগাড়ির গার্ড

সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়)

ধূ ধূ প্রান্তরের সমুদ্র, মাঝখান দিয়ে
বুক চিরে মালগাড়ি যায়। অনেক লম্বা
অনেক মাল... সামনে প্রায় তিরিশটা বগি
পিছনে শুধু গার্ড পড়ে থাকে। সামনে ইঞ্জিনের
কাছে তবু তো দু-জন মানুষ একটু গল্পগাছা
করতে পারে... পিছনের একলা একজন
আপন মনে ভাবে চোর ডাকাত এলে কিছু
করবারও নেই... বড়ই মন-কেমন করা
আকাশের নীচে একলা থাকতে হয়...
পরিবার পরিজন, শিশুর কলতান মনে করতে
চেষ্টা করে... অন্ধকার নেমে এলে ঈশ্বরের
ভরসা ছাড়া আর কিছু নেই। চারিদিক নিঝুম,
জঙ্গল, গাছপালা ভৌতিকতা ছড়ায়
শুধু জেগে থাকা—কখনও বা রেলের বাঁশি
মনে সাহস আনে—তবু তো সঙ্গী আছে—চেঁচালেও
যাদের কানে পৌঁছবে না—মোবাইলের যুগে খানিকটা
ভরসা আছে। আসার সময় বউ দুয়ার ধরে
দাঁড়িয়েছিল... ছোটো খুকিটার জ্বর... হাতুড়ে
ডাক্তারই ভরসা। পারে না এত ভার এত চাপ
সামলাতে আর... বুকের ওপর নিস্তব্ধতা চেপে
বসে... শুধুই জোনাক-জ্বলা বন আর মিটমিটে
তারায় ভরা অন্ধকার আকাশ তার সঙ্গী...
সে যে মালগাড়ির গার্ড আর কিছু না।

বাস

গোবিন্দ গোস্বামী

সামনের বাড়িটা
প্রোমোটারের থাবায় উড়ে গেছে
আকাশছোঁয়া ঝকঝকে রঙিন সামিয়ানার নিচে
কৃষ্ণচূড়া গাছটা কবে চলে গেছে করাতকলে
লাল রোদ্দুরের ছায়ায়
এখন আর ঘুমিয়ে পড়ে না চোতের দুপুর
রাক্ষুসে বহুতল গুঁড়িয়ে দিয়েছে রাখালবেলা
স্বপ্নকথায় মুছে যাচ্ছে ভরা বসন্ত

তবু, ফুল ফুটতেই থাকে
বুকের ভেতর টুকটুকে গোলাপকুঁড়ির
অনবরত জেগে ওঠার কারুকার্যে
রক্তের শেকড় ঘিরে নিরন্তর ফুটে ওঠার যুদ্ধ
ভালোবাসার ঘরদোর শিউলি ছড়ানো উঠোন
ঘাসের শীতলপাটি খড়ের ছাউনিতে ফিরে দ্যাখা কিছুক্ষণ

ক্ষমতাসীনের কবি-প্রণাম

অজয়রঞ্জন বিশ্বাস

২০১৩-র মে-মাসের প্রচণ্ড তাপপ্রবাহকে ফুৎকারে উড়িয়ে
জনসমাজের ক্ষুদ্রাংশের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধকে দমন-প্রশমন করেই—
হে কবিগুরু হে গুরুদেব তোমাকে প্রণাম!
বৎসরের এই দিনটিতে সারা পশ্চিমবঙ্গ-জুড়ে —
কোলকাতার রবীন্দ্রসদন থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের আর শহরের
সিধু-কানহু-ডহরের
আনাচ-কানাচ ঢুঁড়ে
আড্ডার আখড়াগুলোকে এবং ক্লাবগুলোকে
ঢেলে দিয়েছি অজস্র ফান্ড আমার মোহিনী ফাঁদ
তথা আমার-ই ইনাম...
তাই-তো আজ এই পঁচিশে বৈশাখ
গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বাজছে অত্যাধুনিক কায়দার ব্যান্ড
এবং নিষ্ঠামাফিক উচ্চনাদিত শাঁখ!
আমার এই আনুষ্ঠানিক প্রণাম-নিবেদনে কোনো বিচ্যুতি
ঘটবেই না—
পার্ক-স্ট্রিটের ধর্ষণ-কাণ্ডের সাজানো ঘটনা-ই হোক
বামপন্থী ছাত্র সুদীপ্তর পুলিশ-হেফাজতে অ্যাকসিডেন্ট-ই হোক
অভাব-তাড়িত কৃষকের আত্মহনন যত-ই বাড়তে থাকুক
গ্রামে-গ্রামাঞ্চলে গঞ্জে শহরে
কোনোভাবেই ঘাটতির চুনকালি পড়বে না
আমার জনমোহিনী মূর্তিতে
তাই—হে কবিগুরু হে গুরুদেব—তোমার পবিত্র জন্মবর্ষপূর্তিতে
পশ্চিমবঙ্গবাসী হে জনগণ উৎসবে মাতুন নবনব ফূর্তিতে —
মাঝেমধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ দ্বন্দ্ব-বিরোধ ঘটুক—ক্ষতি নেই
ঐসব আমি সামলে দেবো, ট্যাকল করে নেবো
আমার ইকবালদের লেলিয়ে ঠেকিয়ে দেবো—
কিন্তু হে কবিগুরু হে গুরুদেব
এই মায়ামোহের আলো-আঁধারি যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়!
তুমি এখানে এখন আহ্বান করো-না করো-না করো-না
অন্ধকারের উৎস ভেদ-করা আলো
সামগ্রিক জাগ্রত ভালো
ঐসব বেয়াড়া-মাপের জনজাগরণ ইত্যাদি ঘটাতে গেলে
আমার দাপট টের পাইয়ে দেবো
কবিগুরু কিংবা গুরুদেবকেও এমন চমকে দেবো
জাস্ট দেয়ালের পোস্টার বানিয়ে দেবো
পশ্চিমবঙ্গের জনমানসেও আর জলজ্যান্ত চিরভাস্বর
থাকতে দেবো-না!!!

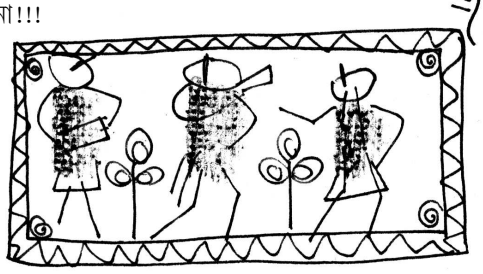

ডোকরা

ঋষিগোপাল মণ্ডল

মহাত্মার কর্মদিবস ইন্দিরার আবাস রাজীব গান্ধির
বিদ্যুদয়নের প্রত্নরূপ পান্তা বেতনি মেখে মুখে তোলে দারিয়াপুর
জাঁতপুঙ্গির মোম মাটি ধুনোর সোহাগায়
চকচক করে ওঠে প্রাগৈতিহাসিক পিত্তলমূর্তি

হস্তশিল্প বিভাগের প্রকল্প আর বিদেশ ভ্রমণগুলো পঞ্চায়েত দপ্তর ছুঁয়ে
কাঠকয়লার ভাটিতে পুড়ে সর্বনেশে পৌষমাসে ম্যাজিকের মতো
কিভাবে যেন দেশি মদ দেশি মুরগি হয়ে যায়
নেশাখোর ভিডিওতে রাতভর খোকাবাবু লাল জুতো পায়ে কোথায় যে যায়
প্রাচীন দাঁড়টানা নৌকার গায়ে লেগে থাকে কচি মেয়েদের চোখের মতো
মোলায়েম মৎস্য পরিবার এবড়োখেবড়ো অসুরকে মা দুর্গা ফুঁড়ে দেয়
বলেই তুমুল ঢোল বাজায় ত্যাড়াব্যাকা প্রথম রাষ্ট্রপতি পদক
মহেঞ্জোদাড়োর ষাঁড়ের পাশেই ওত পেতে থাকে আর্ট কালেক্টর দালাল

কমলকুমার মজুমদার আসেন কোনোদিন আলগোছে
কত ধানে কত চাল মাপবেন না কোনোদিনও তবুও
কমলবাবুকে জ্যোতির্ময় কুনকে উপহার দেয় ধোকরা কামার
দাওয়ার বনভোজনে একসাথে হাঁড়িয়ায় চুমুক দেন বিশ্বকর্মা

শিল্পমেলা আর অভিজাত গৃহকোণে নিপুণ সজ্জায়
ঝিঁকিয়ে ওঠে আউশগ্রামের আর্ট
ধাতুর মতো ভারি সন্ধ্যার দারিয়াপুরে আয়রন ট্যাবলেট আসবে বলে
অপেক্ষায় ঠায় ধনঞ্জয় কর্মকারের পোয়াতি নাতবউ

দীর্ঘ ছায়া

নরেশ মণ্ডল

দীর্ঘ ছায়ার মানুষ দেখি না এখন
মানুষ ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে
ছোটো ছোটো ছায়ার মানুষে
ভরে যাচ্ছে রাস্তাঘাট আর ফ্ল্যাট
সূর্য যাবার বেলায় কারো কারো
ছায়া দীর্ঘ দেখায়।
মানুষগুলো যে কে সেই।
সব সময় কোনো নো কোনো মুখোশ থাকবেই
এক নজরে চেনাও যায় না,
এরা কখনও দীর্ঘ হয় না।

দীর্ঘ ছায়ার মানুষ শতবর্ষ পেরিয়েও
সমান সতেজ। এমন মানুষের সন্ধানে
প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। বিরল এই সব
মানুষই আলোর পথযাত্রী।

আমাদের ছায়া কি ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে!

সৈনিক

মলয় রায়

[জন্ম শতবর্ষে জ্যোতি বসুকে মনে রেখে]

একটা মাইলস্টোন।
ভোরের রাঙা দেওয়াল জুড়ে
ফুটে উঠল শতবর্ষের উদ্‌গত ধারা।
ক্লান্তিহীন এক কিংবদন্তী মানুষ।

অক্ষর থেকে শব্দে
শব্দ থেকে বাক্যে,
ক্লান্তিহীন যে নাম প্রতিটি জনপদে।
এক শতাব্দী থেকে
আর এক শতাব্দীর পথ চলায়।

দীর্ঘ যাত্রাপথ। খুলে গেছে
ইতিহাসের বন্ধ কপাট।
মৃত্যুর পর জন্মশতবর্ষ
আরও একশ দুশো বছর,
যৌবনের রক্তে উচ্চারিত হবে
তাঁর স্বপ্ন হাঁটাপথ।
ভয় ও আতঙ্কের বন্ধ্যা মাটিতে
ছড়াবে সাহসের বীজ।
চেতনায় ফুটবে শান্তির বারুদ।
কপালে কপালে ফুটবে
চেতনার জয়টিকা।

ধান রোপণের সুবাদ সংসারে
ছড়িয়ে গেলে যে সংলাপ,
ভাবনার গামছায় বেঁধে নিল মানুষ।

তোমার হাঁটাপথ একদিন
রাজপথ হয়ে হেঁটে যাবে দেখো ঠিক।
আজ তুমি রাজনীতির সেনাপতি নও,

লাখো মানুষের চেতনার সৈনিক।

ভাব

আশিস মিশ্র

তুমি যাকে স্নান বলো, আমি বলি প্রেম;
বৈধ নদী দু-দিকেই যাওয়ার মতো
তার ভাব; ছবি, রূপ, সুন্দরের ধ্বনি—
সে কখনো ভাঙে, ভেঙে ভেঙে রূপময়;
তারপর যা হয়; সে আর ব্যর্থ ব'লে
বলে না কখনো—সে তখন পূর্ণকাম—
একাকার হয়ে যায় স্নানের শরীর...

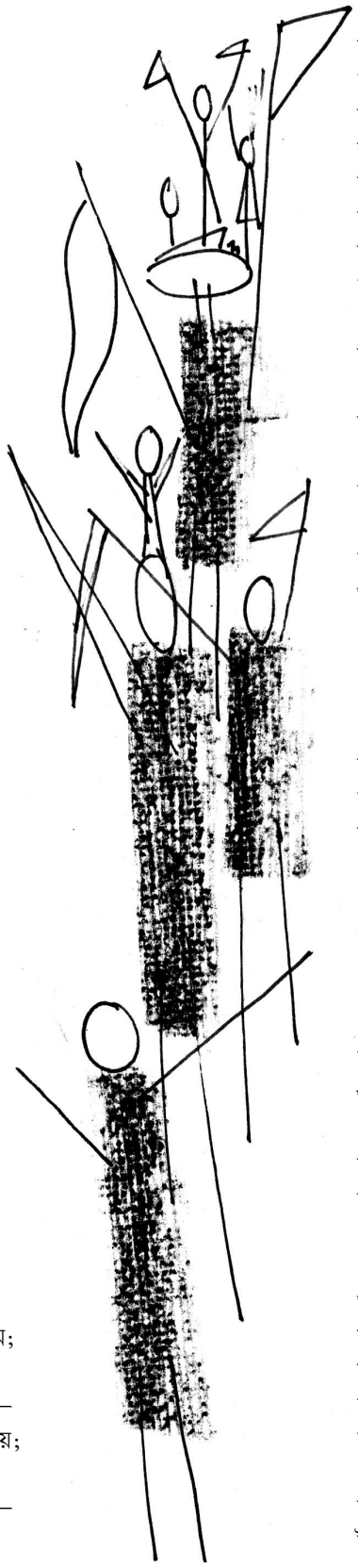

গঙ্গামাটি গাঁ থেকে চাঁদে পা

গিরীন্দ্রনাথ চাকী

ফড়িং মোড়লের সব কথাতেই ফরফরানি—
বলে, শোনো, গঙ্গামাটি গাঁয়ের কাহিনি।
ভুঁইয়ে সার দিতে হতো না কখনো,
ঝাড়াই-বাছাই করে ধানের বীজ রাখতো
উনো জমির দুনো ফসলের জন্য।
ঘুঘু-ধরা ফাঁদের বাখারি চাঁছতে গিয়ে
শাসানি আঙুলটাই কলম-কাটা করে ফেললো
বড়ো তরফের বড়ো মুনিশ,
সে এখন আর বাবুদের ঘরে থাকে না
চাঁদে পাড়ি দেওয়ার যাত্রী খোঁজে অহর্নিশ।
খবর শুনে আঁৎকে ওঠে
মাছরাঙা, গেঁড়ি, গুগলি, ব্যাঙ
এই ধান্ধায়-ই সব সময় পেছনে পেছনে ঘুরঘুরানি,
কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান

কাকের মুখে বার্তা রটে গেলো চটজলদি—
আই.টি. কমপ্লেক্সের ভূমিপুজো আজ।
এদিকে গাঁয়ের বিপিএল-ধারীরা
একশো দিনের কাজ ছাড়তে নারাজ।

এক ট্রাক পলি একশো কোটি ডলারে বিক্রি হচ্ছে চাঁদে,
তাই তারা পড়বে না দালালদের ফাঁদে,
কাঁকড়া, কেঁচো, জলপিপি জোট বেঁধেছে এক সাথে
তারা কম্যান্ডো ছাড়বে পাশপোর্ট ভিসার
পাতাতে পাতাতে।

রক্ষক

অখিলেশ সুর

নিজেকে অরক্ষিত ভাবিনি কখনো, ভাবিনি
জীবন এভাবে এলোমেলো পায়ে চলতে চলতেও
একদিন ঠিক সেই ঘাটে পৌঁছে যাবে
যে ঘাটে সহস্রমুখ হাত পেতে বসে আছে
অবিচল নৌকো মাঝির ওপর ভরসা রেখে
সুজন মাঝি ঘাট ছেড়ে নৌকো নিয়ে বেরিয়েছে মানেই
তাদের জন্য নিয়ে আসছে একরাশ ভালোবাসা
নয়তো বা শূন্য নৌকার খোলে জলময় ছলাৎছল কথা
কথার কুহক জড়িয়ে ধরবে তাদের অন্ধকার করে
পাওয়া বা না পাওয়ার বেদনা ভুলে সবাই
হাততালি দেবে আর নিজেদের সুরক্ষিত ভেবে
ইতিহাসের রেখাপথ ক্রমশ প্রশস্ত করে যাবে।

মৃত্যুও কখনো বা বড় হয় জীবনের থেকে

নিমাই মান্না

গার্হস্থ জীবনের ছক্-বাঁধা গণ্ডিরেখা ভেঙে
কেউ-কেউ জোরে জোরে লাফ দেয়
সম্পূর্ণ নতুন জগতে।
তাকলামাকান-কালাহারি-গোবি পার হওয়ার
দুর্জয় আবেগে,
কিংবা ভয়ানক মৃত্যুকূপ পাহাড় চূড়োয় পা রাখার
আকুল তাগিদে,
অথবা দুরন্ত কোনো আমাজনি-নদীর উৎস মুখে
পৌঁছুনোর প্রবল ইচ্ছায়
প্রাত্যহিক জীবনটাকে পুরোপুরিই বদলে দেওয়ার
উদগ্র ক্ষুধায়
সোনালি ডানায় ভর করে
উড়ে যায়—ভেসে যায় এরা সব
রামধনু রঙে আঁকা আকাশে-আকাশে।

মৃত্যু কখনো বা বড় হয়,—
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়
পরিচিত-অপরিচিতি জীবনের থেকেও।

ছেলেটা

নিলয় মিত্র

সেই কবে মা-কে হারিয়ে
বাবার দিদির বুকে কোলে
কবিতায় গিটারে গানে বড় হতে হতে
আশ্চর্য সব শব্দৈশ্বর্যের সাথে
পরিচয় ঘটে গেল ছেলেটার।
সেইসব শব্দৈশ্বর্যের শরীর জুড়ে রোদ্দুর
কবিতার মতো
বৃষ্টির মতো
এক মাঠ শস্যের মতো
রবিঠাকুরের গানের মতো।
আহত চেতনার ধ্বনি আর অফুরন্ত ভালোবাসার উৎস
পাখির ডানা বসিয়ে তাকে নিয়ে যেত
অমল রৌদ্র উদ্ধারে।

ছেলেটার নবীন প্রাণে জন্ম পেত সজীব গান
পায়ের ছন্দে বেজে উঠত মাদলের তান,
যুবক নদীগুলিকে জাগিয়ে দিয়ে
ছুটে যেত অজেয় সমাজের প্রাণের অন্বেষণে
স্পন্দিত চিত্রশিল্পে।

বিনাশের ক্রম আধিপত্যে
ক্রূর উলঙ্গ শাসনের অনুগত দাসত্বে
যক্ষপুরীর ছোটো মেজ বড় সর্দারের দল
তীক্ষ্ণনখ বসিয়ে দেয় ছেলেটার সাহসের শরীরে
ধূর্তমুহূর্তে জন্তুর মতো খাঁচায় পুরে
আঁচড় কাটে, ফালাফালা কোরে ধ্বংস করার খেলায়
হত্যা করে
হত্যা করে এক সৃজনবীজকে
ছেলেটাকে।

দিদির জ্বলন্ত চোখ
তিক্তবাক, করুণার ভণ্ডামী করবেন না মহাশয়া,
নিহত সন্তানের ঠোঁটে ঠোঁট ছোয়ান বাবা
প্রাচুর্যের নদীকে কে পারে মেরে ফেলতে
সহস্র মা দোমড়ানো মোচড়ানো দিনটাকে ছুঁড়ে ফেলে
প্রশ্নের মতো হাত ধরে পথে
সাহসের স্বর পৃথিবী ধ্বনিত কোরে
রবীন্দ্রনাথ বুকে আমাদের
আছে নেরুদার কলম, সুকান্তর কবিতা
প্রতিটি যুদ্ধে জেতা ঘোড়ার পা।

তোমাকে

মৈনাক মুখোপাধ্যায়

শহরতলির ট্রেনে, ছোটনাগপুরে
অবরুদ্ধ রাজপথে, শেষ ট্রামে, পানশালা জুড়ে
বাংলাভাষার টানে ময়দানে, শহিদ মিনারে
চায়না-টাউন ছেড়ে বুধসন্ধ্যা, ঘরে ও বাইরে
নিরালায়, নির্জন রেলব্রিজে, শ্মশানে-চন্দনে
জতুগৃহে, ভালোবাসায়, গড়িয়াহাটে খুব অন্য মনে
পাতালের রেলে আর নীরার আঁচলে
তুমি নেমে আস একা অনিবার্য—স্মৃতির মিছিলে।

(গত বছর ২৩ অক্টোবর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে চলে যান)

নাম তার সুদীপ্ত গুপ্ত

আমির উল হক

মনে ছিলো স্বাধীনতা সুপ্ত
নাম তার সুদীপ্ত গুপ্ত।
অধিকার রক্ষার দাবিতে
পথে নেমে লড়াইটা চলবে,
তৃণভোজী হায়েনার হামলায়
দীপ হয়ে সুদীপ্ত জ্বলবে।
সুদীপ্ত জোসেফের রক্তে
রাজপথে শোকে ভেজা কান্না,
তৃণভোজী হায়েনার হামলা
রুখবোই, আর নয়, আর না।
দৃঢ় হও দেবজ্যোতি মধুজা
পাশে আছি লাখো লাখো জনতা,
অধিকার লুণ্ঠন রুখবোই
রুখবোই তৃণভোজী শঠতা।
'ছোট' 'পেটি' 'ল্যাম্পপোস্ট' তত্ত্ব
নিরোদিয়া সর্পিল বাঁশিতে
নাগিনীর নাচ গান জলসায়
ভুলো নাকো ঐ ক্রূর হাসিতে।
স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের
লড়াই-এ রক্ষার অধিকার,
লাখো লাখো সুদীপ্ত হেঁটে যায়
বুকভরা কান্নার হাহাকার।
ফুল মালা কান্নার বন্যায়
সংগ্রামী সাথিদের সাগরে,
ঘরে ঘরে প্রতিবাদ প্রতিরোধ
গড়ে তোলো গ্রাম থেকে নগরে।
অধিকার রক্ষার লড়াই-এ
মিছিলের শিরোনামে সুপ্ত
লৌহদৃঢ় প্রতিবাদ প্রতিরোধ
নাম তার সুদীপ্ত গুপ্ত।।

বৃষ্টির পরে

কাকলি ঘোষ

স্বেদসিক্ত তোমাকে দেখেছি, সুদীপ্ত
ব্রিগেডের মাঠে,
রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে।
উত্তাল জনসমুদ্রে
তুমিও একটি ঢেউ
হয়ে ছিলে।
শপথ নিয়েছি, আমরা টেনে
নামাব মুখোশ পরা
সে রাজাকে ;
বিশ্বজুড়ে যে বাজায়
যুদ্ধের ডঙ্কাকে।

স্বেদসিক্ত তোমাকে দেখেছি
ভুখা মানুষের মিছিলে
নিরন্ন শিশুর মুখে দিয়েছ
কয়েক কণা অন্ন, আবেগে।
বৃষ্টির পরেও তোমাকে দেখেছি
উঠিয়ে উদ্ভীন মুঠি, ঊষর
কারা যেন বিজ্ঞাপনে
এঁকে দিয়েছে চে-এর মূর্তি।

স্বেদসিক্ত তোমাকে দেখেছি
উত্তপ্ত বৈশাখে,
প্রতিরোধের নিশান উড়িয়েছো
মাঠে ও পথে পথে।
ঘাতকেরা পারেনি তোমাকে কেড়ে নিতে,
বৃষ্টির পরেও তোমাকে দেখেছি
আগামী, সুচেতনার পাশে।

সু-দীপ্ত

সমর সাহা

গরম রাজপথ, দীপ্ত সূর্য ঢলেছে—
বাঁধভাঙা আইনে বন্দি আগুনপাখি।
হৃদ-মাঝে দার্জিলিং হিমপ্রবাহ থেকে,
কাকদ্বীপের উত্তাল জলধি উচ্ছ্বাস।
অধিকার রক্ষায় অগ্রণী সাম্য-দূত,
একা নয় সকলের সাথে পা মিলিয়ে।
যার হৃদয়ে আঁকা ছিল সু-দীপ্ত স্বপ্ন,
দীপ্ত গানের সুর, মুছে দিলো ঘাতক !

তুমি ঘুমাও সুদীপ্ত, আমরা সজাগ,
ঘাতকের 'তুচ্ছ' বাহানার প্রতিবাদে—
শুধিব রক্তঋণ মানব ঐক্য গড়ে।
সবার মৃত্যু আসে জৈব আলপনায়,
শহিদের স্মৃতি চেতনায় মৃত্যুঞ্জয়ী—
কোটি যৌবন তাই প্রেরণায় প্রত্যয়ী।।

১৯৭১-এর আহ্লাদিপুরের স্মরণে

বন্দী অকবি

১.
হিংস্র জানোয়ারটা
রোজ রাত্রে দেয় হানা
একএকটা বাড়িকে শেষ করে,
ভীত মানুষগুলো
ঘরের আগলগুলোকে করে শক্ত
আর হয় একান্ত একঘরে।
প্রাণ বাঁচানোর করুন প্রয়াস
মৃত্যুর বাঁধটাকে চূর্ণ করে
বন্যা আনে ডেকে
ভেসে যায় তার প্রিয় আবাস।

২.
শয়তানি হামলায়
একটা একটা করে অঙ্গ পড়ে খসে
গঙ্গার জল লাল হয় আরও
হারিয়ে যায় স্বপ্নের ভবিষ্যত
আর প্রিয়ার পবিত্রতা
প্রাণ বাঁচানোর তাগিদটাই যেন বড়।
খোঁজে গর্তের আশ্রয়,
কেউ বা শত্রুর কৃপা চেয়ে
পড়শির বাড়িকে দেয় দেখিয়ে
আর মৃত্যুর দলিলটা পাকা হয়।

৩.
লম্বা নখগুলো ধারালো
অন্ধকারেও আলো ঠিকরে পড়ে
শানানো দাঁতগুলোর গায়
উন্মত্ত জানোয়ার
লেজের ঝাপটে ঘূর্ণি তোলে আর
আমানবিক হিংস্রতার লালা ঝড়ায়।
মনে হয় প্রতিরোধ নিস্ফল
লাঠি আর খোঁচগুলিকে
মনে হয় বুঝি খেলনা,
ভীরু, অত্যন্ত কোমল

৪.
ধৈর্যের সঞ্চয় আসে কমে
চেতনাটা ধারালো অস্ত্র হয়ে ওঠে
এখানে ওখানে বিদ্যুৎ চমকায়
বজ্রের নিনাদ
আর আহ্লাদিপুরের ঘূর্ণির দাপে
জীবনের বেড়াগুলি ধ্বসে যায়।
হয় সব একাকার
শয়তানের বাহিনী আটকা পড়ে
কিছু রক্ত ঝরে
কিন্তু পিছু হটে নতশির সব হানাদার।

৫.
পথের নিশানা মেলে,
তরঙ্গে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়
পিশাচদের শ্রেণি আস্তানা খোঁজে মানুষ
ঝাড়ে বংশে শেষ করবে বলে।
বড়ই কঠিন, বড়ই কঠোর
তবু আছে এই পথেরই শেষে
নিশ্চিত বাঁচার বারতা,
আসবে ফিরে স্বপ্নের ভবিষ্যত
আর হারিয়ে যাওয়া সেই
প্রিয়ার পবিত্রতা।

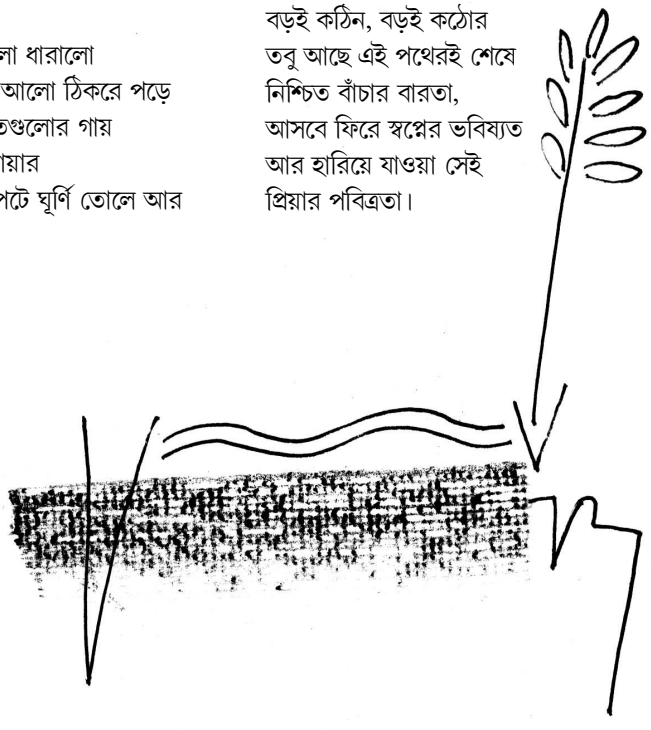

ভয় ভাঙানিয়া

কঙ্কণ সরকার

মিছিলে এসেছে উজাড় করে নগর ও গ্রাম
এই তো তোমার
নিষেধের বেড়া ভেঙে বেরুলাম!

দশদিক জুড়ে শত শত লোক
লোক না অস্ত্রাগার?
হৃদয়ের তাপে জোয়ার এসেছে ঘুচবে এ আঁধার!

সব থেকে অগণিত লোক কেবল আমার কাছে
স্বৈরশাসক, সন্ত্রাস ছাড়া তোমার
আর কী করার আছে?

কামদুনির পর জাগছে বিবেক,
জাগছে নগর ও গ্রাম
এই তো তোমার নিষেধাজ্ঞা, চোখরাঙানি
ভেঙে, ভেঙেই দিলাম!

এখন

বিনয়েন্দ্র কিশোর দাস

দায়বদ্ধ সব হাত
ষোলআনা সারাবে
সার্বিক অসুখ।

এখন কিছু হাত পাশবিক
ধর্ষণে পঙ্কিল আজ

আঁতকে উঠছে রোদ
লজ্জায় চাঁদ আরো লাল,
মন্থর বাতাসের বওয়া
পাতাবাহারের কচি গাল
হঠাৎ করে কুঁচকানো,
নারীদেহের সাথে শেষ হয়
আশা, সাধের কুঁড়ি।

কবে এই বেহায়া হাতগুলো
ভেতরে পুড়ে পুড়ে সোনা হবে,
মাতবে গাছ পরিচর্যায়,
সব ক্ষতের সেবায়।।

তোমার নিরুত্তর সময়

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার বিপন্ন পা কোন পথ খুঁজে নেবে আজ
অস্থির মোরাম রাস্তা শূন্য ছায়া
কঙ্কাল হেসেছে সারা রাত
ঠিকানাবিভ্রম হাসি উল্লাস ডানার নিচে এত ঘন শ্বাস
তোমাকে বিক্ষত লাগে...

যে ছেলেটি ভালোবাসে অক্ষরের রঙ
প্রেমবর্ণ
নাভিমূলে কস্তুরীর স্বাদ
অন্ধকার কেন লিখবে অগোছালো যাপিত সময়ে

কোথায় শ্রাবণ আঁকবে মেঘ
রক্তগন্ধ ক্যানভাসে মৃত মানুষের ভিড়
সুগম রাস্তা লেখ পায়ে পায়ে আতঙ্কিত পথ
প্রেমচিঠি হোক সব তির

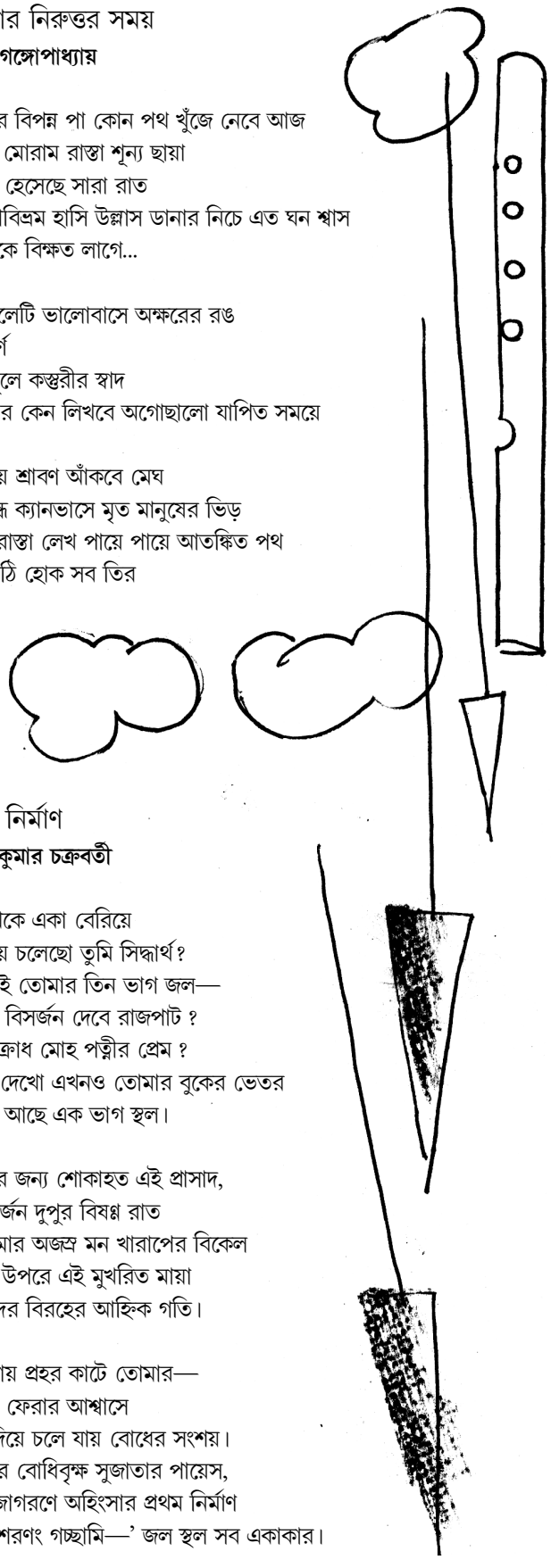

প্রথম নির্মাণ

স্বপন কুমার চক্রবর্তী

ঘর থেকে একা বেরিয়ে
কোথায় চলেছো তুমি সিদ্ধার্থ?
সামনেই তোমার তিন ভাগ জল—
জলেই বিসর্জন দেবে রাজপাট ?
কাম ক্রোধ মোহ পত্নীর প্রেম ?
ভেবে দেখো এখনও তোমার বুকের ভেতর
অক্ষত আছে এক ভাগ স্থল।

তোমার জন্য শোকাহত এই প্রাসাদ,
এই নির্জন দুপুর বিষণ্ণ রাত
প্রিয়তমার অজস্র মন খারাপের বিকেল
মাটির উপরে এই মুখরিত মায়া
আমাদের বিরহের আহ্নিক গতি।

প্রতীক্ষায় প্রহর কাটে তোমার—
কেবল ফেরার আশ্বাসে
কথা দিয়ে চলে যায় বোধের সংশয়।
বাসনার বোধিবৃক্ষ সুজাতার পায়েস,
ক্লান্ত জাগরণে অহিংসার প্রথম নির্মাণ
'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—' জল স্থল সব একাকার।

কদম্বের ছায়াতলে, তুমি এলে

আবদুস শুকুর খান

তুমি এসে দাঁড়ালে কদম্বের ছায়ায়
কী জানি কোন ঘোর মায়ায়
এই অবুঝ মন বিস্ময়ে বহু কথা বলে ওঠে
মনে মনে মিলনের স্পৃহা রেখে স্বপ্ন গড়ে যায়
সমুদ্রের মতন তীব্র উচ্ছ্বাসে
আমার অবুঝ হৃদয় অদ্ভুত এক ভাষা পেয়ে যায়।
কথা বলি আমি সবুজ পাতার কম্পিত সুরে
বাঁশের বাঁশরিতে ফুঁ দিয়ে
বিবশিত অক্ষর যাদুতে কবিতার মায়ায়।

কদম্ব তরুতলে তুমি চুল খুলে বিহঙ্গ হলে
আমি পথ ছোট করে চলে আসি সবার আড়ালে
বুকের পাঁজরে বাসা বাঁধবার জায়গা করে দিয়ে
জপ করি তব নাম।
কম্পমান পাতার পরে জ্যোৎস্নার সমুদ্র ঢেলে
চাঁদ উঠে এলে বিমূর্ত এই ধরাতলে, আমার
যৌনকাতর বিবশ অক্ষরগুলো আর বশ মানে না
কী অলৌকিকভাবে ছায়ার শরীরে, অনৃত ছায়া রেখে
বাড়িয়ে দেয় জীবন নয় পৃথিবীর দেনা।

তুমি এই শূন্য করতলে রেখে দিলে তোমার সুধা
আমার স্বপ্ন ভাষা পায়, আলোয় রঞ্জিত হয় বসুধা

বর্শাফলক

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

[সংবাদ : তৃণমূলি আক্রমণে প্রেসিডেন্সির গবেষণাগার বিধ্বস্ত]

একটা বর্শাফলক আছে পড়ে
ফলার ঘায়ে খণ্ডখণ্ড বিকার
কেবল বিকার টিউব তো নয় কোনো—
ছিন্ন ছবি বোধ বোধি আত্মার।

কৃতকর্মের চাইছে সবাই জবাব
কুল বাঁচিয়ে বলতেই হয়—ভুল;
ও-বর্শা নয় একটুও তাঁর তাঁবে—
শত্রুর কু-চক্রান্ত নির্ভুল।

একটা বর্শাফলক আছে পড়ে
বর্শা তীব্র দক্ষ হাতের খেলায়
বর্শা নিজে লক্ষ্য কি ত্যাগ করে!
দ্বারীর হাতে ব্যাধের হাতে ধায়।

একটা বর্শা গবেষণার ঘরে
একটা বর্শা মানুষ করে তাগ,
শত বর্শা ঘর পাহারায় দ্বারে—
পুণ্য ক্রোধে সহস্র পুন্নাগ।

প্রতীক

কণিষ্ক আচার্য

ঢাউস এঁকেছে ছবি !
সততার উজ্জ্বল প্রতীক শিরোধার্য করে—
অগণিত ভক্তবৃন্দ!
মৃদঙ্গ বাজিয়ে চলে—স্তাবক ঘুঙুর।
স্তব স্তুতি গানে—ধান্দাবাজি।
দু-হাতে লুটের টাকা কিছু তুলে নিতে
সততার রামধুন! বদলের দিন আনবে
বদলের দিন!—আর গণ্ডাগণ্ডা রুটি মিলবে টাকায় টাকায়

গণতন্ত্র সহজলভ্য হয়ে ঘরে ঘরে বিক্রি হবে—
টাকা কেজি দরে
বেকারের দল সাত সকালেই রকবাজি ছেড়ে—
সাইরেন বাজার আগে কারখানামুখো হবে
—ছিমছাম শ্রমিক-পোশাকে।

এসব আশাকে যারা উস্কে দিল—
তুমি তাহাদের একজন! স্বজনের দলে।
ছলে, বলে, হীন কৌশলে তুলেছিলে ধূয়া।

সব আশা ভস্মসাৎ—
এখন সম্বিত এলে বুঝে গেছে সবে—
যা শুনেছে যা বুঝেছে—
সবটাই বুক্‌নিবাজি, সবটাই ভুয়া।

দূরে কোথাও

পরেশ ঘোষ

তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চলতে
কখন যে ফুরিয়ে যায় পথ টের পাই না
মেঘেদের গর্জন শুনে আবডালে লুকোই মুখ
শনশন বাতাস ভারি হয়ে ওঠে
তারপর ঝমঝম বৃষ্টি—
এলোমেলো লন্ডভন্ড চতুর্দিক।

মেঘপরীদের উদ্যত হুঙ্কার বিদ্যুতের উপগম
আদিগন্ত চরাচরে ম্রিয়মান আলো
সারা প্রান্তর জুড়ে বিষণ্ণ সজীবতা
নির্জন ঘুটঘুটে অন্ধকার...
চেনা পথ আজ আয়ত অচেনা
দূর বন্ধুর পথে পৌঁছাব ঠিক।

জানালা

সিদ্ধার্থ সিংহ

ঘর বানাচ্ছ, বানাও
মনে করে দুটো জানালা বানাতে ভুলো না।

একটা জানালা দিয়ে ছেলে যাতে উড়ে যেতে পারে
রামধনুর রং মাখতে পারে সারা গায়ে
মেঘের ভেলায় চেপে ভেসে যেতে পারে যেখানে খুশি,
আর অন্য জানালা দিয়ে পা টিপে টিপে এসে
যাতে শুয়ে পড়তে পারে বিছানায়।

ঘর বানাচ্ছ, বানাও
মনে করে দুটো জানালা বানিও।

একটা জানালা দিয়ে এসে
ছেলেকে যাতে বকাঝকা করতে পারো
কষাতে পারো দু-একটা চড়থাপড়,
আর অন্য জানালা দিয়ে এসে
ঘুমন্ত ছেলের কপালে যাতে চুমু খেতে পারো।

ঘর বানাচ্ছ, বানাও
মনে করে দুটো জানালা বানাতে ভুলো না
আর হ্যাঁ, সে জানালায় যেন
গরাদের কোনও ছায়া না থাকে...

উল্টোপাল্টা

সত্যনারায়ণ মাজিলা

আয় রে আয় খোলা দোর
খুনি ডাকাত এবং চোর
রঙ পাল্টে সবুজ কর
সংস্কৃতির মাতব্বর।

সভ্যতা যে কুপোকাত
চোর-পুলিশে পাতায় স্যাঙাত
মন্ত্রী-নেতার মহব্বত
এরাই দেশের ভবিষ্যত।

কে যে কাকে ধরে
পুলিশ আছে ঘরে
আলস দেহ মোটা ভুঁড়ি
তবুও নড়ে চড়ে।

কারা এলি কারা গেলি
হিসেব রাখা ভার
কার সাথে কার কোলাকুলি
শূন্য কারাগার।

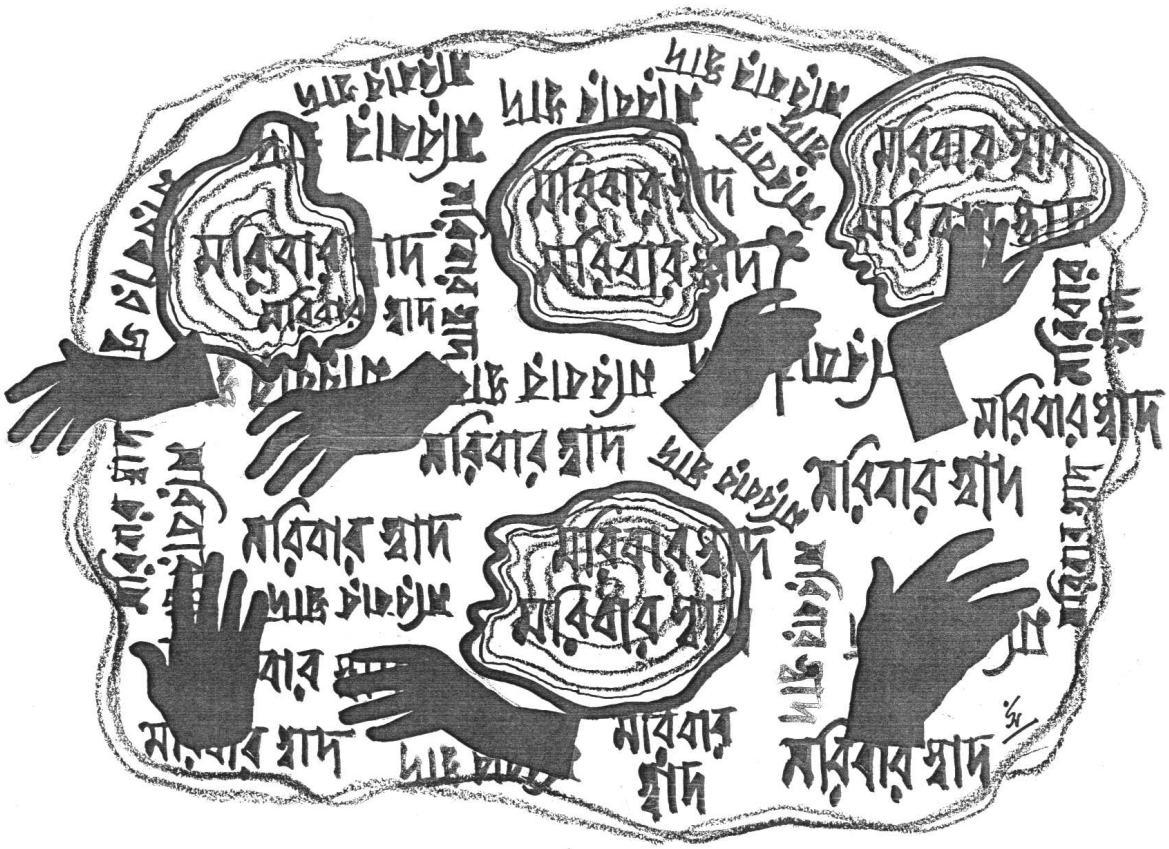

মরিবার সাধ

ডা. গীষ্পতি চক্রবর্তী

শান্তিপিসিকে আমি দেখিনি। শান্তিপিসির একটা বড় ফটো ছিল আমাদের বাড়িতে। তখন আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। বাড়িতে প্রচুর লোক। একটা ঘরে দেওয়ালে শান্তিপিসির ফটো ঝোলানো ছিল। আরও কিছু ফটো ঝোলানো ছিল নানা ঘরে। শান্তিপিসির ফটোটা ছিল বেশ বড়ো। প্রায় দু-ফুট বাই দেড় ফুট সুন্দর পালিশ করা কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো সাদা-কালো ফটো। হাসিমুখ, বুক অবধি ছিল ফটোটা। শরীরের বাকি অংশ ছবির মধ্যে ছিল না। শান্তিপিসির ফটোটা কিছুটা পাশ থেকে তোলা। মুখের একদিকটাই দেখা যেত। হালকা হাসি লেগে মুখে।

ছোটোবেলায় যেদিন প্রথম জানতে চাইলাম কার ছবি ওটা, বড়রা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল উনি তোমার শান্তিপিসি। আমরা এই একান্নবর্তী পরিবারে এসে যোগ দিয়েছি যখন আমার বয়স প্রায় পাঁচ বছর তখন। গোটা বাড়িটাকে তখন আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। ওই বয়সে সব বিষয়েই কৌতূহল। কৌতূহল থেকেই জানতে চেয়েছি ছবির মানুষটা সম্বন্ধে। ওই একটি প্রশ্নে চারপাশের পরিবেশটা যেন পাল্টে গেল। আমার এখনও মনে পড়ে। সবাই হঠাৎ চুপ করে গেল শুধু ছবির পরিচয়টুকু দিয়ে। হঠাৎ সবাই নানা কাজের অছিলায় এদিক-ওদিক চলে গেল। পরে আমি মাকে বিরক্ত করেছি শান্তিপিসির বিষয়ে নানা প্রশ্ন করে। শান্তিপিসি এক সম্পর্কে আমাদের পিসি। বাবার কোনো এক সম্পর্কের বোন। সে সম্পর্কের নাড়ি-নক্ষত্র আজও আমার অজানা। যেদিন প্রথম জানলাম শান্তিপিসি আত্মহত্যা করেছে, সেদিন মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল। নিজের জীবন নিজে শেষ করে দেওয়ার নাম আত্মহত্যা, তখন তা জেনেছিলাম। বাঁচা ব্যাপারটাই স্বাভাবিক। মৃত্যু একটা অদ্ভুত ব্যাপার, যে ব্যাপারটা সম্বন্ধে এক ভয়-মিশ্রিত বিস্ময় তখন আমাদের মতো ছোটোদের মন ছেয়ে থাকত। আমরা ছোটোরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে ব্যাপারটা বুঝতে চাইতাম। বুঝতাম না কিছুই। আমাদের কথা থমকে যেত অদ্ভুত এক স্তব্ধতায়। এক দিদির কাছে জেনেছিলাম, ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে শান্তিপিসি নিজেকে শেষ করেছিল কোনো এক অশুভ লগ্নে। আমাদের বাড়িতে তখন মাঝে মাঝেই বড়দের মধ্যে ঝগড়া হতো। সে ঝগড়ার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতাম না। কখনও কখনও মা-জেঠিমারা চোখ মুছতে মুছতে বলত—শান্তি মরে শান্তি পেয়েছে। এ সংসারে শান্তির পথ ধরলে তবে মুক্তি। বুঝতাম, কোনো গভীর দুঃখ, বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মরে যাওয়া

ছাড়া যে অন্য কোনো পথ নেই সে কথা বলছে বড়রা, তখন অবাক হতাম। কী এমন হল যে মরতে হবে? এ প্রশ্নটা ঘুরপাক খেতো মনের মধ্যে। তারপর সে-সব প্রশ্ন মন থেকে মুছে যেতেও সময় লাগত না। শুধু ছবিটার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে মনে হতো, কী সাংঘাতিক। চলন্ত রেলগাড়ির সামনে নিজেকে ছুঁড়ে দিল?

এক শীতকালের বিকেলের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তখন আমি স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ি। হঠাৎ শুনলাম, কে একটা মেয়ে নাকি চাষির পুকুরে কলসি আর গামছা নিয়ে মরতে গিয়েছিল। তার মরে যাওয়ার চেষ্টায় বাদ সেধেছে পুকুর পাড়ের একটা বড় ছেলে। ওই পুকুরটা ছিল একটা খামারের মধ্যে। জায়গাটা ফাঁকা, আমাদের বাড়ি থেকে গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে পুকুরটা চোখে পড়তো। ওই খবরে আমরা পড়ি-মরি করে ছুটলাম পুকুরের দিকে। গিয়ে দেখি ইতিমধ্যে প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে। বছর কুড়ির একটা মেয়ে ভিজে কাপড়ে মাটিতে বসে। কোন বাড়ির মেয়ে তা বোঝা গেল না। তাকে ঘিরে উৎসুক ভিড়। সবাই একবার দেখতে চায় মেয়েটাকে। যে ছেলেটি তাকে বাঁচিয়েছে তার প্রতাপ তখন দেখে কে? সে হম্বিতম্বি করছে। একে ডাকছে, ওকে ডাকছে, মাঝে মাঝে ধমকাচ্ছে মেয়েটাকে। বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। তারপর সবাই মিলে ওই মেয়েটাকে নিয়ে চলল ছেলেটার বাড়িতে। আমরাও চললাম জনতার সঙ্গে। একটা নতুন মজা পাওয়া গেছে। চলতে চলতে যা শুনলাম, তার মোদ্দা কথাটা হল, কে একজন মেয়েটাকে নাকি বিয়ে করবে, এরকম ঠিক ছিল। সে নাকি শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকে বিয়ে করেনি। এই দুঃখে মেয়েটা নাকি মরতে এসেছিল। এসব নাকি মেয়েটাই বলেছে। আমরা পৌঁছলাম ছেলেটার বাড়ি। এখনও মনে আছে, টালির চালের ছিমছাম বাড়ি। সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। জনতা সেখানেই দাঁড়িয়ে। মেয়েটা বাড়ির দাওয়ায় মুখ নিচু করে বসে। রক্ষাকর্তা ছেলেটা, যাকে যুবক বলা চলে, সমানে বকাঝকা করছে সবাইকে। তারপর আমাদের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কী চাই, কী চাই এখানে? আমরা পিছু হঠলাম। আবার একটু পড়ে ঢুকলাম উঠোনে। এক সময় হুঙ্কার যখন মাত্রা ছাড়ালো, তখন আর সাহস করে ফিরে যেতে পারিনি শেষটা দেখার জন্য। পরে শুনেছিলাম, গোটা ব্যাপারটার নাকি মধুর পরিসমাপ্তি হয় রক্ষাকর্তা ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটার বিয়ের মধ্য দিয়ে। সে বাড়ি আজও দেখতে পাই। টালির চালের বদলে পাকাবাড়ি হয়েছে সেখানে। সেই মেয়ে এখন প্রৌঢ়া। হয়তো বাতের চিকিৎসা করাচ্ছে। হয়তো হাঁটু ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নাতি-নাতনিদের শাসন করছে। হয়তো বাতের ব্যথায় ভুগতে ভুগতে বলে—ভগবান, আমি যমেরও অরুচি? সে সময়ে তার কি মনে পড়ে, কোনো এক শীতের বিকেলে সে প্রায় ধরে ফেলেছিল যমের হাত!

রাহুল স্কুলের নামকরা ছেলেদের একজন। প্রায় সব বিষয়ে সবচেয়ে বেশি নম্বর পায়। প্রথম স্থান তার বাঁধা। সাফল্য থেকে সাফল্যে সে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ওর বাবা খুব খুঁতখুঁতে। ছেলে কার সঙ্গে মিশছে সেদিকে ভদ্রলোকের সজাগ দৃষ্টি। মনে পড়ে, রাহুল একদিন রাস্তায় আমার সঙ্গে গল্প করছিল। দূর থেকে ওর বাবা তা লক্ষ করে। পড়ে শুনেছিলাম, ওর বাবা আমার বিষয়ে আদ্যোপান্ত খোঁজ নিয়েছে। রাহুল এভাবেই মানুষ হচ্ছিল ছোটো থেকে। হায়ারসেকেন্ডারিতে রাহুল এক থেকে দশের মধ্যে হল। ডাক্তারি পড়তে ঢুকল। বিপর্যয়ের শুরু হল এবার। শুনতে পেলাম রাহুল নাকি পরীক্ষা ড্রপ দিচ্ছে। কী ব্যাপার? শুনলাম, স্রেফ স্নায়বিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। পড়ায় মন দিতে পারছে না। ডাক্তারি পড়ার এক ধরনের একঘেয়ে চাপের মুখে কারও কারও এরকম হয়। অবাক হলাম। এত ভালো ছেলে! পরীক্ষা দিতে পারছে না? সে যাই হোক, এভাবে একসময়ে ও ডাক্তারি পাশ করল। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হয়ে সরকারি চাকরিতে যোগ দিল। ঘটনাচক্রে আমরা এক জায়গায় কাছাকাছি হলাম ডাক্তারির সুবাদে। মনে পড়ে, অনেক জোর করে একদিন বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম ওকে। গেলাম একদিন ওর ভাড়াবাড়িতে। ওর স্ত্রী বলছিল—বড় চুপচাপ, কোথাও যেতে চায় না। দেখুন না, ঘর থেকে বার করতে পারি না। এরপর অনেকদিন দেখা হয়নি। হঠাৎ খবর পেলাম, রাহুল দেশের বাড়িতে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে। রুগীরা যখন নিচে ওর জন্য অপেক্ষা করছে ও তখন দোতলার ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। সবদিক থেকে সফল বলতে যা বোঝায়। সাধারণ মানুষের চোখে, ওর জীবন ছিল সেরকম। কী ছিল না ওর জীবনে, যার জন্য গোটা জীবনটাই অসহনীয় হয়ে উঠল ওর কাছে? জানা যাবে না কোনদিন। চাপা স্বভাবের ছেলে ছিল। কিছুই লিখে রেখে যায় নি। হঠাৎ কোন মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল সবার চোখে ব্রিলিয়ান্ট একটা ছেলে।

জীবন বড় জটিল। তবুও জীবন একটা নিশ্চিত ব্যাপার। কেন যে কেউ হঠাৎ জীবনের নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মহাঅনিশ্চিত, অচেনা জগতে ঝাঁপ দেয় তা আজও রহস্যে ঘেরা। পরিণত বয়সে মৃত্যু স্বাভাবিক। সাধারণভাবে মানুষ বাঁচতেই চায়। তবুও কারও কারও মনে হঠাৎ এক বিপরীত অনুভূতির জন্ম হয়। জীবনের চেয়ে মরণ তার কাছে হয়তো অনেক চেনা জগত বলে মনে হয়। হয়তো সে মরণের মাঝে কোনো নিশ্চিত কিছু একটা দেখে, যা সে কাউকে বলতে পারে না।

তাই আত্মহত্যা নিয়ে অনুসন্ধানের শেষ নেই। উপরের ঘটনাগুলো সত্যি। শুধু নায়ক-নায়িকাদের নামগুলোর অদল-বদল করতে হয়েছে। আত্মহত্যা নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়েছেন। মানুষের সভ্যতার প্রাচীন চেনা-জানা ইতিহাস কত আত্মহত্যার কথা বলে গেছে। যখন জীবন আজকের চেয়ে সরল ছিল। আজকের জটিল নগর সভ্যতাকে যখন অনেকে আত্মহত্যার একটি অন্যতম কারণ বলে মনে করেন, তখন আত্মহত্যার প্রবণতা প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে এলো কীভাবে তা এখনও অনুসন্ধানের বিষয়।

সাধারণভাবে অনেকে মনে করেন, মেয়েরা বেশি আবেগপ্রবণ ও আত্মহত্যা প্রবণ। পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য কথা বলছে। ছেলেরা আত্মহত্যা করে মেয়েদের চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশি সংখ্যায়। যে-কোনো বয়সের পুরুষ-নারীর মধ্যে এই প্রবণতা পুরুষদের মধ্যেই সবসময় বেশি।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়তে থাকে। ছেলেদের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ বছরের পর আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যায় সবচেয়ে বেশি; মেয়েদের মধ্যে প্রবণতা সবচেয়ে বাড়ে পঞ্চান্ন বছর বয়সের পর। আমাদের দেশে মায়েরা প্রায়ই বলে থাকে—মেয়ে হয়ে জন্মানো অভিশাপ; মেয়ে জীবন মানে পদে পদে জ্বালা। খবরের কাগজে গৃহবধূর

আত্মহত্যা ইত্যাদি খবর ছাপা হয় প্রচুর। পরিসংখ্যান উল্টো গাইছে কেন? বিজ্ঞানীরা মাথার চুল ছিঁড়ুক পরিসংখ্যান নিয়ে।

অনেকে বলেন, পশ্চিমি দুনিয়ায় স্বর্গসুখ। দেখে এসো গিয়ে। চারিদিকে তাকিয়ে চোখ ফেরানো যাবে না। তাহলে সাহেবরা নিজেদের খুন করে কেন আমাদের চেয়ে বেশি হারে? সত্যি খবরটা শুনুন। প্রতি তিনটি আত্মহত্যার মধ্যে দুটি করে সাদা চামড়ার পুরুষেরা।

আমার পরিচিত একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা একদিন দুঃখ করে বলছিলেন—বাবা, আমার সব চিন্তা আমার এই ছেলেকে নিয়ে। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মাঝ-বয়সী ছেলের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। হাজার বার বললাম বিয়েটা কর ঠিক সময়ে; করল না। বাবা, বড় অভিমানী হয় অবিবাহিত ছেলেরা। মায়ের মন তোমরা বুঝবে না। সব সময় ভয় হয়, কিছু করে বসবে না তো। টুক কথাতেই মুখ ভার করে। বাবা মরেও শান্তি পাব না ওর জন্য।

পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে মায়েদের পক্ষে। বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিতদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা প্রায় দ্বিগুণ। বিবাহিতের সন্তান থাকলে আত্মহননের সম্ভাবনা আরও কমে। সংসারের হাজার ঘোর-প্যাঁচে মরবার ফুরসতই পায় না। মা-পিসিমারা হাজার কাজে নাস্তানাবুদ হতে হতে প্রায়ই বলে—দাঁড়া, আমার এখন মরবার সময় নেই; জলটা নিজে গড়িয়ে নিতে পারিস না?

সমাজে উপরে উঠবার ইঁদুরদৌড়ে পরিমরি করে ছুটছে লাখো লাখো মানুষ। তথাকথিত 'বড়' হওয়ার বাসনায় এক নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায় নেমেছে এ যুগের সর্বস্তরের মানুষ। ওপরে উঠছে যারা, তাদের অনেকেই এক ধরনের ঠাটবাট নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা অনেকেই জানতে পারে না, তাদের নিজেদের মনের কোনো এক গোপন কুঠুরিতে চাকুতে ধার দিচ্ছে তার নিজের আরেক সত্তা। হঠাৎ কোনো এক অসর্তক মুহূর্তে সে হত্যা করে নিজেকে কোনো এক অশুভ সংকেতে। হ্যাঁ, তথাকথিত 'হাই-স্ট্যাটাস'-এ যারা 'সুখে' আছেন, তাদের মধ্যে আত্মহত্যার হার নেহাতই সাধারণ মানুষ বলে সমাজ যাদের স্বীকৃতি দেয় তাদের চেয়ে বেশি।

এবার খোদ ডাক্তারদের কথায় এলে অবাক হতে হবে। নানা ধরনের পেশাগত শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হন, তাদের সম্মিলিতভাবে ধরলে দেখা যায় ডাক্তারদের মধ্যে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। ডাক্তারদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা কেন যে বেশি তা আজও দুর্বোধ্য থেকে গেছে। ইউনাইটেড কিংডমে ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে সমীক্ষা করে দেখা গেছে, সেসব দেশে ডাক্তারদের মধ্যে আত্মহত্যার হার অন্যান্য অচিকিৎসক মানুষদের চেয়ে প্রায় দুই থেকে তিনগুণ বেশি। এসব 'স্বপ্নের দেশের' ডাক্তাররা কি খুব অসুখী? আবার ডাক্তারদের মধ্যে মনোবিদদের মধ্যে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। মনের অসুখে মানুষ যায় মনোচিকিৎসকদের কাছে। তাদের নিজেদের মনের অসুখে তারা যায় কার কাছে? নাকি হাজার রুগীর মনের ব্যথা নিরাময় করতে করতে তারা জানতেও পারে না, তাদের মনের গভীরে জমা হয়েছে এক বুক হতাশা, কোনো অজানা-অচেনা কারণে। তারপর একদিন হতাশার কালো মেঘ যখন ছেয়ে ফেলে তাদের মনের সবকটা কুঠুরি, তখন আলোহীন ওই কুঠুরিতে দাঁড়িয়ে হয়তো তার মন বলে ওঠে, আর পারছি না; এবার বিদায়। হয়তো রাহুল এভাবেই চলে গেল। মনে আছে নিশ্চয়, রাহুল ছিল মনের ডাক্তার।

অবাক হওয়ার মতো খবর, সংগীতজগতের সঙ্গে যাঁরা গভীরভাবে সম্পর্কিত, যেমন, নানা বাজনার মুর্ছনায় যারা মানুষের মন আনন্দে ভরিয়ে তোলেন, তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সাধারণের চেয়ে বেশি। অতি সংবেদনশীল মনের অধিকারী শিল্পজগতের মানুষেরা। তাই বোধহয় একটু বেশি অভিমানী। তাই কি সইতে পারেন না কোনো মনো-যাতনা? এসব শুধু খুঁতখুঁতে বিজ্ঞানীদের হিসাব-নিকাশ। শিল্পীরা মাথা নেড়ে বলতেই পারেন—মানি না, এসব মানি না; এসব ভুল হিসাব, এসব ডাক্তারদের উর্বর মাথার ফসল।

এসব হিসাব নিকাশ থেকে ছাড় পায়নি আইনজ্ঞরাও। উকিল, ব্যারিস্টার থেকে পুলিশের বড়, মেজ, সেজো কর্তা, যারা আইনের রক্ষক, তাদের সবার মধ্যে আত্মহননের হার সাধারণের চেয়ে বেশি। এসব দুর্নাম করার জন্য আইনের মারপ্যাঁচে পড়ে হাজতবাস হবে কিনা জানি না, তবে আইন-ব্যবস্থায় হাজার হতাশার কথা বলে থাকেন অনেক উকিল-বন্ধু। সেসব কথা ফাঁস করে তাদের রাগ বাড়িয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরানোই ভাল।

যারা কর্মহীন তাদের মধ্যে আত্মহননের হার বেশি। কোনো দেশে অর্থনৈতিক মন্দার সময় আত্মহত্যার হার বাড়ে। মনে পড়ে কৃষক আত্মহত্যার কথা। হাজার হাজার চাষি আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে হার মেনে নিজেকে শেষ করেছে। এসব খবর খবরের ফুটনোট হয়ে গেছে। এইসব হতাশ মানুষদের চিকিৎসা কে করবে? ডাক্তারের বিদ্যের বাইরে এদের রোগ নিরাময়ের ওষুধ। এদের হতাশা কোনো অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টে কমবে না। এদের জীবনের আর্থিক বিপর্যয়ের কারণ সরকারি নীতি।

নানা ধরনের শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে আত্মহত্যার প্রবণতার সম্পর্ক আছে। কিছু রোগ মানুষকে আত্মহত্যাপ্রবণ করে তুলতে পারে। এখানে ক্যানসারের কথা চলে আসে সবার আগে। ক্যানসার হয়েছে শুনলে বহু মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। হতাশা তাদের মনে জীবন সম্বন্ধে উদাসীনতার জন্ম দেয়। বাঁচার চেয়ে মরাই শ্রেয়। মালটিপ্‌ল্ স্কেলরোসিস, হান্টিংটন্‌স্ রোগ ইত্যাদি নানা ধরনের রোগ মানুষকে আত্মহত্যাপ্রবণ করতে পারে। যারা পেপটিক আলসারে ভোগেন, যাদের লিভার সিরোসিস আছে, তাদের মধ্যে আত্মহত্যার হার সাধারণের চেয়ে বেশি। আবার যাদের প্রস্টেট অপারেশন হয়েছে ও যারা বারে বারে ডায়ালিসিস নেন কিডনির অসুখের কারণে, আত্মহত্যার প্রবণতা তাদের মধ্যে সুস্থ সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি। কিছু ওষুধ, যেমন স্টেরয়েড, রেসারপিন ইত্যাদি ওষুধ দীর্ঘদিন খেলে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়তে পারে। মূলত মনে হতাশার জন্ম দিয়ে এই জাতীয় ওষুধ কোনো কোনো মানুষকে আত্মহত্যাপ্রবণ করে তোলে।

কিছু মানসিক রোগ, যেমন দীর্ঘস্থায়ী হতাশা, সিজোফ্রেনিয়া, নানা ধরনের নেশার বস্তু দীর্ঘদিন ব্যবহার আত্মহননের প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে মনে। যাঁরা আত্মহত্যা করেছেন বা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় শতকরা পঁচানব্বই জন নানা ধরনের মানসিক রোগের শিকার। যাঁরা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন, অথচ বেঁচে গেছেন কোনোভাবে, তাদের জীবনে প্রেমে বিফলতা, অসুখী দাম্পত্য জীবন, এসব রসালো আলোচনার বদলে মনের রোগের কথা ভেবে একটু সুপরামর্শ দিলে অনেকে উপকৃত হবেন। 'যা হয়েছে বেশ হয়েছে', 'ব্যাটাদের খুব ইয়ে হয়েছিল', 'মাটিতে পা

পড়ত না'—এসব চিন্তাও কি একধরনের অসুস্থতা নয়? এ খুব চেনা-জানা অসুখ; ওষুধ অমিল। রোগের নাম —পরশ্রীকাতরতা।

আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান যাঁরা করেছেন, তাদের মধ্যে যাঁর নাম সবার আগে উঠে আসে, তিনি পেশায় ডাক্তার ছিলেন না। তিনি একজন ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী। নাম এমিল দুরখেইম। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে উনি সামাজিক অবস্থানের নিরিখে আত্মহত্যার কারণ খুঁজতে শুরু করেন। তাত্ত্বিক জটিলতায় না গিয়ে এটুকু বলা যায়, সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যার ব্যাখ্যা সম্ভব। অনুসন্ধানের এই ক্ষেত্র তো ডাক্তারদের একার মৌরুসিপাট্টা নয়।

সিগমন্ড ফ্রয়েডের কথা না বলে মনোজগতের রোগের আলোচনা অসম্ভব। মনের অনেক জটিল গতিবিধি উনি অনুসরণ করেছেন অশেষ ধৈর্য সহকারে। ফ্রয়েড মনে করতেন অন্যকে হত্যা করার তীব্র মানসিক ইচ্ছা গোপনে মনের নানা জটিল ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় নিজের বিরুদ্ধে ঘুরে গিয়ে একজনকে আত্মহত্যাপ্রবণ করে তোলে। এ তত্ত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা চলতে পারে। আমরা ওপথে হাঁটছি না।

ফ্রয়েডের তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে কার্ল মেলিনজার লিখলেন—'Man Against Himself'। উৎসাহী পাঠক লেখাটা পড়ে নিতে পারেন। ফ্রয়েডের তত্ত্বকে আরো নানাভাবে ব্যাখ্যা করে উনি ওনার ধারণাকে লিখে রেখে গেছেন ওই লেখায়।

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাষায় যারা আত্মহনন নিয়ে নানা চর্চা করেন তাদের আত্মহত্যা-বিশারদ বলে চিহ্নিত করা হয়। তবে কেউ নিজেকে আত্মহত্যা-বিশারদ বলে প্রচার করেন না। আমাদের দেশে এখনও কোনো পরিবারে কেউ আত্মহত্যা করলে সেই পরিবার কলঙ্কিত হয়। আত্মহত্যাপ্রবণতার সামান্য লক্ষণ থাকলেই যে ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার একথা কেউ ভাবে না। কারণ, 'পাগলের ডাক্তারের' কাছে যাওয়াটাও সামাজিক সম্মানের হানি ঘটাতে পারে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষেরা নানা 'ফ্যান্টাসি'-তে ভোগেন। কল্পনায় তাঁরা মিলিত হতে চান কোনো প্রিয় মৃত ব্যক্তির সঙ্গে। এখানকার চেয়ে ঢের ভালো কোনো অলীক স্বর্গের কল্পনাও কোনো মানুষকে জীবন সম্বন্ধে উদাসীন করে তুলতে পারে। কল্পলোকের বাসিন্দাদের দলবদ্ধভাবে আত্মহত্যার নজিরও আছে। এসব মানুষেরা সমমনস্ক ও অন্যকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করতে পারে। মানুষ কিছু আশাকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকে। সম্পূর্ণ 'আশাহীন' মানুষ সহজেই নিজেকে শেষ করে ফেলতে পারে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন মনোজগতের জটিল গতিবিধিকে সরল ছাঁচে ফেলতে। ব্যাপারটা কতদূর করে ওঠা সম্ভব তা বলবে ভবিষ্যৎ।

সুইডেনের ক্যারোলিন্সকা ইনস্টিটিউটের একদল বিজ্ঞানী নতুনভাবে অভিনব অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখলেন মস্তিষ্কের সেরোটিনিনের পরিমাণ কমে গেলে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়তে পারে। মৃত্যুর পর মৃতের মস্তিষ্ক কাটাছেঁড়া করে দেখা গেছে, আত্মহত্যা যারা করেছেন, সেইসব হতভাগ্যের মস্তিষ্কে সেরোটোনিনের পরিমাণ অন্যভাবে মৃত ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের তুলনায় কম। খুব গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত বিশ্লেষণ সন্দেহ নেই। এই অনুসন্ধানকারীরা বলছেন, মস্তিষ্কের সেরোটোনিন কম থাকলে আত্মহত্যার প্রবণতা যে বাড়তে পারে তা জীবিত মানুষদের মস্তিষ্কের তরল রস পরীক্ষা করে বলা সম্ভব। আজব ব্যাপার। তাহলে কি সব হতাশা কাটাবে সেরোটোনিন?

১৯৯৭ সালে মারগাউ হেমিংওয়ে আত্মহত্যা করলেন। কে মরগাউ হেমিংওয়ে? আর্নেস্ট হেমিংওয়ের চার পুরুষের মধ্যে পাঁচজন আত্মহত্যা করেছেন। মরগাউ হেমিংওয়ে আত্মহননকারীদের মধ্যে পঞ্চম ব্যক্তি। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের পরিচয় পাঠককে নিশ্চয় দিতে হবে না। কথাটা উঠে এল এই কারণে যে কোনো কোনো পরিবারের মধ্যে আত্মহননের প্রবণতার আধিক্য দেখা যায়, একথাটা ভুল নয়। বিখ্যাত মানুষদের পরিবারে এসব ঘটলে তা খবরের মর্যাদা পায়। বিয়ের সম্বন্ধ করবার সময় অনেকে খোঁজ নেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, পরিবারে কেউ অপঘাতে মরেছে কিনা ইত্যাদি। বহুদিন থেকেই মানুষ এসব দেখে আসছে। সবকিছু ব্যাখ্যা করতে না পারলেও অভিজ্ঞতা মানুষকে অনেক সময় বলে দেয় কোথায় চোখ রাখতে হবে।

মলিকিউলার জেনেটিক্সের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যার বস্তুগত কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে এখন। ট্রিপটোফ্যান হাইড্রক্সিলেস নামে একটি উৎসেচক সেরোটোনিন তৈরির সহায়ক। মানুষের শরীরের যে জিন এই উৎসেচক গঠনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে তার কিছু বিচ্যুতি মস্তিষ্কে সেরোটোনিনের পরিমাণে তারতম্য ঘটাতে সক্ষম। একই ফলশ্রুতিতে আসতে পারে আত্মহননের ইচ্ছা। হঠাৎ একদিন ঝুলে পড়া, বা গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ার নেপথ্যে থাকতে পারে ওই জিনের সূক্ষ্ম কারিকুরি।

আত্মহত্যা প্রতিরোধযোগ্য। মানসিক অবসাদে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি চিকিৎসার সুযোগ পান, তাঁর জীবনের গতিপথ ঘুরে যেতে পারে। যে হতাশ মন তাঁকে দেখিয়ে দিচ্ছিল কড়িকাঠ, নির্জন গঙ্গার পাড়, রেললাইন, কীটনাশকের শিশি, সেই মন ফিরে পেতে পারে বাঁচার তাগিদ। আসলে রোগটাকে রোগ হিসাবে চেনাটা জরুরি। বিষাদগ্রস্ত মনের জন্য ওষুধ আছে। ওষুধ আছে নানা মনের রোগের। কিন্তু মন তো অনেক জটিল পথে হাঁটতে পারে। কোনটা মনের রোগ আর কোনটা নয় তা বোঝা অনেক সময় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। চোখের জল পড়লেই হতাশার চিকিৎসা লাগে না। মন ভালো নেই বললেই মনের অসুখের কথা ভেবে আকুল হওয়া অর্থহীন। মনের জগতে সুস্থতা অসুস্থতার সীমা খুব অস্পষ্ট।

আমেরিকার টুইন টাওয়ার, পেন্টাগনে যে লোকেরা প্লেন ছিনতাই করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কোন আর্দশ, কোন জীবনবোধ তাকে এভাবে আত্মঘাতী করে তুলেছিল তা ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। রাজীব গান্ধীকে মেরেছিল এক আত্মঘাতী মহিলা। শ্রীলঙ্কার তামিলদের বহু যুবক-যুবতী 'এল.টি.টি.ই'-র আত্মঘাতী বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল। তাদের গলায় মালার মতো ঝুলতো সায়ানাইডের ক্যাপসুল; মরণকে পাশে নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখতো স্বাধীন তামিল রাষ্ট্রে। আফগানিস্থানে আত্মঘাতী হামলায় বিপর্যস্ত ন্যাটোবাহিনী। নীরদ সি. চোধুরী গোটা বাঙালি জাতিকে আত্মঘাতী বলে চিহ্নিত করলেন। রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনীকে স্বেচ্ছায় মরে প্রমাণ করতে হল, সে মরেনি।

জীবন বিচিত্র। স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য মানুষ আইনের পরিবর্তন চাইছে। বাঁচার অধিকারের মতো মরার অধিকারও অধিকারের মধ্যে পড়ে, অনেকে এভাবেই ভাবেন। বাঁচা-মরা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই স্বেচ্ছামৃত্যু আজ পৃথিবীর

কিছু দেশ মেনে নিয়েছে। হল্যান্ডে স্বেচ্ছামৃত্যু আইনসিদ্ধ। স্বেচ্ছামৃত্যুর স্বপক্ষে সংগঠন গড়ে উঠেছে আমেরিকায়।

কৃষিতে মন্দা এদেশে আত্মঘাতী করল লক্ষ কৃষককে, সরকারের নীতি ওদের দেখিয়ে দিল মরণ-পথ। লাখ চাষির মরণ ঘটালো এক নিষ্ঠুর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। 'জিনের' হাত আছে কি এসব মরণে?

আসলে মানুষের বাঁচা-মরার ব্যাপারটা শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপার ভাবাটা বোধ হয় অতিসরলীকরণ। সমাজ, রাষ্ট্র সবই জড়িয়ে মানুষের বাঁচা-মরার সঙ্গে। শুধু জিনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায়মুক্ত হতে পারি কি আমরা? ডা. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আত্মহনন ব্যাখ্যা করা যাবে না জিনের তত্ত্ব দিয়ে। নিরলস প্রচেষ্টায় যখন 'টেস্ট টিউব বেবি'-র কল্পনাকে উনি প্রায় ধরে ফেলেছেন হাতের মুঠোর বাস্তবতায়, তখন কোনো অজানা কারণে ওনার হাত থেকে সাফল্যের চাবিকাঠি চুরি করল অদৃশ্য কোনো হাত। হয়তো সঠিকভাবে জানা যাবে না, কারা ওনার শ্রমের ফসল মাটিতে ছড়িয়ে নষ্ট করে উল্লসিত হয়েছিল। শুধু জানা আছে, বিষাদের সমুদ্রে ডুবে মারা গেল একজন ডাক্তার। আত্মহত্যার খবরটাই নথিভুক্ত হল। আর সব হয়তো হারিয়ে গেল মহাকালের গর্ভে।

বহু বছর পর হঠাৎ সেদিন গিয়েছিলাম পুরানো বাড়িতে। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আমার ছেলেবেলার হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ কোথাও কি আছে? সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল, শান্তিপিসির ছবি যে জায়গায় ঝোলানো ছিল সে জায়গাটা ফাঁকা। জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, ছবিটা কোথায়? সঙ্কোচ এসে মুখ বন্ধ করল। শান্তিপিসি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। বেঁচে থাকলেও কি প্রাসঙ্গিক থাকত শান্তিপিসি? লোলচর্ম বৃদ্ধা হয়ে সংসারের এক কোণে পড়ে থাকত। এতদিন বেঁচে থাকলে হয়তো সবাই বিরক্ত হত। নিজের ভবিষ্যতটা কি কোনোভাবে দেখতে পেয়েছিল ওই অল্প বয়সে? তবে কি অনভিপ্রেত করুণ ভবিষ্যতের হাত থেকে মুক্তির সিধে পথটা খুঁজে পেয়েছিল চলন্ত ট্রেনের তলায়? চির অজানা রয়ে গেল এসব প্রশ্নের উত্তর।

[তথ্যসূত্র : Caplan & Sadock, Synopsis of Psychiatry, 9th Edition.]

With Best Compliments of

SAIDA COLD STORAGE (P) LTD.

A HOUSE OF POTATOES PRESERVATION

COLD STORE at : Boinchee, G.T. Road, Hooghly

Sl. No. 97

With Best Compliments of

For Indian and Continental Dishes

T R I N K A

A MULTICUSHION RESTAURANT

Beside NH-2, Bam Battala, Burdwan

Sl. No. 151